প্রসঙ্গ

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

সম্পাদনা

রবিন পাল, নিমাই দাস, অনিল রায়

চ্যাটার্জী পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

প্রকাশক :
রাহুল মুখোপাধ্যায়
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : নিমাই দাস

মুদ্রাকর :
গোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
২, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৪৬ শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বই হয়ে বেরুল আষাঢ় ১৩৫৪ (ইং ১৯৪৭)-এ, ডাবল ক্রাউন আকারে, পৃষ্ঠা ৪৫২, প্রকাশ করেছিলেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। ২য় সংস্করণ বার হয় ১৩৫৫ আশ্বিন-এ, ৩য় ১৩৫৮ জ্যৈষ্ঠ-এ। এই দুটো সংস্করণেই তারাশঙ্কর উপন্যাসটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। ২য় সংস্করণে বইটি দশ ফর্মা বেড়ে গিয়েছিল। লেখকের জীবিতকালে ৯টি সংস্করণ হয়, এই ৯ম সংস্করণেও তিনি পরিমার্জনা করেন। পরিবর্তন হয় প্রধানতঃ কাহার জীবন কথার জটিলতার পুনর্বিন্যাসে এবং গানে। এই উপন্যাসটির কিছু কিছু প্রসঙ্গ উৎসের কথা লেখক নিজেই বলেছেন। সুচাঁদ, নসুবালা, বসন, তার মেয়ে ময়না (উপন্যাসে পাখী) প্রভৃতি তাঁর অত্যন্ত পরিচিত চরিত্র। তাঁর ভাষায় এরা 'আত্মার আত্মীয়', 'ভালবাসার জন' এবং কুশলাপিয়াসী। কোপাই নদীর যে বর্ণনা আছে তাও ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকেই আসছে। এই উপন্যাসটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪৮ সালে শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার দান করেন।

নানা কারণেই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করের একটি বহু আলোচিত উপন্যাস। বহু নন্দিত ও নিন্দিত এই উপন্যাসটি নিয়ে অতীতে যাঁরা আলোচনা বা মন্তব্য করেছেন তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, হিরণকুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকদের আলোচনাও অজস্র। আগ্রহী পাঠক নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী লেখকদের বই/লেখা ছাড়াও মুক্তি চৌধুরীর 'ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর', রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের 'তারাশঙ্কর' ও রাঢ় বাংলা', নিতাই বসুর 'তারাশঙ্করের শিল্পীমানস' প্রভৃতি বই নাড়াচাড়া করবেন। আমরাও কিছু আলোচনা সংকলন করলাম। উৎসাহী পাঠকের জন্য আরও কিছু অতীতে লেখা প্রবন্ধের নাম সন্নিবিষ্ট হল—'উপন্যাসে সমাজচিত্র; হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', আশীষ মজুমদার, সাহিত্যপত্র, শারদীয়া ১৩৮৯; 'তারাশঙ্কর ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', সরোজ দত্ত, 'তারাশঙ্কর অন্বেষা', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'তারাশঙ্করের লোক সংস্কৃতি চেতনা : দুটি উপন্যাসে', 'তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য', উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত; 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সাহিত্যিক-নৃতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণে' পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ১৯৮৩; 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', অরুণকুমার বসু, ঐ, 'তারাশঙ্করের নসুবালা : একটি চরিত্র একটি সমস্যা', বড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, প্রতিশ্রুতি, জুলাই ৭৩; 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় সমাজজিজ্ঞাসা', নিতাই বসু, চিত্রাঙ্গদা, অক্টোবর, ৭১; 'হাঁসুলী বাঁকের মানুষ', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পত্রাঙ্ক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৭১, প্রভৃতি।

এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে তারাশংকরকে লেখা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রায়-অব্যবহৃত চিঠির অংশ কৌতূহলসঞ্চারী বলেই উল্লেখ করি—'সম্প্রতি যে দুইখানি বই পড়িয়া মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে আমার গৌরববোধ আরও বাড়িয়াছে সেই দুইখানির একখানি হইতেছে আপনার 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আর অন্যখানি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'। আপনার বইয়ে একটী জিনিস পাইলাম যাহা অন্যত্র পাইবার নয়,—আপনি বাঙ্গলা দেশের আদিম যুগের মানুষের মনের একখানি নিখুঁত ছবি দিয়াছেন। হাঁসুলী বাঁকের যে বাউড়ী কাহারদের ছবি আপনি আঁকিয়াছেন তাহা অবশ্য তাহাদের পিতৃপুরুষদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র, পারিপার্শ্বিকের বাতাবরণ হইতে ভ্রষ্ট, ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির 'আর্য' সংস্কৃতির চাপের ফলে পর-প্রসাদপুষ্ট, আত্মবিস্মৃত, বিলীয়মান একটি জনসমাজের ছবি। কিন্তু ভবিষ্যৎকালের জন্য এই ম্রিয়মান আদিম সমাজের একটি যে অদ্ভুত সত্য আর সানুকম্প বর্ণনা রাখিয়া গেলেন, তাহার জন্য ভবিষ্যতের মানবপ্রেমী চিরকাল আপনার সাধুবাদ করিবেন। সুচাঁদ এবং বনোয়ারী যে ভাবের ভাবুক, তাহার অবস্থান মিশ্র আর্য ও অনার্য পরিবেশের মধ্যে, কিন্তু প্রাগ্ আর্য এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তা কল্পনা তাহাতে পুরাপুরি বিদ্যমান, এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের কল্পনা-জগৎ হইতে ও তাহার মৌলিক পার্থক্য বা ত্রুটি নাই। মানুষ হিসাবে বনোয়ারী, সুচাঁদ, করালী, পাখী, বসন, মাহাতো, ঘোষ, 'ছত্রী বেরাম্ভন' ভূয়া সিং মানায়। ……বনোয়ারী আর করালীর সংঘর্ষ শেষটায় সেই আদিম বা প্রাথমিক বস্তু লইয়া সংঘর্ষের রূপ ধারণ করিল—অধিকার এবং নারী। ভাঙা আর গড়া, বিধাতা বুড়ার এই ব্যবহৃত ক্রীড়া আপনি ভাবুকের, রসিকের সহৃদয় দরদীর দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন, তাই আপনার দর্শনের আনন্দের অংশ আমাদের ও পরিবেশন করিতে পারিয়াছেন।……ভাষানুসন্ধানীর কৃতজ্ঞতা—বাউড়ীদের ভাষার টুকিটাকি অনেক জিনিস পাইলাম যা কাজে লাগিবে—তবে 'এহ বাহ্য'। ভিতরে রসবস্তু আমাকে এককথায় বলিতে গেলে 'আকুল' করিয়াছে।' (১৯শে অক্টোবর, ১৯৪৭, জলার্ক, তারাশংকর সংখ্যা ১ থেকে)।

তারাশংকরের সঙ্গে বামপন্থীদের বিরোধ তীব্র হতে শুরু করে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বই আকারে প্রকাশের অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের কিছু পরেই। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ এই কটি বছরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তারাশঙ্করকে তাদের সর্বোচ্চ পরিচালকদের একজন গণ্য করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৩—৮ মার্চ মহম্মদ আলি পার্কে সম্মেলনে জনযুদ্ধনীতি ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বামপন্থীদের মূল্যায়নে ব্যথিত হয়ে অন্যতম সভাপতির পদ থেকে তারাশঙ্কর পদত্যাগ করেন। তারাশঙ্কর লিখেছেন পত্রিকায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রকাশ পাবার পরই বামপন্থী বন্ধুরা 'আকাশস্পর্শী' প্রশংসা করেন। এক বামপন্থী ঔপন্যাসিক ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক (?) 'অরণি' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রশংসাময় সমালোচনা লেখেন কিন্তু বামপন্থী সংস্রব ছিন্ন হওয়ার পর ইনিই লেখেন

বিরূপ সমালোচনা। বক্তব্য—বইটি কদর্য, অশ্লীল, নিম্নবর্ণের মানুষকে অপমান করা হয়েছে। উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ নেই কেন তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। হাওড়ার এক সাহিত্যসভায় (সভাপতি ছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) বলা হয়, বইটি সাহিত্যই নয়, অ্যাডভেঞ্চারাস রোমান্টিসিজম। অথচ বামপন্থীদের সুপারিশেই চেকোশ্লোভাকিয়ায় বইটির অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব আসে। হিরণ কুমার সান্যাল 'পরিচয়' পত্রিকার পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যায় এই উপন্যাসটির একটি বিরূপ সমালোচনা করে লেখেন—এ 'একেবারে ভানুমতির ভেলকি।···সবই অলীক—অবাস্তব। অসাধারণ মুন্সিয়ানার জোরে যে-উপকথা বিস্তৃত হয়েছে দীর্ঘ চারশো পাতা ধরে, শেষ পর্যন্ত তা উপকথাই থেকে গেল, জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে তা উচ্চস্তরে কথাসাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না।' অন্যদিকে ঐ বছরই কয়েকমাস আগে (শারদীয়া ১৩৫৪, পরিচয়) 'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে তারাশংকরের উপন্যাসের ভৌগোলিক-ব্যাপ্তি, প্রাকৃত ভাষার শিল্পায়ন প্রভৃতির প্রশংসা ক'রে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রসঙ্গে বলেন, প্রাকৃতিক স্বরূপে রূপায়িত মানুষের প্রাকৃতিক জীবন আমাদের মশগুল করে। হয়ত শেষটা খুব স্বচ্ছ নয়, বিহ্বল। কিন্তু বিষ্ণুদের মতে সে বিহ্বলতা তো আমাদের জীবনেরই, যুগেরই। যাই হোক. পার্টির বিশ্বস্ত শিল্পী সমালোচক এবং বিষ্ণু দে ও তারাশংকরের বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ধনঞ্জয় দাশ মন্তব্য করেন—'শুনেছি, হিরণ কুমার সান্যাল এর সমালোচনার প্রতিবাদেই বিষ্ণুবাবু পরিচয়-এর পরিচালক মণ্ডলী থেকে দারুণ ক্ষোভ নিয়েই পদত্যাগ করেন।' সুধী প্রধান অনেক পরে লেখা একটি প্রবন্ধে বলেন—তারাশংকর এ সব প্রসঙ্গে অনেক অসত্য বলেছেন, কম্যুনিজম বিদ্বেষ ছিল তার মধ্যে বহুকাল অবধি। যা হোক. এ বিতর্কের সত্যাসত্য বিচারের ক্ষেত্র এটি নয়।

আমরা পূর্বসূরী সমালোচকদের অনেকের মতই এই উপন্যাসটিকে তারাশংকরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলেই মনে করি। সেই সূত্রেই আর এক গুচ্ছ নব্য আলোচনা উপস্থিত করা যাচ্ছে এই প্রত্যাশায় যে একটি কালজয়ী উপন্যাস আবার পাঠকদের মুগ্ধতা ও বিচারের মধ্যে তরঙ্গ তুলুক। আমাদের এই ডাকে যে সব বন্ধুরা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই তপতী মুখোপাধ্যায়কে তাঁর সর্বতোমুখী সাহায্যের জন্য। নানাভাবে কাজে সহায়তা করার জন্য দেবজ্যোতি বসুকে এবং প্রেসের বন্ধুদের জানাই ধন্যবাদ।

রবিন পাল
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ নিমাই দাস
অনিল রায়

সূচি

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় লৌকিক জীবনের প্রতিফলন

বরুণকুমার চক্রবর্তী

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' সম্পর্কে সমালোচকেরা উচ্ছ্বসিত। শুধু তারাশংকরেরই এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়, তামাম বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসেও এর উজ্জ্বল স্থান স্বীকৃত। লেখক আলোচ্য উপন্যাসটির নামকরণেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রায়ণের দিকে লক্ষ্য রেখে উপন্যাসটি রচনা করেননি, তাঁর লক্ষ্য একটি সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন ও মর্মরহস্যের উদঘাটন। 'উপকথা' ত ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে রচিত হয়না, তার উপজীব্য হয় একটি গোষ্ঠী বা এমন এক সমাজ যা নাকি প্রকৃতিতে সংহত (Integrated)

গোষ্ঠী জীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে লেখক গোষ্ঠী জীবনের আনুপূর্বিক পরিচয়কে উপস্থাপিত করেছেন। হাঁসুলী বাঁকের বাসিন্দা যারা তারা সমাজে অবহেলিত অথচ প্রাণশক্তিতে পূর্ণ। একইরূপ ভৌগোলিক পরিবেশে এরা লালিত, একইরূপ জীবন দর্শনের অধিকারী, একই ঐতিহ্যে উত্তরাধিকার বহনকারী, করালী কিংবা বনওয়ারী সংহত সমাজেরই একজন রূপে সমগ্র কাহার সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। লেখক তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সেইসঙ্গে অতুলনীয় মমত্বের দৃষ্টিতে হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের বিশ্বাস সংস্কার, উৎসব, শিকার, ক্রীড়া, পূজা-পার্বণ, খাদ্য, বিবাহ, লোক চিকিৎসা, কিংবদন্তী সাহিত্য, সঙ্গীত সবকিছুই জীবন্ত করে উপস্থাপিত করেছেন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে লোকসংস্কৃতির উপাদানের আধার বললেও মোটেই অত্যুক্তি হয়না। এমনকি উপন্যাসের আদ্যন্ত লেখক এই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষদের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকেও সাধ্যমত বজায় রেখেছেন তাদের প্রত্যক্ষ উক্তির উদধৃতিদানে। নির্দিষ্ট তথ্যাদির উল্লেখে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রমাণে এবার সচেষ্ট হব।

লোকায়ত জীবনে ব্যবহৃত গহনা, যান, বাদ্যযন্ত্র, যন্ত্রাদি, খাদ্য ও অন্যান্য উপাদান

'হাঁসুলী নদী'র বর্ণনা উপন্যাসের একেবারে প্রথমেই প্রদত্ত রয়েছে। লেখক

সেই বর্ণনায় বলেছেন, '......নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত।' উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, 'বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপায়ের গিরিমাটি গোলা জলভরা, নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী।'

হাঁসুলী লোকায়ত সমাজে বহুল ব্যবহৃত ও পরিচিত এক অলংকার। কৃষিজীবী মানুষেরা যেসব যন্ত্রপাতি নিত্যই ব্যবহার করে তার মধ্যে উল্লেখ্য কোদাল টামনা ইত্যাদি। প্রখর গ্রীষ্মে হাঁসুলী বাঁকের মাটি শুষ্ক অবস্থায় এমন কাঠিন্য পায় যে, 'কোদাল কি টামনায় কাটেনা, কোপ দিয়ে কোদাল টামনারই ধার বেঁকে যায়' বলে লেখক জানিয়েছেন।

লোকায়ত জীবনে যে সব লোক-বাদ্য বাজানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষম ঢাকি। বজ্রপাতের শব্দের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বিষম ঢাকির বাজনার উল্লেখ করেছেন তুলনা দিতে গিয়ে।

'এরই মধ্যে কখনও ওঠে আকাশে টুকরো খানেক কালো মেঘ—দেখতে দেখতে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় তার উপর, যেন কেউ আগুনে পড়া হাতের আঙুলের ঘা মেরে বাজিয়ে দেয় ওই কালো মেঘের বিষম ঢাকির বাজনা।'

অন্যতম লোক বাদ্য ঢোলের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। ঢোল বাজিয়ে বোলান গান গীত হবার কথা জানিয়েছেন লেখক।

হাঁসুলী বাঁকের মানুষ মদ্য পান করে যেমন, তেমনি 'কাহারেরা পাড়ের উপর বসে হুঁকো টানে। ধূমপানের এই লোকায়ত উপাদান হুঁকার উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। ধূমপানের উপকরণাদির বর্ণনা দান প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন খড়ের নুটি, চকমকি, শোলা এবং বাঁশের চোঙের মধ্যে তামাক রাখার কথা। গরুর পায়ে বসা মাছি মারার কৌশল ও উপাদানটির ব্যবহার লেখকের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি। লেখক বর্ণনা করেছেন ঃ 'তালপাতা চিরে ঝাঁটার মত করে বেঁধে তাই দিয়ে আছড়ে মাছি মারে। তাড়িয়ে দেয়।'

বন্য শূকর শিকারের কৌশলটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 'হাত খানেক লম্বা বাখারির ফালির মাঝখানে আধহাত লম্বা শক্ত সরু দড়ি বেঁধে প্রান্তভাগে বাঁধে ধারালো বঁড়শি। বঁড়শিতে টোপের মত গেঁথে দেয় কলা এবং কচুই মদের মতো। এমনই আট দশটা ছড়িয়ে রেখে দেয় পথে প্রান্তরে। মদের ম্যাতার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শুয়োর বেটারা মাটি শুঁকে শুঁকে এসেই পরমানন্দে গপ করে মুখে পুরে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শি গেঁথে যায় জিভে অথবা চোয়ালের মধ্যে। তখন পায়ে খুরে দিয়ে

টেনে বঁড়শি ছাড়াতে চেষ্টা করে—তাতে ফল হয় বিপরীত, চেরা খুরের মধ্যে বঁড়শির দড়ি ঢুকে গিয়ে শেষে আটকায় একে বাখারিতে ফালিতে। একদিকে বঁড়শি আটকায় জিভে, অন্যদিকে দড়ি পরানো খুর আটকায় বাখারিতে, বেটা শুয়োর নিতান্তই শুয়োরের মত ঠ্যাঙ তুলে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।' কাহার বাড়ীর মেয়েরা চুল আঁচড়ায় 'কাকুই' দিয়ে, লেখক তাও লক্ষ্য করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় এদের ঘরে যে কেরোসিনের ডিবে জ্বলে তাও জানিয়েছেন।

লোকায়ত সমাজের মানুষ পাখী শিকারে বাটুলের সাহায্য নেয়। সুচাঁদ করালকে বাটুল ছুঁড়ে ঘুঘু মারতে দেখেছে বলে জানিয়েছে।

হাঁসুলী বাঁকের এক পরিচিত যান পাল্কী। পাল্কী বহনকারীরা মূলতঃ বেহারা ও কাহার। বনওয়ারী এই বেহারা পাড়ারই মুরুব্বি। লেখক জানিয়েছেন বনওয়ারীর একপূর্ব পুরুষ এক কাঁধে পাল্কী নিয়ে এক ক্রোশ পথ অনায়াসে অতিক্রম করে যেত কাঁধ পরিবর্তন না করেই, আর সেই সুবাদেই ওদের বাড়ী পরিচিত হয় 'কোশ কেঁধেদের' বাড়ী বলে। সাহেবদের আমলে কুঠীতে দুখানি পাল্কীর হাজির থাকার কথাও বলা হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে মাদুরের তুলনায় তালপাতার চাটাইয়েরই অধিক ব্যবহার প্রচলিত অন্ততঃ এক সময়ে তা ছিল। পানু নিমতলার পশ্চিম দিকে যেখানে ছায়া পড়ে সেখানে তাল পাতার চাটাই বিছিয়ে মাতব্বরদের অভ্যর্থনা করেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। কাহাররা যে নিজেরাই খেঁজুরপাতা তালপাতার চাটাই বুনে নেয় তা বলা হয়েছে। বসার জন্য ব্যবহৃত হয় কাঠের পিঁড়ি। বিশেষতঃ সম্মানিত অভিজাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কাষ্ঠাসন প্রদত্ত হয়। বনওয়ারীর বউ গোপালীবালা ঝড় ঠাকুরকে উদ্দেশ করে কাঠের পিঁড়ি দিয়েছে। উপন্যাসে পাকি মদ ব্যতীত যে লোক খাদ্যটির উল্লেখ রয়েছে তা হল পান্তা ভাত। রমণের স্ত্রী, সুবাসীর মাসী, যে নাকি আবার কালোশশীর বোন, তার লঙ্কা নুন পেঁয়াজ সহযোগে পান্তা ভাত খাওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। লোভনীয় খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে আর যা উল্লিখিত হয়েছে তা হল বাতাসা, মণ্ডা, মুড়কী ইত্যাদি।

লোক সংগীত : লোকায়ত সমাজের মানুষ তাদের সুখ দুঃখ, আনন্দ নৈরাশ্য সব কিছুই বিশেষ করে প্রকাশ করে গানের মাধ্যমে। যে কোনও লোক উৎসব, পুজা পার্বণ মুখরিত হয়ে ওঠে লোকসঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনায়। লোকায়ত সমাজ আছে অথচ তা লোকসঙ্গীতের প্রভাব মুক্ত এমনটি হবার নয়। হাঁসুলী বাঁকের মানুষের কণ্ঠে যে কারণে-অকারণে লোক সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হয়, উপন্যাসের সর্বত্র তার প্রমাণ বিধৃত। লোকসঙ্গীত মানে তা কখনই ব্যষ্টি সৃষ্ট পরিশীলিত সঙ্গীত নয়। ব্যষ্টির

সৃষ্টি হয়েও তা সমষ্টির দ্বারা মার্জিত, গৃহীত হয়ে সমষ্টির নিজস্ব সম্পত্তিতে রূপান্তরিত।

লেখক জানিয়েছেন, হাঁসুলী বাঁকের মানুষ বিশেষতঃ ছেলে ছোকরার দল ধর্মরাজের বোলান গায়, গায় মনসার ভাসান, ভাদ্র মাসে গায় ভাঁদু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে গায় পাঁচালী' চৈত্রে গায় ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তিতে বোলান গাজন উপলক্ষ্যে জমে ওঠে। এক একটি লোক উৎসবের আঙ্গিনায় এক এক ধরনের লোকসঙ্গীত। বার মাসে তের পার্বণের সমাহার, আর সেই উপলক্ষ্যে কত বিচিত্র সব লোক সঙ্গীতের পরিবেশন ; উৎসব কি আর সঙ্গীত ব্যতিরেকে জমে ওঠে ?

আটপৌরে পাড়ায় যে ঘেঁটুগানের আসর বসেছে, সেখানে বনওয়ারী ধ্বনিত হতে শুনেছে।

হায় কলিকালে কতই দেখালে-
দেবতার বাহন পুড়েমল অকালে, তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতিবড় বাড় বাড়িল যারা তাদের ভেঙে পাড়ো।

এ গানের উপজীব্য করালী কর্তৃক বাবার থানে আশ্রয় গ্রহণকারী সর্পের নিধন। লোকায়ত সমাজ কোনমতেই করালীর কাজকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস করালী বাবার বাহনকে হত্যা করে সীমাহীন পাপে নিমজ্জিত, অথচ বাবা কেন উপযুক্ত শাস্তি বিধানে বিলম্ব করছেন !

বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভারা
সাজের পিদীম বলো ফুঁদিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধুজনের এ কি লীলা সন্জে বেলাতে
মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় কি গলাগলি
কত হাসি খুশী কত বলাবলি কত ঢলাঢলি ! ইত্যাদি

'চন্ননপুরে' প্রথম রেললাইন স্থাপন উপলক্ষ্যে পাগল ঘেঁটুগান বেঁধেছিল,:,তা কাহারদের খুবই মনে ধরেছিল। ঘোষ মশায়ের চাপে পড়ে পাগল সেই গান গেয়ে উঠেছে :

ও সায়েব আস্তা বাঁধালে।
হায় কলিকালে।
কালে কালে সায়েব এতে আস্তা বাঁধালে—

এরপর ছোকরারা ধুয়ো ধরেছে—

ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে

ও সায়েব আস্তা—

এরপর পুনরায় পাগল ধরেছে গান—

লালমুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ—

দাশ—বিদ্যাশ থেকে এলে দলে দলে লোক

—ও সাহেব—আস্তা—

ও সাহেব আস্তা বাঁধালে—কাহার কুলের অন্ন ঘুচালে

পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চলে যত বাবু লোক।

কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। বাবুরা রেল চড়ে দ্রুত গন্তব্য স্থলে যাবার সুযোগ পেলেও কাহাররা পাল্কী বহন করে যে দু'পয়সা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করত, রেল চালানোয় তাদের সেই রুজি রোজগার বন্ধ হবার আর্তিই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

কালো বউয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গান। লেখক বলেছেন, 'সে যে কে রচনা করেছে, কেউ তা জানে না।' এই মন্তব্যে স্পষ্ট যে এ গান ইতিহাসআশ্রিত।

আমার মনের অঙের ছটা

তোমায় ছিটে দিলে না—

পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে—

সে জল পাতা নিলে না।

টলমলো টলমলো—

হায় বঁধু হে পড়ে গেল

ও হায় চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে মরে না।

ভাঁজো গানেরও উল্লেখ করেছেন লেখক—

কোন ঘাটেতে লাগায়েছ 'না'ও আমার ভাঁজো সখি হে!

আমি তোমায় দেখতে পেছি না।

তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীরই বাঁকে—

বাঁশবনে কাশবনে লুকাল্‌ছ কোন ফাঁকে!

তোমার আঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গা

ও আমার ভাঁজো সখি হে!

ছড়া, লোককথা ঃ হাঁসুলী বাঁকের দেশের কতকাল আগের ব্রতকথায় দেখি যে, 'গাঁয়ে ছিল এক নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত করত, ধর্ম কর্ম করত, গাঁয়ের দুঃখে দুঃখ করেই তার ছিল সুখ। কারও দুঃখে কাঁদতে না পেলে বুড়ী পশু পক্ষীর দুঃখ খুঁজে বেড়াত।'

সুচাঁদ যুদ্ধের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বর্গীদের কথা পেড়েছে আর এরই অনুষঙ্গে বহু শ্রুত ছড়াটিরও উল্লেখ করতে ভোলেনি—'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।

নবান্নের ছড়া লেখক ওদেরই ভাষায় উদ্ধার করে দিয়েছেন—

'লা' লাড়লাম—'ল' চাড়লাম
'ল পুরনোয় ঘর বাঁধলাম
লতুন বাখার বাঁধি' পুরানো খাই—
এই খেতে যেন জনম যায়—
লতুন বস্ত্র পুরোনো অন্ন—
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।

ভাঁজো পুজো উপলক্ষ্যে যে ছড়া আবৃত্তি করার রেওয়াজ, উপন্যাসে তাও বিবৃত হয়েছে—

ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিবি,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলবি
পণ্ড আঁকুড়ি আমার ধরলেন ধরা।

সুচাদ পিসি যে রূপকথা বলত, তাও আমাদের জানানো হয়েছে। রূপকথার কিছু অংশও লেখক উদ্ধার করেদিয়েছেন—

'এক আজব কন্যেকে যে বিয়ে করত সেই মরত। কন্যের নাক দিয়ে আত্রিরে সুতোর মতো সরু হয়ে বের হত এক সাপ। বের হয়ে সে ফুলত, কেমে কেমে সে হত অজগর। তারপরে সে-ডংসাত আজবকন্যের বরকে'। এখানে লক্ষণীয় সুচাঁদ পিসির বাকভঙ্গিমার অবিকৃত রূপটি বিধৃত।

তারাশংকরের হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে যদি বাংলা প্রবাদের একটি ক্ষুদ্র সংকলন বলে অভিহিত করা হয়, তবে বোধকরি অত্যুক্তি হয়না। লেখক দু একটি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন নূতন প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। দু একটি ক্ষেত্রেই

কেবল একই প্রবাদের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রশ্ন হল লেখক আলোচ্য উপন্যাসটিতে এত বেশি প্রবাদের ব্যবহার করেছেন কেন, উপন্যাসের ভাষাকে শাণিত ও তীক্ষ্ণ করা নিশ্চয়ই অন্যতম অভিপ্রায় ছিল লেখকের। এতদ্ব্যতীত যে আঞ্চলিক জীবনকে উপন্যাসটিতে রূপায়িত করা হয়েছে, তার লোকায়ত চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করার জন্যও লেখককে প্রবাদ ব্যবহারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। সংহত সমাজের মানুষ কথায় কথায় প্রবাদ বলে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে তারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবাদের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে চলে। তথাকথিত উচ্চতর সংস্কৃতিতে প্রবাদের প্রচলন কম হলেও সংহত সমাজের মানুষ তার বহুধা বিস্তৃত অভিজ্ঞতার বর্ণচ্ছটাকে প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমেই বিকীর্ণ করতে অভ্যস্ত। হাঁসুলী বাঁকের সংহত সমাজের মানুষগুলির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদগুলি অনেকখানি সহায়ক হয়েছে স্বীকার করতে হয়।

তারাশঙ্কর প্রবাদের ব্যবহারে যে শুধু বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটিয়েছেন তাই নয়, ব্যবহারকারীর পরিপ্রেক্ষিতে বৈচিত্র্য রক্ষায় নৈপুণ্যেরও স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসের কম বেশি অনেক চরিত্রই উপযুক্ত প্রসঙ্গে প্রবাদের উল্লেখ করেছে যেমন, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে লেখক নিজেও প্রবাদের মাধ্যমে তাঁর মন্তব্যকে যুক্ত করেছেন। অবশ্যই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর কথিত প্রবাদের তুলনায় লেখকের সরাসরি উচ্চারিত প্রবাদের সংখ্যা সীমিত।

এইবার আমরা কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখে আমাদের বক্তব্যের প্রমাণে সচেষ্ট হব—

ক। নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস (পৃঃ ৫)

খ। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (পৃঃ ১৪)

গ। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (পৃঃ ১৯)

ঘ। বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেত। (পৃঃ ১৮)

ঙ। যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি (পৃঃ ২২)

চ। বেগুনে কেন খাড়া ? না বংশাবলীর ধারা (পৃঃ ৩৮)

ছ। অমাবস্যে রবিবার, মৎস্য খাবে তিনবার (পৃঃ ৪৬)

জ। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা (পৃঃ ৬৭)

ঝ। হাসতে লাগল পানু, যে হাসির অনেক অর্থ, এবং সে অর্থ কাহারেরা 'বেদের সাপের হাঁচি চেনা'র মতই চেনে। (পৃঃ ৬৮)

ঞ। পাখী বলছিল জবাকে—'যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপনজন, ইয়ের আবার রাসনই বা কি মাতব্বরই বা কি (পৃঃ ৭৪)

ট। গুপী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—ভাই রে, ওই নয়ানের বাপের পেতাপ কত ভেবে দেখ, মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা (পৃঃ ৭৯)

সুচাঁদ আক্ষেপ করে বলেছে, 'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা। (পৃঃ ৯৩)

ঠ। নয়ানের মা বনওয়ারীর সমালোচনা করে বলেছে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে পড়ল। (পৃঃ ৮০)

ড। চোর কাহার পাড়াতে আসেনা, তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, কাকের মাংস কাক খায়না, কাহারেরা একদিন নিজেরাই চোর ছিল। (পৃঃ ৯১)

ঢ। বনওয়ারীর ভাবনায়, রাজার পাপে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের পাপে গেরাম নাশ, কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার 'পিতের' অর্থাৎ পিতার পাপে পুত্তের দণ্ড (পৃঃ ৯৫)

ণ। ফাগুনের জল আগুন' (পৃঃ ৯৬) ; আমের পক্ষে বিশেষ করে, কেননা সমস্ত মুকুলে ঝাঁই লেগে যাবে)।

ত। আমে দেখে ধান (আম না হলে ধানও হবেনা)

থ। মাইতো ঘোষ বলেছে, এলো ডাউরী মন বাউরী। (পৃঃ ৯৯) (বাদল বর্ষায় কাহারদেরই মরণ)

দ। সুচাঁদ মন্তব্য করেছে সব শেয়ালের এক রা। (পৃঃ ১০২)

ধ। বনওয়ারী হেসে ঘাড় নাড়লে অর্থাৎ ঢাকে ঢোলে বিয়ে তাতে কাশতে মানা। (পৃঃ ১০৫)

ন। বনওয়ারীর ভাষায় 'কথাতেই আছে, আজ্ঞার মায়ের সাজার কথা (পৃঃ ১১২)

প। বনওয়ারীর চিন্তায় যাকে দশে করেছি, তার জীবনে কাজ কি ? (পৃঃ ১১৪)

ফ। বনওয়ারীর চিন্তায়, 'ধর্মপথে অধিক রাতে ভাত'। (পৃঃ ১১৯)

ব। নয়ান বলেছে, 'মরার বাড়া গাল নাই'। (পৃঃ ১৩৪)

ভ। নিমতেলে পানু বলেছে, ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত (পৃঃ ১৪১)

ম। পানু বলেছে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে গেল। (পৃঃ ১৫৫)

য। রতন, প্রহ্লাদ প্রভৃতিরা বলেছে, মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নই, মাথা। পৃঃ ১৬০)

র। গুপী বলেছে, যার যেথা মন সেথাই বিন্দাবন (পৃঃ ১৬৪)

ল। পরম সম্পর্কে বলা হয়েছে, ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয় কিসে? (পৃঃ ১৬৬)

ব। সিনইলে মাড়ন হয় না পাঁচন নইলে গরু হাঁটে না, সওয়ার নইলে ঘোড়া ছোটে না। (পৃঃ ১৭৪)

শ। রমণ বলেছে, যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ জানেন না আপন বাপ। (পৃঃ ১৭৮)

ষ। সুচাঁদ বলেছে, যেমন কলি তেমনি চলি। (পৃঃ ১৮০)

স। জাঙলের চৌধুরী মশায়ের বক্তব্য—কলিকালে ধর্মের এক ঠ্যাঙ (পৃঃ ১৮১)

হ। বনওয়ারী পিতিপুরুষের কথা স্মরণ করেছে, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে। (পৃঃ ১৮৭)

ড়। বনওয়ারী বলেছে, পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। (পৃঃ ১৮৮)

** (করালীর গ্রামে কোঠা করার পরিপ্রেক্ষিতে)

ঢ়। রমণ বলেছে, 'পেটে ভাত নাই ধরমের উপোস' (পৃঃ ১৯৪)

ং। পানার ভাষায়' 'আপনার গরজে ধান ভানে মরদে' (পৃঃ ১৯৪)

ঃ। পানু বলেছে, আষিড়ে কাড়ান পায় কে? অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত পর্যাপ্ত বর্ষণ পায় কে (পৃঃ ১০৩)

ঁ। বনওয়ারী বলেছে, সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। (পৃঃ ২৬৫)

এছাড়াও আরও কিছু প্রবাদ উল্লিখিত হয়েছে, যেমন—

বনওয়ারী জানে, হাকিম ফেরে তবু হুকুম রদ হয় না। (পৃঃ ২৬৩)

বনওয়ারী জানে, ধর্ম্মপথে থাকলে আদেক এতে ভাত (পৃঃ ২৬০)

পানা বলেছে, ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে রবশ্যাষে—অজাতি পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে। (পৃঃ ২৩৭)

পুজা পার্বণঃ গ্রাম বাংলার বারো মাসে তের পার্বণ। এখানে যত না বৈদিক ও পৌরাণিক, দেবদেবীদের জনপ্রিয়তা, তদপেক্ষা অনেক বেশি প্রচার লৌকিক দেবদেবী, পুজা পার্বণের। করালীর পিসতুতো ভাই নসীরাম আচার আচরণে ঠিক মেয়েদের মত। এমনকি সে মেয়েদের মত ব্রতপার্বণও করে মেয়েদেরই সঙ্গে।

সুচাঁদ নানা লৌকিক দেব দেবীর স্মরণ নিয়েছে, এদের কাছে বিচার চেয়েছে। যাদের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তারা হলেন 'বাবা জাঙলের কলেরুদ্দু' চন্দনপুরের চণ্ডী মা, বাকুলের বুড়ী কালী, বাবা বেলের ধর্মরাজ প্রমুখ। ঘেঁটু, ভাঁজো, ভাদু, এসবও উল্লিখিত হয়েছে। তবে বিস্তারিতভাবে চড়কের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

গাজনের যে প্রধান ভক্ত তাকে গাজাল পোঁতা পাটায় শুতে হয়, যে পাটা থাকে মানুষেরই মাথায়। শুধু তাই নয়, তাকে দুহাতে আগুন ফুলের আঁজলা নিয়ে বাবার মাথায় চাপাতে হয়। নাচতে হয় আগুনের ফুলের উপর, খেলতে হয় মড়ার মাথা নিয়ে।

বাবা কালারুদ্রর পূজোঙ্গন চৈত্র সংক্রান্তিতে কিরূপ ধারণ করে তার বিস্তারিত বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে—

'পাটাগানে অর্থাৎ পাট অঙ্গনে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের দণ্ড, গলায় উতুরী, অর্থাৎ উত্তরীয়, পরণে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির তিপুণ্ডক, রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই ধেই করে নাচে। হাড়ি ডোম বাউরি কাহার যার ইচ্ছে বাবার ভক্ত হতে পারে।'

বছরের প্রথম দিনে গাজনের শেষে শিবের জল শয়ানের শোভাযাত্রার বর্ণনাটিও অনবদ্য—'প্রথম চলেছে ঢাক, কাঁশি, শিঙে, বাদ্য ভাণ্ড, তারপর চলেছে সঙ। সঙ হল বাবার ভূত প্রেত দানো দৈত্যের দল। মানুষেই মেনেকে নন্দী, ভৃঙ্গী, 'তিডটে', 'দন্তবক্র', আরও কত ভূত তার নাম কে জানে।

সঙসাজার ব্যাপারটি যে চারত্রে সম্পূর্ণরূপে লোকায়ত তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গাজনে পাগলের ভালো সঙ দেওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। পাগল নিজে সেজেছে শিব, দুপাশে দুটি ছেলেকে সাজিয়েছে দুর্গা ও গঙ্গা। এদের একজন বয়সালো মেয়ে অন্যজন যুবতী।

গাজন, ধর্মপূজো ব্যতীত হাঁসুলীর বাঁকে আর যে সব উৎসবের জাঁক তা হল অম্বুবাচী, ওদের ভাষায় আমুতি, মা বিষহরির পূজো, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। সাতটি পরব পালিত হয়। এছাড়াও ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী ত আছেই। নবান্নের কিঞ্চিৎ দীর্ঘ পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পূজা করে, কালারুদ্র বাবাঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের দ্রব্য তৈরী করে খাওয়ায় আর সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছড়া আবৃত্তি করে এরা, কেননা এই ছড়া পূজার মন্ত্র স্বরূপ। আর একটি উল্লেখযোগ্য লৌকিক উৎসব হল ইঁদ পূজো। হাঁসুলী বাঁকের মানুষ এই লোক দেবতার আরাধনায় রত হয়। লেখক জানিয়েছেন—

'রোয়া শেষ হলে বাবাঠাকুরকে প্রণাম করে, আর আয়োজন করে বাবাঠাকুর তলায় ইঁদপুজোর। ইঁদ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষার জল দিলেন, তাঁর স্বর্গরাজ্যের রাজ লক্ষ্মীর এক অংশ পাঠিয়ে দিলেন 'ভোমণ্ডলে' অর্থাৎ ভূমণ্ডলে। বোঝা যায় লেখক বিবরণ দিয়েছেন লোক সমাজের বিশ্বাস এমনকি এদের উচ্চারিত শব্দ

বিশেষের বিকৃত উচ্চারণকে বজায় রেখেই। আরও বলেছেন, 'ইঁদপুজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, খেটেখুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়····· । ······ইঁদ রাজার পুজোর শেষে থানটিতে মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিসের থানটিতে বেদী বাঁধে। ····উপন্যাসের শেষাংশে ভাঁজো পূজার বিবরণও প্রদত্ত হয়েছে, উল্লিখিত হয়েছে এই উপলক্ষ্যে সংহত সমাজের মানুষের আনন্দে মত্ত হবার প্রসঙ্গ।

'জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পুজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর পুজোতে কাহার পাড়ায় অণ্ড খেলা চাব্বিশ পহর হয়ে থাকে। সে মাতনের হিসেব নিকেশ নাই। ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরী করে লতায় পাতায় ফুলে সাজিয়ে আকণ্ঠ মদ খেয়ে মেয়ে পুরুষ মিলে গান কর আর নাচ। রাত্রে ঘুমোতে নাই, নাচতে হয়, নাইতে—হয়। জাগবণ হল বিধি।

লোকক্রীড়া ঃ গ্রামীণ জীবনে এমন লৌকিক ক্রীড়ার চল আছে যেগুলি সম্পর্কে তথাকথিত শহুরে মানুষদের অনেকেই কোন খবর রাখেনা। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক একাধিক লৌকিক ক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে লৌকিক ক্রীড়ার বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন। উল্লেখ করেছেন কড়ি খেলার কথা, ড্যাংগুলির কথা, তীর ধনুক সহযোগে পাখির ঝাঁক তাড়ানোর নামে খেলা ইত্যাদি।

হাঁসুলী বাঁকের রাখাল ছেলেরা গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি চরাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত-মনে গাছতলায় কড়ি খেলায় মত্ত হয় বলে লেখক জানিয়েছেন।

নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে এখানকার জোয়ান ছেলেরা যে ড্যাংগুলি খেলায় মাতে তার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন ঃ

'জোয়ান ছেলেরা সায়েব ডাঙায় গিয়ে দেড় হাত লম্বা ড্যাং এবং বিঘৎ প্রমাণ মোটা গুলি নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে সন্ধ্যে পর্যন্ত, খেলে খাদ্য হজম করে বাড়ি ফেরে। এক এক ডাণ্ডা মেরে গুলিকে পাঠিয়ে দেয় হুই লম্বা পার, দেখিয়ে দেয় সাত ভুবন। বারি দুরি তেরি চাল চম্পা ঢেক লম্বা মাপতে মাপতে সাত মাপে গজ দিয়ে পিটিয়ে দেয়, গজা' অর্থাৎ এক দানের হার। আবার যারা খাটুনি দেয়, তারাও কম যায় না, ওই বোঁ বোঁ শব্দে ছুটন্ত গুলি দুই হাতে খপ করে লুফে নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বলে—খেয়ে ফেলেছি অর্থাৎ গেল খেলনা দানের হাত।'

বয়ো বৃদ্ধরাও জোয়ানদের দেখে মাঝে মাঝে বয়সের কথা ভুলে এহেন ডাণ্ডগুলির খেলায় মেতে পড়ে বলে লেখক জানিয়েছেন—এ খেলার এমনই আকর্ষণ।

ছেলেদের তীর ধনুক নিয়ে বাঁখারির ধনুক, নতুন শরকাঠির তীরে তৈরী করে

হৈ হৈ করে মাঠময় ঘুরে বেড়ানোর জীবন্ত চিত্রও আমরা উপহার পাই উপন্যাসটিতে।

সংস্কার ঃ

লোকায়ত জীবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পেতে গেলে, তার সার্বিক পরিচয় লাভ করতে গেলে সে জীবনের সঙ্গে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত যে লোক বিশ্বাস ও সংস্কার তার পরিচয় লাভ আবশ্যক। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় লেখক এতদঞ্চলের মানুষের জীবনে সংস্কারের কতখানি অমোঘ প্রভাব তার বহুল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে লোকায়ত জীবনের নিয়ন্ত্রা শক্তি রূপে যদি লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কারকে অভিহিত করা হয়, তবে মোটেই অত্যুক্তি হয়না।

হাঁসুলী বাঁকের পশ্চিম দিকের বাঁকিতে যে বেলগাছ ও শ্যাওড়া গাছের ঝোপ, এতদঞ্চলের সহজ সরল মানুষগুলি সেখানে ব্রহ্মদৈত্যের অবস্থান বলে বিশ্বাস করে আশঙ্কিত হয়। শুধু তাই নয় এই ব্রহ্মদৈত্যতলায় কর্তা মানুষের আচরণে রুষ্ট হন এবং তাঁর সে রোষ প্রকাশও করেন, অন্ততঃ হাঁসুলী বাঁকের মানুষরা তাই বিশ্বাস করে। রুষ্ট কর্তার সন্তুষ্টির জন্য তারা পূজার্চনার আয়োজন করে, ঘরে ঘরে কুলুঙ্গীতে সিঁদুর মাখিয়ে পয়সা তোলে এজন্য।

দেবতার থানে পূজায় খুঁতো পাঁঠা বলিদান অবিধেয় (Taboo) এতে দেবতার সন্তুষ্টির পরিবর্তে রোষ বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস। পানুর কুকুরে কামড়ানো পাঁঠাটি চৌধুরীরা তাদের গাছ নষ্ট করার কারণে আত্মসাৎ করলে সহজ সরল বিশ্বাসের পানু বারংবার অনুরোধ করে বলেছে, খুঁতো পাঁঠা, কেটে ফিষ্টি সিস্টি করে খাবেন, কিন্তুক দেবতা টেবতার থানে যেন পুজোটুজো দেবেন না মশায়।' মাথায় হাত দিয়ে কেউ যদি দিব্যি করে, তবে সেই দিব্যি সত্য বলে গৃহীত হয়। সংস্কার, মাথায় হাত দিয়ে কিরে করার সময় মিথ্যাচার করলে সমূহ অকল্যাণের সম্ভাবনা। পানু তার বেটা লটবরের মাথায় হাত দিয়ে কিরে করে বলেছে,। 'মুরুব্বি আমি দুবার বলেছিলাম—খুঁতো পাঁঠা, খুঁতো পাঁঠা, হেই মশায় যেন দেবতা থানে দেবেন না।'

দেবতার পুজো ইচ্ছামত দিলে হয় না, তার জন্য আদর্শ দিন আছে, আর তা হল শনিবার। বনওয়ারী শনিবার পূজাদানের প্রস্তুতি নিয়ে বলেছে, পুজো পরশু দোবই। শনিবার আছে বারও পাব। জাত সাপ অর্থাৎ যে সাপের কামড়ে মৃত্যু অনিবার্য সেই সাপকে ব্রাহ্মণ বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী জাত সাপ মেরে তাকে আগুনে পোড়াতে হয়। বাবাঠাকুরের থান পরিষ্কার করার সময় সেয়াকুলের ঝোপের ভেতরে উইঢিপি থেকে তিন তিনটে আল কেউটে বেরিয়ে পড়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে কেউটেদের পাঁচন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

এরপরই মন্তব্য সংযোজিত হ য়েছে এই বলে—'তবে জাত সাপ না কি ব্রাহ্মণ, ওদের মেরে তাই সম্মান করে আগুনে ডাহ অর্থাৎ দাহ করে (পৃঃ ৪৬)।'

কোনো কথা তিনবার উচ্চারণ করলে একদিকে যেমন তার বিশ্বাস যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি তা সত্যে পরিণত হয় বলে সংস্কার প্রচলিত। সুচাঁদ করালীকে উদ্দেশ্য করে অভিশাপ দিয়েছে, যে হাতে সে সাপ পুড়িয়ে মেরেছে, সেই হাত দুটি তার পড়ে যাবে, কাঠের মত শুকিয়ে যাবে। সুচাঁদ বলেছে যে যদি দেবতাকে পুজো করে থাকে অতিথিকে যদি সেবা করে থাকে, তবে আমার কথা ফলবে—ফলবে ফলবে (পৃঃ ৬১)। এখানে 'ফলবে' শব্দটি ঠিক তিনবার উচ্চারিত হয়েছে। করালী যাতে অন্ধ হয় সেজন্যও সুচাঁদ অভিশাপ দিয়ে বলেছে, কানা হয়ো তুমি, কানা হয়ো তুমি-কানা হয়ো (পৃঃ ৬১)।'

অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ জলপড়া তেল পড়ার ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি তাবিজ, কবজ ইত্যাদিও ধারণ করে। হাঁপানীর রোগী নয়ানের 'বুকের উপর শোভিত ধর্মরাজের এক মোটা মাদুলির কথা লেখক আমাদের জানাতে ভোলেননি। দেবতা তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা মানুষকে বিশেষত একনিষ্ঠ ভক্তকে জানিয়ে দেন বলে বিশ্বাস। করালীর সর্প হত্যা করার অপরাধ পাছে গ্রামের মানুষকে স্পর্শ করে সেই ভয়ে ভীত গ্রামের মোড়ল বনওয়ারী দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছে, তাঁকে পুজা দেওয়া হবে, তিনি যেন সকলকে মার্জনা করেন। তারপরই সংস্কারচালিত বনওয়ারী বলেছে, 'যদি মার্জ্জনা না কর বাবা জানিয়ে দাও। পড়ুক তোমার গাছ থেকে একটি বেল খসে পড়ুক। আমি মনে মনে পাঁচ কুড়ি গুনছি (পৃঃ ৮১)।'

সংহত সমাজের মানুষ অশরীরী আত্মায় বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে অপদেবতাকে, ভূত প্রেতকে। লেখক সেই বিশ্বাসেরই রূপ দিয়েছেন এই বলে, 'বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় বা-বাউলী অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে ধারে 'দপদপিয়ে' অর্থাৎ দপ দপ করে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা, অর্থাৎ আলেয়া। (পৃঃ ৮২)।'

অমাবস্যার রাত্রে বাবার থানে আলো জ্বালার রেওয়াজের কথা বর্ণিত হয়েছে কাহার পাড়ায়। কারণ স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে, 'বাবার থানে অমাবস্যায় পিদীপ দিলে বাবা তার মঙ্গল করেন। তার ঘরে নিত্য 'সনজেতে' আলো জ্বলবে, গভীর অরণ্যে তেপান্তরে পথ হারালে পথ খুঁজে পাবে—ওই আলো কাহারদের চোখে ফুটে

উঠবে। যমপুরীতে 'অন্দকারে' থাকতে হবে না, বাবার থানে যতগুলি পিদীপ দোব, সেখানে ততগুলি পাবে।'

ভোরের দেখা স্বপ্ন সত্য হয় বলে লোক বিশ্বাস প্রচলিত। বনওয়ারী করালীর সাপ মারার পাপ স্খালনের জন্য গাজনের পাটায় চাপবে বলে স্থির করে। সে মজালসে জানিয়েছে তার প্রতি ভোরবেলাতেই আদেশ হয়েছে গাজনের পাটায় চাপার। লেখক এরপর বলেছেন,, 'ভোরের স্বপ্ন একেবারে প্রত্যক্ষ অব্যর্থ। সকলে হাতজোড় করে প্রণাম করলে দেবতাকে' (পৃঃ ১২৭)।

বসুমতী যেমন অনেক দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন, তেমনি বিনিময়ে নেনও অনেক। মধ্যে মধ্যে তাঁকে রক্ত দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষত 'মায়ের বুকে চোটাতে গেলে 'অক্ত' দিয়ে মায়ের পুজো দিতে হয়। (পৃঃ ১০৬) বনমালীও রক্তমাখা মাটি মুঠো করে জমির এক কোণে পুঁতে দিয়েছে। যে বিশ্বাস করেছে, 'রক্ত যখন নিয়েছেন মা, তখন দেবেন—তাকে দু হাত ভরে দেবেন।' (পৃঃ ১০৬)

সংহত সমাজের মানুষের জীবনে লোক বিশ্বাস—ও লোক সংস্কার কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতই ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। জীবনের সকল পর্যায়েই এই বিশ্বাস ও সংস্কারের সোচ্চার উপস্থিতি। সদ্য প্রাপ্ত জমিকে চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত করার পূর্বে বনওয়ারী যেসব আচরণ করেছে, তা সবই সংস্কার সঞ্জাত। লেখকের বিবরণ উদ্ধৃত করা যাক—'বনওয়ারী হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলে—আচোটা মাটিকে 'অর্থাৎ ভূমিকে। মনে মনে বললে—তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মার্জনা করছি। সেবা করছি তোমার। তুমি ফসল দিয়ো। আমার ঘরে অচলা হয়ে থেকো।'

বনওয়ারী শুধু প্রার্থনা করেই তার কর্তব্য শেষ করেনি। বসুমতীর আনুকূল্য পেতে সে কোঁড়ে থেকে খুলে সেখানে নামিয়ে দিলে—বাবাঠা কুরের পুজোর ফুল।' এরপর আবার তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রার্থনা 'জয় বাবা, তুমি অক্ষে কর। যেন পাথর না বার হয়। কোন জন্তু জানোয়ার না বার হয়, বসুমতীর প্রতি বনওয়ারীর আচরণ সর্ব প্রাণবাদিতার প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ বাহী।

বনওয়ারী মনে মনে ভেবেছে—প্রথম ফলন উঠলে সে ফসলের ভোগ দিতে হবে বাবা ঠাকুরের থানে…ভোগের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে এইরকম—মুর্গাসিদ্ধ বরবটি সিদ্দ আর এক বোতল পাকি মদ।'

বনওয়ারী যে ঐতিহ্যানুসারে লোক বিশ্বাস ও সংস্কারের উত্তরসূরী তার প্রমাণ তার বিশ্বাস-চাষের দ্রব্য পিথিমির দান, এ পাঁচজনকে দিয়েই খেতে হয়। বিশেষ করে

প্রথম বছরের ফসল।' সে বিশ্বাস করে, যা দেবে তা থাকবে—আসছে বছর দুনো হয়ে ঘরে আসবে। (পৃঃ ১০৪)

হনুমান পবন নন্দন বলে বিশ্বাস প্রচলিত আর তাই হনুমান নিধনে নিষেধাজ্ঞা। (Taboo) বিদ্যমান। মাইতো ঘোষের বন্দুক থাকা সত্ত্বেও এবং অনিষ্টকারী হনুমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকার পরেও তিনি তাদের গুলি করতে পারেন নি কেননা গ্রামের লোক, বাড়ীর লোক তাকে হনুমান হত্যা করতে দেয়নি। কারণ, 'উনিরা হলেন পবন নন্দন তাদের মারলে পবন ঠাকুর মেঘ আনবেন না সে অঞ্চলে', অনাবৃষ্টি হবেই। ঝড় বৃষ্টি থামাতে মানুষ নানাবিধ আচার-আচরণ পালন করেথাকে। বনওয়ারীর বউ গোপালীবালা ঝড় ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দিয়েছে, ঘটিতে ভরে জল দিয়েছে পা ধুতে (পৃঃ ১৪৯)। এখানেও সেই সর্বপ্রাণবাদের পরিচয় স্পষ্ট। দেবতার স্থানে অবস্থানকারী বলে বিশ্বাস বিশেষ বিশেষ বৃক্ষে মনোবাঞ্ছা জানিয়ে ঢিল বাঁধলে নাকি মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কালোশশীকে ভালবাসে বনওয়ারী। যাতে তাকে পরজন্মে স্ত্রীরূপে পেতে পারে সে, কালোশশীও যেন বনওয়ারীকে স্বামীরূপে পায় সেজন্য কালারুদ্রের থানে দুবেলা প্রণাম করা ব্যতীত, 'কালারুদ্রের থানে বটগাছের নামালে ঢেলা বেঁধো। আমিও তাই করব।'—মনে মনে এই পরামর্শ দিয়েছে বনওয়ারী, নিজেও এই সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করবার কথা বলেছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে 'কত্তার থানে'র মনোরম শোভার কথা কিছুটা বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। হাঁসুলী বাঁকের সহজ সরল মানুষগুলি যে বেল গাছটিতে কিছু নূতনত্বের সন্ধান পেয়েছে তাতেই অলৌকিকত্ব আরোপ করে বসেছে। অন্যান্য বেলগাছগুলির পুরানো পাতা ঝরতে যেখানে চৈত্রমাসের বিশ পঁচিশ দিন লেগে যায়, বৈশাখের আটদশ দিনের পূর্বে যেগুলিতে কচিপাতা আত্মপ্রকাশ করেনা, সেখানে বিশেষ একটি গাছের পাতা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই ঝরে যেতে দেখে এবং গাজনের পূর্বে তাতে নবকিশলয় প্রত্যক্ষ করে হাঁসুলি বাঁকের সংহত সমাজের মানুষ বিশ্বাস করেছে ঐ-গাছে কর্তার বসতি।

'গাজনের আগে তাতে পাতা দেখা দেবেই। না দিলে চলবে না যে। জাঙলের বাবা কালারুদ্রের মাথায় গাজনের পুজোয় ঐ গাছের নতুন বেলপাতা চড়াতে হয় যে (পৃঃ ১৭১) অশরীরী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হাঁসুলী বাঁকের মানুষ। ওদের বিশ্বাসে—

ঘরের কোণে, বাঁশবনের তলায়, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে, জলার পাশে, কেউ

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে বসে পা ঝুলিয়ে দেয়, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে খেলা করে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়।'

এছাড়াও তারা ভুলো, নিশি প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ভুলো মানুষকে দিক ভুলিয়ে যেখানে বিপথে নিয়ে যায়, ঠেলে দেয় অপমৃত্যুর দিকে, সেখানে নিশির ভূমিকা অন্যবিধ—'রাত্রে কেউ কাউকে ডাকবার কথা থাকলে, নিশি এসে তার রূপ ধরে অবিকল তারই কণ্ঠস্বরে ডাকে, সেও নিয়ে যায় ঐ অপঘাত মৃত্যুর পথে। (পৃঃ ১৮৫)।

বনওয়ারী দেবতার অনুগ্রহ লাভের আশায় মাকালী ও কর্তা ঠাকুরের ফুল নিয়ে দুটি রূপোর মাদলিতে পুরে স্নান করে শুদ্ধ কাপড় পরে লাল সুতোয় বেঁধে ধারণ করেছে। মনে মনে সে নির্ভীক হয়েছে এইভাবে। মাদুলী, কবচ, তাবিজ ধারণ সংহত সমাজের মানুষের বৈশিষ্ট্য।

বনওয়ারী তার প্রথমা স্ত্রী গোপালী বউকে দাহ করে ফেরার পথে সাতবার সাত জায়গায় কাঁটা দিয়েছে। কেননা লোক বিশ্বাস প্রেতাত্মা পিছনে পিছনে আসে। ঘর সংসারের মমতা সহজে ছাড়া যায় না।

হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা কিছুতেই করালীর পাকা ঘর নির্মাণের প্রয়াসকে ভাল মনে মেনে নিতে পারেনি। এর মূলে কাজ করেছিল সংস্কার। ভূত প্রেতের মত অশরীরা আকাশ মার্গে বিচরণের সময়ে যেখানে বাধা পায়, সেই ঘরে মন্দ দৃষ্টি দিয়ে যায়। ঘরের মাথা উঁচু হলে সেই ঘরের মাথাতেই এরা বসে পড়ে। পিতৃপুরুষে যা কখনও করেনি, তা যদি কেউ করে, তবে তাতে তাকে তার উপযুক্ত প্রতিফল পেতেই হবে। করালীও প্রতিফল পাবে বলে সকলে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করেছে।

তারাশংকরকে রাঢ় বাংলার কথাকার বলা হয়। কম-বেশি তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে রাঢ় বাংলার জীবন চিত্র জীবন্ত রূপে উপস্থাপিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় তিনি একটি সংহত সমাজকে যেমন জীবন্তরূপে ধরে দিয়েছেন, তেমনটি তাঁর অন্য রচনাতে ঘটেনি, বাংলা সাহিত্যের, উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসেও তাই এটি একটি বিরল সংযোজন।

আঞ্চলিকতা ঃ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

ডঃ নিমাই দাস

কোন কোন লেখকের পরিচয়ে আঞ্চলিকতার লেবেল অতি সহজেই এঁটে দেওয়া যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পরিচয়ে ঋদ্ধ। তাঁর অনেক উপন্যাসে রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক উপাদান অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন উপন্যাসে উক্ত অঞ্চলটির ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি ছিলেন বীরভূমের মানুষ। জন্মসূত্রে এই জেলার মাটি, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় আত্মীয়তা। তাই তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস লেখা। সেই সম্ভাবনাকে তিনি যথার্থভাবেই কার্যকরী করে তুলেছেন।

তারাশঙ্করের যে কটি উপন্যাসে আঞ্চলিকতার ছাপ আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, আঞ্চলিক ছাপ থাকলেই কোন উপন্যাস 'আঞ্চলিক' অভিধা পেতে পারে কিনা ? এই প্রশ্নের মীমাংসায় কেউ কেউ অগ্রবর্তী হয়েছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, "(ক) একটি বিশিষ্ট পরিবেশ ধৃত জনগোষ্ঠীর সামূহিক বিশ্বাস—বিশেষ সেই গোষ্ঠী সৃষ্টি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহু কালাগত স্মৃতি। (খ) তাদের জীবিকার সঠিক পরিচয়। (গ) তাদের অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য।"[১] তাঁদের আলোচনার সাপেক্ষে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক উপন্যাসে থাকবে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের বিশ্বস্ত চিত্র। সেই অঞ্চলটির জলবায়ু, আবহাওয়া, বহিঃপ্রকৃতি, বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে সেই অঞ্চলের মানুষের নিবিড় যোগসূত্রেরও পরিচয় থাকা জরুরী। স্থানিক বৈশিষ্ট্যে মানুষগুলি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হবে। তাদের বিশিষ্ট জীবনরূপ, আচার-আচরণ বহুকালাগত ঐতিহ্য, সংস্কার, উৎসব-সংস্কৃতি প্রভৃতি লেখক উপস্থাপিত করবেন অভিজ্ঞতার স্বচ্ছতা নিয়ে, যেন না মনে হয়, লেখক অভিজ্ঞতার অভাবকে কল্পনা দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। যেখানে লেখকের অভিজ্ঞতার অভাব থাকে,

সেখানে আঞ্চলিক উপন্যাস কৃত্রিম হতে বাধ্য। কারণ সেখানে চরিত্রগুলিকে স্থানিক বৈশিষ্ট্যসহ জীবন্ত করে তোলা সম্ভব হয় না। সুতরাং আঞ্চলিক উপন্যাস যিনি লিখবেন তাঁকে জানতে হবে অঞ্চলটির ভিতর ও বাইরের কথা, এমনকি অঞ্চলটির ধমনীস্পন্দন তাঁকে অনুভব করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "সাহিত্যে আঞ্চলিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করে—তাকে অলংকরণের অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না। কখনো কখনো কোনো বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে।" তবে এও যথেষ্ট নয়। যখন 'সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে' তাদের মনস্তত্ত্ব ও ঘটনাগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরস্পর প্রভাবী হয় তখনই লেখক যথার্থ আঞ্চলিক।"[২]

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই সচেতনতাও দরকার যে অঞ্চলটির প্রভাব লেখকের মনকে এমন আচ্ছন্ন না করে যাতে তাঁর নির্লিপ্তি ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ ঔপন্যাসিক সর্ব অবস্থাতেই মনকে নির্লিপ্ত রাখবেন। বিষয়ের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের নিবিড় সংযোগ এই নির্লিপ্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই অবস্থায় উপন্যাসটির শিল্পগুণ নষ্ট হয়। আঞ্চলিক উপন্যাস অঞ্চলের কথা হয়েও সর্বমানবিক হয়ে উঠবে। লেখক যদি নিজেকে বিষয় থেকে খানিকটা দূরত্বে রাখতে পারেন, তবেই এই শিল্পগত শর্তটি রক্ষিত হতে পারে।

যে কোন উপন্যাসেই যেমন প্রত্যাশিত লেখকের গভীর জীবনবোধের প্রকাশ আঞ্চলিক উপন্যাসেও সেটা তেমনই জরুরী। উপন্যাস জীবনরূপেরই শৈল্পিক প্রকাশ। এই শৈল্পিক আদর্শটি লেখকের জীবনবোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি পরিণত রূপলাভ করে। তখনই আঞ্চলিক উপন্যাসের অঞ্চলবদ্ধ মানুগুলি, আঞ্চলিক ঘটনাবলীদ্বারা সংগ্রথিত তাদের জীবনরূপ সীমা ছাড়িয়ে সুদূর বিস্তারী হয়, কাল ছেড়ে কালোত্তীর্ণ হয়।

আঞ্চলিক উপন্যাসের আর একটি বড় শর্ত হল, ভাষা ব্যবহারে লেখকের সচেতনতা। যে অঞ্চলের কথা লেখক বলবেন, সেই অঞ্চলের উপভাষাটি তাঁর জানা থাকা চাই। শব্দোচ্চারণে অঞ্চলবিশেষে স্বতন্ত্র ভঙ্গী থাকে, এমনকি এক ধরণের সুর থাকে, লেখককে সেই ভঙ্গী বা সুরটিকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে। উপন্যাস নাটকের মত সম্পূর্ণ সংলাপ নির্ভর নয়, কিন্তু কিছু সংলাপ থাকাও জরুরী। আঞ্চলিক উপন্যাসে মানুষগুলির মুখের ভাষা ও কথা বলার ভঙ্গীটি বোঝানোর জন্য স্বভাবতই সংলাপ প্রয়োগ করতে হবে। উপভাষায় এক-একটি শব্দ

বিশেষ অঞ্চলের অশিক্ষিত মানুষের মুখে কি উচ্চারণ রূপ লাভ করে, সেটা দেখাতে পারলে মানুষগুলির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনেকটাই ধরা পড়ে যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মানদীর মাঝি'তে জেলে-মাঝিদের মুখের ভাষা, নদীতে মাছ ধরার ভাষা, মাছবিক্রির ভাষা—অদ্ভুত সার্থকতায় ব্যবহৃত হতে দেখি। তারাশঙ্কর, রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক ভাষারূপটি সার্থকভাবেই ধরেছেন তাঁর আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিতে।)

আঞ্চলিক উপন্যাস বিশ্ব সাহিত্যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস', টমাস হার্ডির "দি রিটার্ন অফ দি নেটিভ', আর্নল্ড বেনেটের 'ফাইভ টাউনস্', এমিলি ব্রণ্টের 'উদারিং হাইটস্' প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস। এসব উপন্যাসে শক্তিমান লেখকের রচনাশক্তির নিপুণতায় আঞ্চলিক জীবন বিন্যাসের দ্বারা অখণ্ড জীবন প্রবাহেরই কল্লোলধ্বনি উত্থিত হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাস-শিল্পের জন্ম তুলনামূলকভাবে পরে হয়েছে। কাজেই আঞ্চলিক উপন্যাসও আমরা দেরীতে পেয়েছি। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যেও রচিত হয়েছে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বীরভূমের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী। 'বীরভূম' জেলা রাঢ় অঞ্চলের কেন্দ্রভূমি। সাধারণ ভাবে গোটা রাঢ় অঞ্চলই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু দেবী চণ্ডীর কাছে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিল—'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড় / কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়'। 'রাড়' শব্দটি 'রাঢ়' শব্দের উচ্চারণভেদ। (আসলে এই অঞ্চলে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব অনেক পরে এসেছিল। অনার্য জাতি ও অনার্য সংস্কৃতিই রাঢ় অঞ্চলের পুরানো সম্পদ। হাড়ি, বাগদি, বাউরী, ডোম, কাহার প্রভৃতি উপজাতিদের নিজস্ব দেশ হল এই রাঢ় দেশ। 'বীরভূম' শব্দের 'বীর' কথাটির অর্থ 'জঙ্গল'। বীরভূম-এর অর্থ তাহলে জঙ্গলভূমি। জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে স্বভাবতই নিম্নবর্গীয় মানুষরাই বসবাস করে এসেছে। পরে সেখানে উত্তর ভারত থেকে আর্যরা আসে। তারপর ক্রমে সেখানে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত সংস্কৃতি প্রাধান্য পায়। তবে পাশাপাশি নিম্নবর্ণীয় মানুষের জীবন, তাদের আবার সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি সম্বলিত সংস্কৃতিও চলতে থাকে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির পটভূমি বীরভূম জেলার একটি বিশেষ অঞ্চল, 'বাঁশবাদি' গ্রাম। কোপাই নদীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। এই অঞ্চলের

অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা বাঁশবাদি গ্রামটি স্বতন্ত্র। এখানে শুধুই কাহারদের বাস। লেখক এই উপন্যাসে কাহার সমাজেরই বিশ্বস্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। 'উপকথা' শব্দটি যদি 'রূপকথা'র অপভ্রংশ হয়, তাহলে শব্দটিতে যে কল্পলোকের কাহিনী প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে, এখানে তা হয়নি। 'উপকথা' আসলে এখানে 'ইতিকথা'র অর্থদ্যোতক। কারণ লেখক কল্পনাশ্রয়ী উপাখ্যান এখানে বলেন নি, বলেছেন বাস্তব জনজীবন কাহিনী। গ্রন্থটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন কবি কালিদাস রায়কে। উৎসর্গপত্রে লিখিত হয়েছে, "রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।" উৎসর্গপত্রের এই বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়, মাটি, মানুষ ও তাদের অপভ্রংশ ভাষা প্রয়োগ ব্যাপারে লেখক বস্তুনিষ্ঠ। শিক্ষিত মানুষের কাছে যা অজ্ঞাত, তাকেই বাস্তব থেকে চয়ন করে লেখক এখানে উপকথা তথা ইতিকথা রচনা করেছেন। এই উপকথায় জড়িত মানুষগুলির মাধ্যমে তাদের জীবন প্রবাহের ছবিটিও ধরতে চেয়েছেন। অর্থাৎ হাঁসুলী বাঁকের কাহার শ্রেণীর মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সম্মিলিত রূপের পরিচয় দিতে উদ্যোগী হয়েছেন।

আঞ্চলিক উপন্যাসেরপ্রাথমিক বৈশিষ্ট্যে যে ভৌগোলিক সীমাসংহতির কথা বলা হয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসে লেখক সেই শর্তটি পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। যে বীরভূম জেলার কোপাই নদীর তীরবর্তী 'বাঁশবাঁদি' গ্রামের জীবনচিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে তার ভৌগোলিক রূপ দিতে গিয়ে লেখক 'হাঁসুলী বাঁক' নামটির উৎপত্তি, গ্রামের অবস্থান, মূলত কৃষিজীবী কাহারদের জীবনের সঙ্গে জড়িত মাটি, ধান চাষের মাঠ, পাশাপাশি অবস্থিত অন্যান্য গ্রামের পরিচয়, কোপাই নদী, কোপাই নদীর দহ, নীলকুঠি, রেল ষ্টেশন 'চন্দনপুর', গাঁয়ের পূর্বদিক দিয়ে রেললাইনটির কোপাই নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাওয়া—ইত্যাদি, প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এইসব বর্ণনা হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির একটি ভৌগোলিক পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। ম্যাপে যেমন আমরা রেখাচিত্র পাই, এখানে এই বর্ণনাও তেমনি একটি রেখাচিত্র গড়ে নিয়ে অঞ্চলটিকে নির্দিষ্টভাবে চিনে নিতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, লেখকের বর্ণনা রেখাচিত্রের অতিরিক্ত অঞ্চলটির সজীব উপস্থাপন ঘটায়। পাঠক ভৌগোলিক পরিচয়েই অঞ্চলের মানুষের জীবন প্রবাহের একটা রূপ খুঁজে নিতে সমর্থ হন। লেখক প্রথমেই হাঁসুলী বাঁকের নামটির পরিচয় দিয়েছেন—"কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত

অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়; শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে—তখন মনে হয় রুপোর হাঁসুলী। এই জন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক।"

হাঁসুলী বাঁকে কাহারদের বসতি যে গ্রামে তার নাম 'বাঁশবাঁদি'। 'বাঁশবাঁদি'র বর্ণনায় লেখক বলেছেন—"বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিবিশেক কাহারদের বসতি।" কাহারদের আঞ্চলিক পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক জানিয়ে দেন—দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহারপাড়া—বেহারা কাহার এবং আটপৌরে কাহার। বেহারা কাহাররা পাল্কী বয়, আটপৌরেরা পাল্কী কাঁধে করে না। তারা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে জাহির করে।

এছাড়া জানতে পারি, হাঁসুলী বাঁকের একপাশে আছে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কারো শিস দেওয়ার প্রসঙ্গ অবতারণা করে কাহারদের দুশ্চিন্তা-কৌতূহলের নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টির মাধ্যমে উপন্যাসটির সূচনা। ভৌগোলিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে লেখক এই অঞ্চলের মাটির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কোপাই নদীর তীরে গ্রামটি অবস্থিত হলেও 'নদীর ধারে বাস ভাবনা বারো মাস' এই প্রবচনটি ততখানি গ্রামটি সম্পর্কে সত্য নয়, যতখানি সত্য এখানকার কড়াধাতের মাটি "এদেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি। 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায় ধু ধু করে বালি—এক পাশে মাত্র এক হাঁটু গভীর জল কোন মতে ব'য়ে যায়—মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ, ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে উঠে আগুনে পোড়া লোহার মত; কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে।"

ভৌগোলিক সীমার পরিচয় প্রসঙ্গে রাঢ়ের যে রুক্ষতার ছবি পাওয়া গেল, তাতে মানুষদের জীবনও হয়ে উঠেছে রুক্ষ, কঠোর। প্রকৃতি এবং মাটি যেহেতু গ্রামজীবনের নিয়ন্ত্রক, তাই এই দুটি উপাদানের প্রেক্ষিতেই মানুষের বেঁচে থাকার পথ প্রস্তুত করে নিতে হয়।) কাহার-পাড়ার পুরুষরা কঠোর পরিশ্রমী। কঠিন মাটিতে গাঁইতি চালিয়ে চাষের জমি তৈরী করে। এছাড়া পাল্কী-বহন করা এদের পেশা। কাজের অনুপাতে বিধাতা যেন শত দারিদ্র্যে তাদের বলিষ্ঠ চেহারার অধিকারী করেছেন। বনওয়ারীর চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—"বনওয়ারী কোশ- কেঁধেদের বংশের

ছেলে, পাকা বাঁশের মত শক্ত মোটা হাড়ের কাঠামো তার।" করালীর চেহারা বর্ণিত হয়েছে এইভাবে—"লম্বা দীঘল চেহারা, সাধারণ হাতের চার হাত খাড়াই তাতে কোন সন্দেহ নাই, সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশীবহুল হাত, সোজা পা দুখানি, লম্বা আমের মত মুখ...।" অবশ্য সবার চেহারাই যে এমন বলিষ্ঠ, তা নয়। তবে সকলেই এরা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। প্রকৃতি-প্রতিবেশে মানুষ এরকম হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতির প্রভাব প্রবল বলেই লেখক মানুষগুলোকে পরিচায়িত করেন প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিকযোগে। মেয়েদের পরিচয়কে লেখক একটি মাত্র উপমায় ধরেছেন, সে উপমায় কোন্‌টি উপমেয় ও কোন্‌টি উপমান চেনা যায় না—"কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে।" এখানে উভয়েহ উভয়ের তুলনা। কোপাই রাগলে যেমন 'দিগ্‌ বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে', কাহারমেয়ে রাগলেও তেমনি। ঝগড়া করে, শাপ-শাপান্ত করে তখন তার হুঁশ থাকে না। কিন্তু এই রাগ দুচার দিনের। তারপর আবার অতিশান্ত অবস্থা। নদী যেমন কিনারা জাগিয়ে নীচে নেমে কুলকুল শব্দ করে ব'য়ে যায়—তেমনি। কালো বউয়ের চোখ উপমিত হয় কোপাই নদীর দহের সঙ্গে। সুচাঁদ পিসী অরণ্যের মত, সুবাসীর চোখ দুটো ঠিক সাপের মত জ্বলে ওঠে। পাগল কাহার সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—"হাঁসুলী বাঁকের পাঁচালীকার পাগল কাহার মজার মানুষ। মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মতই। আকাশের রঙেই তার রঙ।" প্রকৃতি ও মানুষ এক বৃন্তে ফুটে ওঠা দুটি ফুলের মত। প্রকৃতি ও মানুষকে তাই আলাদা করা যায় না। তারাশংকর প্রকৃতির নিবিড় যোগে হাঁসুলী বাঁকের মানুষগুলির একটি বিশেষ গড়নকে এখানে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এইসব মানুষের স্থানিক রং (Local Colour)-টি স্পষ্টই ফুটে ওঠে।

স্থানিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, পুজাপার্বণ, ভাষাছাঁদ ইত্যাদির পরিচয় নিলে Local Colourটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর একটা 'রিদ্‌ম' (Rythm) আমরা উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে পেতে পারবো।

কাহারদের জীবনের গতি প্রায় সম্পূর্ণই নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের মনগড়া এক দেবতার দ্বারা, যাকে 'বাবা কালারুদ্দু' বলে তারা সম্বোধন করে। কাহার পাড়ার একপাশে বনের মধ্যে যে বেলগাছটি আছে, সেখানেই তাঁর অধিষ্ঠান। তাদের বিশ্বাস অনুসারে এই কর্তাবাবা গেরুয়া কাপড় প'রে, খড়ম পায়ে, দণ্ড হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষ আর ধবধবে পৈতের শোভায় বুক ঝলমলিয়ে, ন্যাড়া মাথায় চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। তিনি কাহারদের 'মা-বাবা'। করালী ছাড়া কাহার পাড়ার সকলেই এই দেবতায়

বিশ্বাসী এবং তারা জানে তাদের ভালমন্দ সবই কর্তাবাবার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সংঘটিত হয়।) করালী চন্দ্রবোড়া সাপটিকে মারলে 'বাবার বাহন'কে মারার আতঙ্কে সকলে আড়ষ্ট হয়ে থাকে এবং কোন সম্ভাব্য অশুভ ঘটনার উদ্বেগে তাদের দিন কাটে। কাহার পাড়ায় মাতব্বর হিসাবে বনওয়ারী করালীকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের উদ্যোগেই কর্তাবাবার পুজোর ব্যবস্থা করেছে। বনওয়ারী যেহেতু মাতব্বর সেজন্য গ্রামের মঙ্গল কামনা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বনওয়ারীর মত সব মানুষই এখানে এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবকে মানে। কাজেই পুজোর ব্যাপারে সমস্ত কাহার পাড়া মেতে ওঠে। (বাবা কালারুদ্রের প্রভাব ছাড়া নানা দেবতা-অপদেবতাতেও তাদের বিশ্বাস। "বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা।" পেত্নী, শাঁকচুন্নির সঙ্গে প্রেতযোনি, 'ভুলো', যক্ষ ইত্যাদির কথাও তারা প্রত্যক্ষ সত্যের মত বিশ্বাস করে। কাজেই দেবতা ও অপদেবতা ব্যতিরেকে তারা তাদের জীবনের অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারেনা। আঞ্চলিকতার এই মৌল লক্ষণ এই উপন্যাসে বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত।)

এই সূত্র ধরে কাহারদের পুজোপার্বণের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। 'বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ'—এই প্রবচনটি এদের জীবনে ঠিক খাটে না। তার কারণ সম্ভবত দারিদ্র্য। আমরা জানি, মানুষ যেখানে আর্থিক স্বচ্ছলতায় দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে উৎসব আনন্দের উপকরণও বেশী হয়। (কাহারদের জীবনের 'পরব'-উৎসবের সংখ্যা মোট সাতটি। "গাজন, ধরম পুজো, আমুর্তি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা বিষহরির পুজো, ভাদ্র মাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী।" এছাড়া আরও দুটি পুজো আছে ষষ্ঠী ও মঙ্গলচণ্ডী। কিন্তু সে শুধু মেয়েদের ব্রত। এতে সমস্ত কাহার পাড়া মেতে ওঠে না। তাছাড়া উক্ত ব্রত দুটি ভদ্র ঘরের মহিলাদের পাট অঙ্গনের এক প্রান্তে বসে কাহার মেয়েদের করতে হয়। সুতরাং এই দুটি সঠিক 'পরবে'র মধ্যে পড়ে না। নবান্নই এদের প্রধান উৎসব। এতে বোঝা যাচ্ছে, কাহারদের জীবিকা পাল্কী বহন হলেও সেটি প্রধান নয়। কৃষিকাজের সঙ্গেই এরা যুক্ত।) ভাগ চাষ করা অথবা বাবুদের জমিতে জন-খাটা। সেই সূত্রেই নবান্ন উৎসবে এরা মেতে ওঠে। "নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পুজো করে৻ কালারুদ্দু বাবা ঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের পাঁচ 'দব্য পন্তুত' করে আনন্দ করে খাওয়ায়।" 'বাবা কালারুদ্দে'র কাছে তাদের একটা কামনাও থাকে—সেটি ছড়ার মত সকলের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়—

'ল' লাড়লাম—'ল' চাড়লাম

'ল' পুরনোয় ঘর বাঁধলাম
নতুনে রাখার বাঁধি পুরানো খাই—
এই খেতে যেন জনম যায়—
লতুন বস্ত্র পুরোনো অন্ন—
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।

নতুন ধান বেঁধে রেখে পুরানো খেতে খেতে যেন তাদের জীবন শেষ হয়—এই অন্ন স্বচ্ছলতার কামনা প্রত্যেক চাষীরই কামনা। আঞ্চলিক দেবতার কাছে আঞ্চলিক মানুষগুলি এই আঞ্চলিক কামনাই ব্যক্ত করে আশীর্বাদ পেতে চেয়েছে।

উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান 'গাজন'-এর। গাজন উৎসবে একজন 'শিবভক্ত' হয়, তাছাড়া থাকে সাধারণ ভক্ত। পাট অঙ্গনে ভক্তরা নাচে। তাদের পরনে গেরুয়া কাপড়, গলায় 'উতুরী' অর্থাৎ উত্তরীয়, হাতে বেতের দণ্ড, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'তিপুণ্ডক', রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ। হাড়ি-ডোম-বাউরী-কাহার সবাই বাবার ভক্ত হতে পারে। শিরভক্ত গজাল-পেটা চড়কপাটার উপর শুয়ে ষোলজন ভক্তের কাঁধের 'মাঙ' অর্থাৎ বাঁশের ডাণ্ডার উপর বন্-বন্ করে ঘুরতে থাকে। পুরানো বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই উৎসব। পুরানো বছরের শেষ রাতটি অতিক্রান্ত হয়, নতুন বছরের প্রথম দিন শিব চলেন জল-শয়নে কালীদহের তলায়। ঢাক, কাঁসি, শিঙে, বাদ্যভাণ্ড ইত্যাদির ঐকতানে সঙের মিছিলে শিব চলেন জল-শয়নে। গোটা বছর সেখানে থেকে শিব আবার উঠবেন বছরের শেষে গাজনের এক মাস আগে অর্থাৎ আগামী চৈত্রের পয়লা তারিখে। এটাই এখানকার রীতি।

ভাদ্র মাসে 'ভাঁজো' পরব। ভাঁজোর বেদী রচনা করে পদ্ম-শালুকে সাজিয়ে পুজো হয়। ঢোল-কাঁসি বাজে। পচুই-মদের গন্ধে কাহার পাড়া মাতোয়ারা। 'পাঁচ আঁকুড়ি' অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুরের সরা মাথায় নিয়ে কোপাই থেকে ভাঁজোর ঘট ভরে আনে নারী-পুরুষ মিলে। একাধিক দল থাকে। সকলেই এই গানটি মন্ত্রের মত গায়—

ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আলতায় অঙের ছোপ মাটিতে দিব,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমায় ধর লো ধরা।

দুটি দলের মধ্যে ছড়ায় এবং গানে চাপান উতোর চলে। সবটাই গালাগালি। তবে এতে শাপশাপান্ত নেই। এ হল "'অঙে'র গাল—'অসে'র গাল"। নাচে-গানে-বাদ্যে-মদে কাহার পাড়া ভাঁজো পরবে মুখর হয়ে ওঠে।

উৎসব পরবে কাহার পাড়ার বিশেষ চরিত্রটি ধরা পড়ে। মদ্যপান এদের সব উৎসবেরই অঙ্গ। অশিক্ষিত অন্ত্যজদের এই উৎসব পরবে তাদের আন্তরিক জীবন-ছন্দটি ফুটে ওঠে। তাদের বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবনের অপূর্ব মেশামিশিতে এই জীবনরূপের স্বাভাবিক প্রবাহ।

কাহার পাড়ায় সামাজিক জীবনের কঠিন' অনুশাসন নেই। চারিত্রিক বিশুদ্ধি নিয়েও এদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। তবে এ নিয়ে নিন্দে-মন্দ আলাপ-আলোচনা যে হয় না, তা নয়। সুচাঁদ পিসী যখন মাঝে মাঝে হাঁসুলী বাঁকের অতীত কাহিনী বলে, তখন উঠে আসে এই সব কথা। নিজের কন্যা বসন্তের কথাও সে বলে। নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসা এখানকার কাহার জীবনে 'অং' (রং) বলে পরিচিত। বসন্ত রং লাগিয়ে ছিল জাঙলের চৌধুরী বাবুর মাতাল ছেলের সঙ্গে। সেই সূত্রে বসন্তের পেটে পাখী আসে। সামাজিক লজ্জা এবং সন্তানের পিতৃত্বের স্বীকৃতির জন্য সুচাঁদ খুঁজে খুঁজে এক জরাজীর্ণ খোঁড়া কাহার ছেলেকে এনে ঘুষ দিয়ে পিতৃত্বের দায়িত্ব নিতে রাজী করায়। এই পাখীরও বিয়ে হয়েছিল চিররুগ্ন নয়ানের সঙ্গে। তারপর তার রং লাগে করালীর সঙ্গে। নয়ানকে ছেড়ে করালীকে সে 'সাঙা'ও করে। করালীর মায়ের প্রসঙ্গটিও বাঁশবাদী গ্রামের প্রচলিত 'অঙে'রই একটি দৃষ্টান্ত। "সে সব অনেক পুরানো কথা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার একটা টুকরো গল্প, গোটা পাঁচালির মধ্যের কয়েকটা ছড়া।" সে ছড়া সকলেই ফিসফাস করে বলে, চিৎকার করে বলে শুধু সুচাঁদ। করালীর যখন তিন বছর বয়স, তখন তার বাবা মারা যায়। তার পাঁচ বছর বয়সে তার মা তাকে ফেলে পালিয়ে যায় চন্দনপুর স্টেশনের একজন লোকের সঙ্গে। কোথায় গেল কেউ জানে না। খোঁজ করার-ও কেউ প্রয়োজন বোধ করে না। এই ধারা যে হাঁসুলী বাঁকে চলে, লেখক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—"তবে হাঁসুলী বাঁকে এটা কোন নূতন ব্যাপার নয়। এমন অনেক ঘটে, অনেক ছেলে কাঁদে, আত্মীয় স্বজনে টেনে নেয় কাছে।" (স্বামীকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে রঙের খেলায় মত্ত হওয়ার মধ্যে কোন পাপের ইঙ্গিত তারা পায় না) আবার বনওয়ারীর দ্বিতীয় স্ত্রী সুবাসী করালীর সঙ্গে রঙের নেশায় মেতে বনওয়ারীর ঘর ছেড়ে করালীর সঙ্গে চলে যায়। কাহার পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারীও কি রঙের নেশাকে উপেক্ষা করতে পেরেছিল? আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর পরাণের স্ত্রী

কালোশশীর সঙ্গে নঙের নেশায় সে মত্ত হয়েছে। কালোশশীর সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারত, শুধু সে 'বেহারা কাহার' বলে হয়নি। চিরকালের জন্য কালোশশী তার পর হয়ে গেল। কিন্তু পূর্বের কথা স্মরণ করলে এখনও তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে ওঠে। সামাজিক জীবনের নৈতিক আদর্শ প্রবৃত্তির কাছে হার মানে। লেখক এই সব অন্ত্যজ মানুষদের জীবনের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপটিকেই এখানে উপস্থাপিত করেছেন, কোন কিছুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। এই স্বতঃস্ফূর্ত জীবনরূপের মাধ্যমে কাহারদের আঞ্চলিক প্রতিচ্ছবিটি ফুটে ওঠে।

(কাহারদের জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক তাদের কতকগুলি সংস্কার ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন।) আগেই বলা হয়েছে এদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এক কল্পিত দৈব শক্তির দ্বারা। সুতরাং সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা দেখি সব কিছুর উপর একটা অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাব কল্পনা করে নেওয়া এদের অভ্যাস। (যেমন, করালী যে চন্দ্রবোড়া সাপটিকে পুড়িয়ে মারলো, সেটিকে বাবা কালারুদ্রের বাহন বলে মনে করে নেওয়া, প্রায়শ্চিত্তের জন্য পূজার আয়োজন করা) (কারণ প্রায়শ্চিত্ত না করলে না-জানি কি অনর্থক কাণ্ড ঘটে—এই আশংকায় ত্রস্ত হয়ে থাকে), কর্তাবাবা যে বেল গাছটিতে থাকেন সেই গাছটিকে অন্য গাছের তুলনায় আলাদা করে দেখা, (অন্য গাছের পাতা ঝ'রে গিয়ে নতুন পাতা আসতে দেরী হয়, কিন্তু কর্তাবাবার বেলগাছটি গাজনের আগেই নতুন পাতায় সেজে ওঠে), কোন অপরাধ করলে মনে মনে বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং বাবা যে ক্ষমা করলেন, তার প্রমাণ হিসাবে বেলগাছ থেকে বেল খসে পড়ুক—এরকম কামনা করা, (কালোশশীর দহের জলে ডুবে মরার ব্যাপারটিকে কর্তাবাবার ক্রোধ বলে মনে করা, 'পিতিপুরুষের' নিয়ম লঙ্ঘন করে করালীর কোঠাঘর তৈরী করাকে গর্হিত বলে ভাবা, ইত্যাদি। আবার পিঁপড়ের সারি দেখে ঝড় জল হওয়ার সম্ভাবনায় বিশ্বাস, শক্ত মাটি কাটতে গিয়ে মাটির টুকরো লেগে রক্ত পড়লে তারা ভাবে ধরিত্রী রক্ত যখন নিয়েছেন, এখন দেবেন দুহাত ভ'রে—এই ধরণের বিশ্বাস ও সংস্কারে কাহারদের জীবন একটা বিশেষ ছাঁচ পায়।)

কাহার পাড়ায় মেয়েদের জীবনাচরণের কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। লেখক কাহার মেয়েদের কোপাই নদীর সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। রেগে গেলে তাদের ভয়ংকর রূপ। আমরা দেখেছি, সুচাঁদ ও পাখী পরস্পরে গালমন্দ করতে করতে একজন ঝাঁটা ও একজন বাঁশ নিয়ে মারামারির উপক্রম করে। মেয়েরা যার উপর

অসন্তুষ্ট হয়, তাকেই চিৎকার করে গালমন্দ করে, শাপশাপান্ত করে। সুচাঁদ গালাগালি দেয় করালীকে, সে গালাগালি শুধু শাপশাপান্তে ভরা—"যে 'অক্তে'র 'ত্যাজে' এমন বাড় হয়েছে, সে অক্ত জল হয়ে যাবেন তোমার। 'গিহিনী' 'ওগ' হবে, 'ছের উগী' হয়ে প'ড়ে থাকবে, ওই পাথরের মত ছাতি ধসে যাবে, হাড় পাঁজর ঝুরঝুর করবে।" এই গালিগালাজ কাহার পাড়ার বিশেষত্ব। লেখক জানান, "ঝগড়া হ'লে সে ঝগড়া এক দিনে মেটে না। দিনের পর দিন তার জের চলতে থাকে এবং প্রাতঃকালে উঠেই এই গালিগালাজের জেরটি টেনে তারা শুরু ক'রে রাখে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে থামে। আবার জিরিয়ে নিয়ে অবসর-সময়ে নিজের ঘরেব সীমানায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষ পক্ষের বাড়ির দিকে মুখ করে এক এক দফা গালিগালাজ কবে।" কাহার পাড়ার এই রীতিটি পুরুষানুক্রমিক চলে আসছে। লেখক বলেছেন "একে কলহ-সংস্কৃতি বলা চলে।" নয়ানের মা-ও ঠিক এমনি করেই করালীকে গালাগালি দেয়, পাখীকেও শাপশাপান্ত করে। মেয়েরা গালিগালাজ বা শাপশাপান্ত করে, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে রাগারাগির ঘটনা ঘটলে তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। সেটা মারামারি পর্যন্ত গড়ায়। করালী ও নয়ানের মারামারি এবং বনওয়ারী ও পরমের মারামারি সেই পরিচয়ই দেয়। এও তাদের জীবনের সচল প্রবাহের একটি দিক।

এরপরে ভাষাছাঁদ। (তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের ভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাদের মুখের অকৃত্রিম ভাষার গুণেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই অশিক্ষিত মানুষগুলির শব্দোচ্চারণে কিছু বিশিষ্টতা আছে। এরা 'ন' বলে 'ল', 'ল'কে 'ন', 'র'কে বলে 'অ'। যেমন 'লতুন', 'নেকন', 'অং', 'আম'। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন, "শব্দের প্রথমে র থাকলে সেখানে ওরা র-কে অ ক'রে দেয়। নইলে যে বেরোয় না জিভে, তা নয়। শব্দের মধ্যস্থলের র দিব্যি উচ্চারণ করে।" যেমন—রাতবিরাত>আতবিরেত। রীতকরণ>ইতকরণ। তাদের মুখে শব্দরূপের বিশিষ্টতার আরো কিছু উদাহরণ—উপদ্রব>রোপোদ্দরব, অপমান>রপমান, প্রতিবিধান>পিতিবিধান, ঈশ্বর>এশ্বর, অমৃত>অমৃরেতো, প্রলয়>পেলয়, রক্ষে>অক্ষে, পেট>প্যাট, রাতে>এতে, নিশ্চিন্ত>নিশ্চিন্দি, পৃথিবী>পিথিমী মেয়েদের গালাগালির ভাষার বিশিষ্টতা—"ওলো, বেটাখাকী লো, ওলো ভাতারখাকী লো, নিব্বংশের বেটী লো—তোর মুখে আগুন দি লো।")

প্রত্যুত্তরে নসুবালার গালাগালি—"নোকের জোড়া বেটাকে আমি এমনি ক'রে

নেচে নেচে খালে পঁতব। নোকের ভাতার মরবে—ওগ নাই, বালাই নাই, ধরফড়িয়ে মরবে, আমি ধেই ধেই ক'রে নাচব।"

করালীর প্রতি নয়ানের মায়ের শাপশাপান্ত—"হে কত্তাবাবা, হে বাবাঠাকুর, তুমি ক্ষেপে ওঠ বাবা। বাহনের মাথায় উঠে দাঁড়াও এইবার। আকাশের বাজ নিয়ে নষ্টদুষ্ট বদজাতের মাথায় ফেলো বাবা। কড় কড় ক'রে ডাক মেরে হাঁক মেরে ফেলে দাও বাজ। পুড়ে ফেটে ম'রে যাক ছটফটিয়ে।"

বিশিষ্টার্থে শব্দপ্রয়োগ—'চাদর'কে এরা বলে 'দোলাই'। "কালো মেঘের গায়ে রাঙা মাটির ধুলোয় লালচে 'দোলাই' অর্থাৎ চাদর উড়ছে।"

বিদ্যুৎ চম্‌কে ওঠাকে বলে 'লল্‌পে'। "ওই যে বিদ্যুৎ 'লল্‌পে' অর্থাৎ চমকে উঠেছে।"

বায়ুকোণকে বলে 'হেঁড়ে কোণ'। বাসি কাপড় বোঝাতে 'এড়া' কাপড়। অদৃষ্টকে বলে 'নেকন'। জমি চাষের উপযুক্ত হওয়াকে বাত' হওয়া উত্তরীয়কে 'উতুরী', চমকে চমকে উঠল—'চ'কে চ'কে' উঠল। মোটা মোটা অর্থে ভাকুম-কুমো' —"জ্যাল থেকে ফিরত এই 'ভাকুম-কুমো' অর্থাৎ মোটাসোটা হয়ে।" বাতাস অর্থে 'বাত্তর'। জলে ভেজা ফাঁপা মাটি অর্থে 'বতর'।

পাল্কীবহনের ভাষা—পাল্কী বহন করে চারজনে—সামনে দুজন, পিছনে দুজন। সামনে যারা থাকে তারা সুর করে ছড়া বলে, পিছনের বাহকেরা সেই সুরে সুর মিলিয়ে 'প্লোহিঁ' 'প্লোহিঁ' বলে।

—বয়ে রো পাল্কী।
—প্লোহিঁ প্লোহিঁ!
—পড়িল পিছনে
—প্লোহিঁ—প্লো-হিঁ!
—আগে চলে লক্ষ্মী—
—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—
—পিছে এস নারায়ণ।

কাহারদের কথা বলায় ছড়ার প্রয়োগ—। পাগল কাহার স্বভাব কবি। মুখে মুখে ছড়া বলে, গান বাঁধে। তাই তার কথাতেই ছড়ার প্রয়োগ বেশী। পাগলকে এই উপন্যাসের 'কোরাস' (chorus) চরিত্র বলা যায়। নসুবালাও ছড়া বলে, গান গায়। অন্য মানুষের মুখেও প্রযুক্ত হয় ছড়া।

"যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি?"

"রাজার পাপে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের পাপে 'গেরাম' নাশ"।

"যে প্যাটে ছেলে ধরে সে প্যাট কি অল্পে ভরে?"

"মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা।"

"ধর্মপথে অধিক রাতে ভাত"।

"ধরে মারে সয় বড়"।

"যার যেথা মন সেথাই বিন্দাবন'।

"অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে।"

"চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর / জ্যৈষ্ঠতে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে.।"

"সাপের লেখা বাঘের দেখা।"

"ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে রবশ্যাষে / অজাতে পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে।"

"যেমন কলি, তেমনি চলি"।

"ফাগুনের জল আগুন"।

"বেঁচে থাকুক চুড়ো বাঁশি, রহি হেন কত মিলবে দাসী।"

"আমার বিয়ে যেমন তেমন—দাদার বিয়ের আয় বেঁশে।"

"আয় ঢকাঢক মদ খেসে।"

"লণ্ট চাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে।"

"কলঙ্কিনী রাই মানিনী—নাম রটেছে দ্যাশে-দ্যাশে।"

"পেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না—
হায় সখি গো—সনজে হ'ল ঝিঙের ফুল কই ফুটল না!"

"যার সঙ্গে মেলে মন সেই আমার আপন জন"।

উপরিউক্ত ছড়াগুলির বেশীর ভাগই প্রচলিত প্রবচন থেকে সংগৃহীত। কাহারদের মুখেও সেসব উচ্চারিত হয়। এর মধ্যে কিছু ছড়া কাহার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, তাদের জীবন থেকেই উঠে এসেছে। কিছু গানও আছে। পাগল কাহারের সব গান এখানে উল্লিখিত হয়নি।

মানুষের নামকরণের ব্যাপারেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এ ব্যাপারে লেখকের মন্তব্য: "বস্তু বা মানুষের আকৃতি বা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে নিজেদের ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী বেশ সুসমঞ্জস নামকরণ করে।"

পাকু মণ্ডলের আসল নাম পাকু নয়, এটি লোকের দেওয়া নাম। সে অতি

বিচক্ষণ লোক। তার হিসাবের পাক অত্যন্ত জটিল—খুলতে গেলেও জট পাকায়। রতনের মনিবের স্থূল চেহারার জন্য নাম হয়েছে 'হেদো মণ্ডল'। নসুবালার নামটিও হয়েছে তার মেয়েলি স্বভাবের জন্য। গণ্ডারের মত চেহারা বলে গণ্ডার কাহার। পানুর বাড়ীর উঠানে এক প্রকাণ্ড নিমগাছ, সেই কারণে তার নাম 'নিমতেলে পানু'। নিমতেলে পানু ভেতরে তেতো বাইরে মিষ্টি, সে হল 'বিলাতী নিম'। সেইরকম নাকু কর্মকার। সেজো ঘোষকে তারা বলে মাইতো ঘোষ।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় একটি বিবর্তন আছে। সেই বিবর্তনে কাহার পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারীর মৃত্যু, করালীর নতুন কালের নতুন জীবন প্রবণতায় বিশ্বাস স্থাপন, বাঁশবাদী গ্রামের বিনষ্টি—ইত্যাদি লক্ষিত হয়। করালীর আবার বাঁশবাদী গ্রামে ফিরে আসা, বালি সরিয়ে সরিয়ে মাটি খোঁজা, আবার নতুন করে হাঁসুলী বাঁক নির্মাণের স্বপ্ন—এই দিয়ে উপন্যাসের পরি সমাপ্তি। এই পরিণতিতে কালের প্রবণতাকে অস্বীকার করার মানসিকতা বোধ হয় লেখকের নেই। সেই জন্যই বলেছেন 'নতুন হাঁসুলী বাঁক'। করালী হাঁসুলী বাঁকের মানুষগুলির থেকে যতই আলাদা হোক, একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। একটা মমতাবোধ গ্রামের প্রতি তার ছিলই, এমনকি বনওয়ারীর প্রতিও। সেই সূত্রেই তার গ্রামে ফেরা। কাহারেরা যে প্রকৃতি ও মাটির সন্তান, তাকে উপেক্ষা করবে কি করে? তাই মনে হয়, করালীর শেষ কীর্তিটুকু পর্যন্তই হাঁসুলী বাঁকের ধারাবাহিক ইতিকথা। এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সবই প্রতিফলিত। এক অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গীতে তারাশঙ্কর উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেও মহৎ শিল্প হিসাবে গড়ে তুলেছেন।

তথ্যসূচী ঃ

(১) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৩১০

(২) বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃঃ ১১৫—১১৬

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ঃ মহাকাব্য ঃ জীবনকাব্য

তরুণ মুখোপাধ্যায়

'সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে', এমন আশঙ্কার কথা কথা জানিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। কারণ, মহাকাব্যের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন 'উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা, যা একমাত্র 'প্রকৃতির হস্তনির্মিত নৈসর্গিক পদার্থের' সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্যই এই তুলনা বা আলোচনা কাব্যের নিরিখে। কিন্তু উপন্যাসে মহাকাব্যত্ব আছে কি না যখন ভাবি তখন কোনো আলঙ্কারিক লক্ষণ জরুরী কিনা, তা বিচার্য হয়ে পড়ে। মহাকাব্য শব্দের মধ্যে বিপুলত্ব যে আছে এতে সন্দেহ নেই। আকারে ও প্রকারে বিশালতা মহাকাব্যে কাম্য। তবু আকারগত দৈর্ঘ্য প্রস্থ যে মহাকাব্যের অনন্য মাপকাঠি নয় তার প্রমাণ দুটি সাহিত্যিক মহাকাব্য। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য মাত্র ন'টি সর্গে সমাপ্ত হয়েও মহাকাব্যের মহিমা পেয়েছে। অন্যদিকে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুড়ি সর্গে সমাপ্ত 'বৃত্রসংহার' কিংবা নবীনচন্দ্র সেনের তিনখণ্ডে সমাপ্ত 'ত্রয়ী' কোনভাবেই মহাকাব্য নয়; মহাকায় গ্রন্থ মাত্র। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আমরা প্রকৃতিগত এই মহত্ত্ব বা বিরাটত্বকে পেলে তাকেই মহাকাব্যিক উপন্যাস বলতে পারি। জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য', যে মহাকাব্যিক উপন্যাস, এমন ধারণা বহুজন সমর্থন করেছেন। এঁরা সচেতনভাবেই মহাকাব্যোপম উপন্যাস লিখতেই চেয়েছেন। মহাকাব্যে সমগ্র জাতির ইতিবৃত্ত প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মহাকাব্য তাকেই বলি—"যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।" অর্থাৎ মহাকাব্যে বা মহাকাব্যিক উপন্যাসে সমগ্র দেশ ও জাতির সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন, 'গোরা' উপন্যাসে পাই।

তবু মহাকাব্যিক উপনাস বা এপিক নভেল বিষয়ে সাহিত্যের রূপ ও রীতিতে তেমন কিছু বলা হয়নি। তার যথার্থ সংজ্ঞাও পাওয়া মুশকিল। অবশ্য উইলিয়াম হেনরি হাডসন্ তাঁর **An Introduction to the Study of Literature** গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে শুধু লিখেছেন—

......"the novelist has his choice among three

methods—the direct, or epic ; the autobiographical ; and the documentary", (p. 143)

এপিক নভেল লেখককে তিনি ঐতিহাসিকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'the novelist is an historian narrating from the outside' এর ফলে বিস্তৃতির সুযোগ ও স্বাধীনতা পাওয়া যায় বলে তিনি মনে করেন। সম্ভবতঃ মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ মনে রেখেই হাডসন এমন ভেবেছেন। কেননা পাশ্চাত্যে মহাকাব্যে দীর্ঘ কাহিনী গাম্ভীর্য খুবই প্রয়োজনীয়, তাই সেখানে অন্যতম শর্ত 'epic poetry must be an affair of evident largeness'. দেশ-কাল-পাত্র আর বিপুলত্ব বাদ দিয়েও মহাকাব্যে আমরা আর কী প্রত্যাশা করি ? এ বিষয়ে ওয়াল্টার স্কটের অভিমত প্রণিধানযোগ্য, তাঁর মতে,

"The epic poem and romance of chivalry transport us to the world of wonders, where super natural agents are mixed with human characters." (Novelists on the nove by Miriam Allot. p. 49)

মহাকাব্যের সংজ্ঞার আলোকে মহাকাব্যিক উপন্যাসের স্বরূপ বিচার করতে গেলে মনে রাখা দরকার, মহাকাব্যিক উপন্যাস আকারে ও প্রকারে বিরাট, মহৎ হবে। তার মধ্যে নানা চরিত্র, ঘটনা ও বর্ণনার বিস্তার ও বৈচিত্র্য থাকবে। কাহিনী হবে দেশকাল জাতির পরিচয়বাহী। সেইসঙ্গে উপন্যাসে যুক্ত হবে অনেক অদ্ভুত, অপ্রাকৃত ঘটনা—যা জাগাবে বিস্ময়। যে বিস্ময় সৃষ্টি করবে 'বিশালরস' এবং মহত্ত্বের ভাব। রচিত হবে 'এপিক নভেল'।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় ও জনপ্রিয় সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" অন্যতম। কিন্তু মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখতে তিনি উৎসাহী ছিলেন কিনা জানা যায় নি। টমাস হার্ডির মতো বিশেষ অঞ্চলের অনুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত রচনায় অথবা দুইকালের দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। তবু তাঁর উপন্যাসের আকারগত বিরাটত্ব সমালোচক বা পাঠককে অন্য ভাবনায় উদ্দীপিত করেছে দেখা যায়। মহাকাব্যের সঙ্গে দীর্ঘত্ব ও বিরাটত্ব জড়িয়ে থাকে বলেই সাধারণের ধারণা, বিপুলায়তন গ্রন্থ মাত্র মহাকাব্যিক উপন্যাস বা এপিকনভেল। "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"-র ক্ষেত্রেও এমন ধারণার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রবীণ থেকে নবীন সমালোচকেরা স্বীকার করেছেন উক্ত উপন্যাস মহাকাব্যিক। দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো।

১. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' গভীর সাংকেতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ও মহাকাব্যের সংঘাতধর্মী উপন্যাস। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

২. মহাকাব্যের মধ্যে যেমন কোন জাতি বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক রূপই উপস্থাপিত হয়, এ উপন্যাসেও সেই সামগ্রিক জন-কাহিনীই উপস্থাপিত হয়েছে। ···উপন্যাসটিক মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস বলা যেতে পারে। (অজিতকুমার ঘোষ / সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, ১৩৯৯)

৩ সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' মানবহৃদয়মথিত অতলগভীর জীবনবেদনার মহাকাব্য। (গৌরমোহন রায় / তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা)

তবু এইসব অভিমত নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। সমালোচকরা কিছুটা আবেগের বশে, কিছুটা সিদ্ধান্ত নিতে না-পারার দ্বন্দ্বে উপন্যাসটিকে দ্রুত মহাকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

তথাপি, দেখা দরকার, কেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' সহজেই সকলের চোখে এপিকধর্মী নভেল হয়ে উঠল। স্বাভাবিক ও সহজ উত্তর, গ্রন্থটির আয়তন ও গঠন বিন্যাস। ছয়টি পর্বে, সাতাশ পরিচ্ছেদে লেখা উপন্যাসটিতে অন্ততঃ তিনটি উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে। যেহেতু গ্রন্থের নাম 'উপকথা', তাই সুচাঁদ বুড়ির ভূমিকা কথকের বা সূত্রধারের মতো বারে বারে এসেছে। কাহারপাড়া তথা বাঁশবাদি গ্রামের ও কোপাই নদীর পুরাতন ইতিবৃত্ত সে শুনিয়েছে। উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর। তারাশঙ্করের উপন্যাসের মূল থিম নতুন পুরানোর দ্বন্দ্ব—এখানেও অন্যরূপে প্রকাশিত। কৃষিনির্ভর গ্রাম জীবন কিভাবে যন্ত্রসভ্যতার গ্রাসে নষ্ট হচ্ছে তারই ট্র্যাজিক চিত্র এখানে পাই। তবে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বিলোপকেই এখানে বড়ো ক্যানভাসে রূপ দেওয়া হয়েছে। মহাকাব্যে যেমন অদ্ভুত, অপ্রাকৃত বিষয় থাকে, তার প্রাচুর্য এখানে কম নেই। কর্তা বাবা কিংবা কালারুদ্রকে ঘিরে কাহার-পাড়ায় ভয়, সম্ভ্রম ও বিস্ময় উল্লেখযোগ্য। সুচাঁদের বলা অলৌকিক কথা বা পুরাণ কাহিনীও কাহার জীবনের অমার্জিত রূপকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছে। লেখকের মন্তব্যে, বর্ণনায় ধরা পড়েছে এই লোকবিশ্বাস।

১. হাঁসুলী বাঁকেব ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস্ দিচ্ছে। ··শিস শুনেছে সবাই। ব্রহ্মদত্তি। বেলবনের কর্তা, তিনিই এই সব ঘটাচ্ছেন।

২. ও যে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে। ওরই মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে ভেমণ করেন।

৩. এ দুনিয়া আজব কারখানা।· ·কাহাররা শোনে, ভাবে। আগে দেহের খাঁচায় অদেখা-অচেনা পাখীর কথা ভেবে কথাটা স্বীকার করত।

এমন পরিবেশে করালী কর্তা বাবা অর্থাৎ অজগর সাপটিকে পুড়িয়ে মেরে কাহারদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে। 'যারী বনাম করালীর দ্বন্দ্ব এক গোষ্ঠীজীবনের কর্তৃত্বের যুদ্ধ; আবার নতুন-নার দ্বন্দ্ব। ঐতিহ্য সচেতন বনোয়ারী একা কুম্ভ হয়ে কাহারদের বিপন্নপ্রায় ত, ধর্মবোধকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। যেমন ভাবে উপন্যাসের শেষে ার কোপাই মিশে যায় ইতিহাসের গঙ্গায়। নতুন এই হাঁসুলী বাঁকের কারিগর ী।

একটি উপন্যাসের এই কথাবস্তু গঠন ও পরিণতি মহাকাব্যিক হতে পারে না। তু যাঁরা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'কে মহাকাব্যিক ভেবেছিলেন, তাঁরা লক্ষ্য ছিলেন, এর পর্বসংখ্যা ও পৃষ্ঠার বিস্তার। দেখেছিলেন ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্রের

ভিড়, মিথ-পুরাণ লোককথার ব্যবহার। আদ্যন্ত অসংহত, শিথিল বন্ধ হয়েও এই উপন্যাসকে মহাকাব্যের ছাঁচে ফেলেছেন অজিতকুমার ঘোষ। তাঁর মতে, "মহাকাব্যের মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঘটনা, অনেক প্রসঙ্গ থাকে, এ উপন্যাসেও সেরূপ রয়েছে। মহাকাব্যের মধ্যে যেমন কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক রূপই উপস্থাপিত হয় এ উপন্যাসেও সেই সামগ্রিক জন কাহিনীই উপস্থাপিত হয়েছে।" এছাড়াও মহাকাব্যের মতো অলৌকিকতা, আরণ্য জীবনীশক্তি, বর্বরতা ইত্যাদি এখানে আছে বলে তাঁর অভিমত, "বনওয়ারী ও করালী যেন সেই মহাকাব্য থেকেই নেমে আসা দুইটি অতিকায় মহাবল চরিত্র।" অথচ তিনিই স্বীকার করেছেন, "এর মধ্যে বৃত্তের কোনো সংহতি ও একমুখীনতা নেই।...সেজন্য পাঠকের মন ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হয়। কোনো চরিত্র অথবা ঘটনা সম্পর্কে সহানুভূতি অথবা মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগবার আগেই তা সরে যায়।" পরস্পর বিরোধী এই মন্তব্য প্রমাণ করে, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আকারে বৃহৎ হলেও প্রকৃতিতে মহত্তর নয়। একইভাবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে মহাকাব্যের নিয়তিবাদ, দেবতা-মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দেখেও মন্তব্য করেন, "উপন্যাসটি যেন অতীত ও আধুনিক যুগের দুই প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিসত্তার শক্তি-প্রতিযোগিতার রঙ্গভূমি।" ফলে, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এপিক নভেল, এমন অভিধা গ্রাহ্য নয়। মহাকাব্যের মধ্যে যে সমস্ত দেশ-জাতি-যুগ আত্ম প্রকাশ করে, তা এখানে নেই। বরং এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত জীবন চিত্র সজীব হয়ে উঠেছে। এছাড়া মহাকাব্যের ভাষায় যে গাম্ভীর্য, তাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে কাহারদের কথ্য ভাষায় বা অপভ্রংশ প্রয়োগে। আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে মানতেই হবে, রাঢ় বাংলার মুখের ভাষার সতেজ প্রতিফলন এখানে ঘটেছে। যেমন,

১. 'আজা' হীনবল হলে 'আজ্য' লণ্ট।

২. যে অক্তের ত্যাজে এমন বাড় হয়েছে, সে অক্ত জল হয়ে যাবেন তোমার।

৩. বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দরলোকের উ-কি কথা?

বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক কবিত্ব ও গাম্ভীর্য রাখলেও সমগ্র উপন্যাসের পটভূ তার প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে নি। প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে শান্ত শ্রীকে ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

১. গাছে গাছে পাখী ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু ছোট মুক্তার দানার মতো টলমল করে।

কাল বৈশাখী ঝড়ের বর্ণনা উপমায় সার্থক হয়েছে—

২· হাঁ হাঁ করে হাঁকতে হাঁকতে আসছে দু'হাত দোলাতে দোলাতে, বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, সামনে যা পারে সাপটে জাপটে ধরে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে ফেলতে ছুটে চলে পাগলা হাতীর মতো, শিঙ্ বাঁকানো বুনো মোষের মতো।

দু'একটি কোকিলের ডাকে যেমন বসন্ত আসে না, দু'একটি ব্যতিক্রমী বর্ণনা বা ভাষার গাম্ভীর্য উপন্যাসকে মহাকাব্যের মর্যাদা দেয় না। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র ক্ষেত্রে এটাই সত্য।

তাহলে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এবং তাঁর এই সৃষ্টি কি ব্যর্থ ? বিগত মহিমা ? এর কোনটাই সত্য নয়। বরং জোর করে একটি লেবেল এঁটে দেওয়াই অসত্য। তারাশঙ্কর বলেন নি, তিনি মহাকাব্যিক উপন্যাস রূপে এটি লিখেছেন। সুতরাং সেই প্রয়াস অর্থহীন। বরং তিনি যা লিখেছেন, তাকেই মান্য করা, বিচার করা উচিত। যে জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক, সামাজিক চলচ্ছবি তিনি রচনা করেছেন, তা মহাকাব্য না হতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে জীবনকাব্য।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এক গোষ্ঠী জীবনের আঞ্চলিক উপন্যাস। বীরভূমের কাহারদের জীবনযাত্রাকে তিনি নিখুঁত ভাবে এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাঁশবাদি অঞ্চল ও কোপাই নদী কেমন ছিল, আদিম অরণ্য প্রকৃতি ও মানুষ কেমন অবিচ্ছেদ্য ছিল তার বিশ্বস্ত রূপ এখানে পাই। উপন্যাসটির নামকরণে 'উপকথা' জুড়ে দিয়েই তারাশঙ্কর বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি মহাকথা বা মহাকাব্য লিখছেন না। সুসভ্য প্রগতিশীল পৃথিবীর কাছে থেকেও বিচ্ছিন্ন এই বাঁশবাদি অঞ্চল আর কাহারেরা, তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় অলৌকিক কর্তাবাবা, কালারুদ্র বা সংস্কার, লোকায়ত বিশ্বাসে। তাই প্রাকৃতিক অন্ধকারের বর্ণনা উপন্যাসে ইঙ্গিতবহ হয়েছে।

> "বাঁশবাদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম
> কালের অন্ধকার। সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে
> বাঁশবাদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন করে"

আছে কোপাইনদী। যার বাঁকটা হাঁসুলী গয়নার মতো বলে জায়গাটির হাঁসুলীবাঁক। এই নদী কাহারদের ধাত্রী হলেও রহস্যময়ী। ক্ষণে রুষ্ট, ট। কাহার নারীর মতোই প্রেমে উচ্ছল, প্রতিহিংসায় ভয়ঙ্করী। এমন কাহার র নেতা বনোয়ারী। বাহুবলে ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে সকলকে শাসিত করে। ঐতিহ্যকে রক্ষা করে। আর আছে সুচাঁদ পিসি, যে কথকের মতো অতীত

ইতিহাস বর্ণনা করে যায়। কাহারেরা বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় সব কিছু। শুধু এক স্বৈরিণী মায়ের পরিত্যক্ত সন্তান করালী কিছুই মানতে চায়না। কাহার সমাজে সে এক আগন্তুক ; অনাহূত। তবু ক্রমে সে-ই মাতব্বর হয়ে ওঠে। নব্য যুবাদের শিরোমণি হয়। কলকারখানা-য় কাজের কথা টাকার কথা বলে সকলকে প্রলুব্ধ করে। কাহারদের চিরায়ত বিশ্বাসের বাহন কত্তাবাবা-র সাপকে টেনে এনে পোড়ায়। সরাসরি বাহুযুদ্ধে বনোয়ারীকে পরাস্ত করে। তারই হাতে কোপাইয়ের খাতবদল ঘটে। ছয়টি পর্ব জুড়ে এই মূল কথাবস্তু বিবৃত হয়েছেঃ কিন্তু এরি মধ্যে পাল্কী বাহক কাহারদের নানা ধর্মীয় সংস্কার রীতিনীতি, ভাঁজো পরবের, গানের কথা, আছে অবৈধ প্রেমের মদির চিত্র। যে ভালোবাসা তাদের ভাষায় 'অঙ'। কালো শশীর সঙ্গে বনোয়ারীর প্রেম, পাখির সঙ্গে করালীর প্রেম বিষামৃতময়। নারী যে বীরভোগ্যা, তার চিত্র কাহার জীবনে দুর্লভ নয়। পরমের হাত থেকে বনোয়ারী কালোশশীকে, আর নয়ানের কাছ থেকে পাখিকে ছিনিয়ে নিয়েছে করালী। রঙের খেলায় কাহার পুরুষেরা মেতে ওঠে ভাঁজো পরবে। মদ আর নাচ গানের মধ্যে জমে ওঠে রঙের খেলা। কিন্তু সেই প্রেম সর্বদা চরিতার্থ নয় বলেই গান বেদনায় মর্মরিত হয়— কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছ 'লা'.

ও আমার ভাঁজো সখি হে

আমি তোমায় দেখতে পেছি না।

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রে যে জীবনরস প্রবাহিত হয়েছে, তাও বিস্ময়কর। উপন্যাসে দু'রকম কাহার—একদল পাল্কী বাহক, অন্যদল আটপৌরে। অর্থাৎ সাহেবদের ভৃত্য। কেউ কেউ চুরি ডাকাতিও করে। বনোয়ারী কাহারকুলের নেতা ও বীর। করালী চরণও সুবিধাবাদী। কিন্তু দুটি চরিত্রই সাহসে, শক্তিতে, জৈব কামনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ বনোয়ারীর শেষ পরিণতি বড়ই করুণ। বজ্রাহত বনস্পতির মতো সে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। নিজের স্ত্রী সুবাসীকে সে ধরে রাখতে পারে নি ; করালী নিয়ে গেছে। জীবনে ও সমাজে এভাবেই বনোয়ারীর ট্র্যাজিক পরাজয় ঘটেছে। বৃদ্ধা সুচাঁদ তার গানে, অতীত চারণায় জীবন্ত। হাঁসুলী বাঁকের সঙ্গে সে যেন একাত্ম। তাই সে বলে, "হাঁসুলী বাঁকও শেষ—আমিও শেষ—কথাও শেষ।" নসুবালা চরিত্রও চিত্তাকর্ষক। আসলে পুরুষ, কিন্তু মেয়ে সেজে থাকে। মেয়েলি ঢঙে চলে, কথা বলে, গান গায়, ছড়া বলে। যদিও সে করালীর অনুরাগী, তবু শেষে কালাপাহাড়ী করালীকে পছন্দ করে নি। বনোয়ারীর অন্তিম-কালে তার সেবাযত্ন মনে রাখার মতো। তারাশঙ্করের উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেম সুখী

ও সুন্দর নয়। এখানে গোপালীবালা ও সুবাসীর সঙ্গে বনোয়ারীর প্রেম সার্থক হয় নি। করালী ও পাখির প্রেম ও চরিতার্থ নয়। কিন্তু কালোশশীর সঙ্গে বনোয়ারীর অবৈধ প্রেম অসফল হয় নি। স্বভাবে কালোশশী নম্র, নরম মনের। কিন্তু পাখি দুরন্ত স্বভাবের। সমাজ, সংসারকে পরোয়া সে করে না। জেদ করে করালীর সঙ্গে সে ঘর বাঁধে; কিন্তু সেই করালী যখন পরে সুবাসীকে আনে, সে আত্মঘাতিনী হয়। সুবাসী অনায়াসে স্বামী বনোয়ারীকে ছেড়ে করালীর বধূ হয়েছে। অথচ রূপহীনা গোপালীবালা কায়মনোবাক্যে বনোয়ারীর স্ত্রী হয়েই থেকেছে। প্রত্যাখ্যান অপমান সত্ত্বেও সে স্বামীকে ত্যাগ করে নি। ভালোবাসার এও এক স্মরণীয় চিত্র। কালো শশীর গাওয়া গানের কলি গোপালী বালারও হতে পারত—'আমার মনের অঙের ছটা তোমায় ছিটে দিলে না।' পাগল তার নামের মতোই নিরাসক্ত, খেয়ালী ও উদাসীন। গান গেয়েই সে খুশি। গান গেয়েই কাহারপাড়াকে সে মাতিয়ে রাখে। বাঁশবাদির সঙ্গে যেন তার নাড়ীর যোগ। তাই চন্দনপুর এসে এই গ্রামকে গ্রাস করলে, নষ্ট করলে, সে সুচাঁদ বুড়ির মতো ব্যথিত, আর্ত হয়। পাগলের গানে, সুচাঁদের গল্পে শেষ পর্যন্ত কাহারপাড়া আর তার সংস্কৃতি বেঁচে থাকে। তাই সুচাঁদ বলে—"কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে ?···বাবা কালারুদ্রের চড়ক পাটায় ঘোরা। সে ঘোরার শেষ নেই।" তবু এই উপকথার শেষ হয়েছে ১৯৪৩ এর বন্যায়। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের স্পর্শে। নগর এসে গ্রাম গ্রাস করেছে। ফলে 'কাহারেরা এখন নতুন মানুষ।' তারা রোগে, সর্পদংশনে আর বাবাঠাকুর বা ওঝাকে ডাকে না। লাঙ্গল-কাস্তের বদলে তুলে নেয় গাঁইতি-শাবল। করালীর সঙ্গে তারা উপকথার কোপাইকে মিশিয়ে দেয় ইতিহাসের গঙ্গায়। বলা বাহুল্য, এই পরিণতি করুণ, কিন্তু অনিবার্য। ইতিহাসের সেই 'ট্র্যাজিক উল্লাস'কে তারাশঙ্কর দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের বৃত্তে।

(তারাশঙ্কর 'দ্বন্দ্বের শিল্পী', কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে সেকাল ও একালের দ্বন্দ্বে তাঁর পক্ষপাতিত্ব তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কারণ, সেকাল তাঁর প্রিয় হলেও একালকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব তা জানেন, ফলে, উপন্যাসের উপসংহারে তিনি কোপাইয়ের সঙ্গে গঙ্গার যোগ দেখিয়ে পাঠককে যেন বড়ো বেশি সচেতন করেছেন, সেকাল এবার শেষ হলো। এই সপ্রতিভতা পরিণামী করুণ রসাবেদন ক্ষুণ্ণ করেছে মনে হয়। অথচ সুচাঁদকে দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটালে 'উপকথা' নামকরণের মর্যাদা আর বক্তব্যের সংগতি থাকত। কাহারদের মধ্যযুগীয় ভাবনা-চিন্তা-সংস্কৃতি

সুচাঁদে মূর্ত হয়েছে। তাই সে বলে, "হিয়ের জিনিস নিয়ে যদি কেউ হিয়েতে রাখত তবে থাকত। তা কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই উপকথার শেষ।" হয়ত লেখক চেয়েছিলেন, উপকথার ঘোর কাটিয়ে ইতিহাসকে উজ্জ্বল করতে। উপকথার যুগ আর নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস ভাঙা-গড়ার মধ্যে প্রবহমান। অডেনের এই প্রার্থনা যেন "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"য় প্রতিধ্বনিত—"**Show us History the operator, the organiser, / Time the refreshing river.**" এই সময়ের চিহ্ন লাঞ্ছিত হাঁসুলী বাঁক আর তার তীরবর্তী মানুষেরা লেখকের মূল লক্ষ্য। তাদের জীবনযাত্রা বিরাট নয়, মহৎ নয়, কিন্তু প্রত্যহের ধূলিস্পর্শে, কলহে, বিপদে, ঈর্ষায়, প্রেমে অপ্রেমে অ-সামান্য ও সমুজ্জ্বল। সমগ্র দেশ ও জাতির মহাকথা নয়, "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" এক সামান্য অঞ্চলের তথ্যপূর্ণ, বস্তুনিষ্ঠ চিত্র। কিন্তু সেই ছবি প্রাণরসে সঞ্জীবিত। অরুগ্ন, বলিষ্ঠ, বর্বর, হিংস্র সেই জীবনের জীবনকাব্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।'

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : ভাষা

নির্মল দাশ

শ্রদ্ধেয় হিরণকুমার সান্যাল 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র কলেবরবাহুল্যে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, এই বইয়ের শতখানেক পৃষ্ঠা কমিয়ে দিলেও এর শিল্পমূল্যে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হত না। বস্তুতঃ এ শুধু হিরণকুমারেরই অভিমত নয়, তাঁর মতো অনেক শহুরে শিক্ষিত উপন্যাসপাঠকই এই বই পড়ে প্রকারান্তরে একই অভিমত প্রকাশ করবেন। কারণ, এই বইতে বাস্তবিকই অনেক বৈচিত্র্যহীন প্রসঙ্গের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি আছে। যেমন, উপন্যাসের একেবারে গোড়াতেই লেখক রাঢ় বঙ্গের কোপাই নদীর কথা বলতে বলতে হঠাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছোটদারোগা-বাবুর উল্লেখপ্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের জনজীবনে নদীর ব্যাপক প্রভাবের কথা দুই-আড়াই পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা করেছেন, উপন্যাসের মূল প্রসঙ্গের পক্ষে এ বর্ণনা তেমন কিছু জরুরি নয়, এ বিবরণ বাদ দিলেও উপন্যাসের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। এই রকম আরো অনেক প্রসঙ্গ—বাঁশবাদি ও জাঙ্গল গ্রামের পথঘাট, বাঁশবন, লোকজন ও তাদের পুরনো ইতিহাস বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। উপন্যাস শুরু হচ্ছে এই বাক্য-কটি দিয়ে : 'হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে। দেবতা কি যক্ষ কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহারেরা'। অথচ এই শিস দেওয়ার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসের ৩৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায় মাঝের ডবল ডিমাই সাইজের ৩৬ পৃষ্ঠায় (স্মল পাইকায় ছাপা) অনেক পুরনো কথা, যা শহরের ব্যস্ততাতাড়িত আধুনিক পাঠকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। এই-রকম আরো উদাহরণ দেখানো যায় যা হিরণকুমারের অভিমতকেই সমর্থন করবে।

কিন্তু 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। বাস্তবিক, এই বইয়ের কিছু কিছু অংশ বর্জন করলে মূল গল্প বা গল্পের কাঠামো আপাততঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, পাঠকেরাও আরো কম সময়ের মধ্যে কাহিনীর শেষপ্রান্তে পৌঁছতে পারেন। কিন্তু এই অভিমত কি হাঁসুলীবাঁকের উপকথার কেন্দ্রীয় অভিপ্রায়ের প্রতি সুবিবেচনার পরিচয় দেয়? তারাশংকর আনুষ্ঠানিকভাবে একটি উপন্যাস লিখলেও এটি কি যেমন-তেমন

উপন্যাস ? এর প্রতিপাদ্য বা উপজীব্য বিষয়টি কি একটু স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয় না ? বিষয়টি একটু ভাববার মতো। বাস্তবিক, তিনি এখানে যে জীবনধারার পরিচয় দিতে চেয়েছেন তাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও যেমন আছে, তেমনই প্রতিবেশ ও পরম্পরার প্রভাবও খুব গুরুতর। প্রকৃতপক্ষে, নবীনের আত্মস্বাতন্ত্র্য ও পরম্পরাগত প্রাচীন ভাবধারার সংঘাতই তো এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে প্রতিবেশ ও পরম্পরার বর্ণনায় তো কিছুটা বেশি জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। কারণ এ এক এমন প্রতিবেশ ও পরম্পরা যার সঙ্গে এই উপন্যাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকগোষ্ঠীর কোন সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। এ যদি অঞ্চলের সীমানায় আবদ্ধ লোকসাহিত্য হত, তবে পাঠক বা শ্রোতার সঙ্গে রচয়িতার কমিউনিকেশন-ঘটিত কোন অসুবিধা হত না, কিন্তু এখানে বইটি উপন্যাস, তার পাঠক রাঢ় এলাকার গ্রামাঞ্চলের বাইরেও ছড়িয়ে রয়েছে, কাজেই খুব অনিব্যর্য ভাবেই লেখক এই এলাকার পরিবেশ ও পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য পাঠককে হাঁসুলীবাঁকের আশেপাশে মূল গল্পের পথরেখার বাইরেও ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। আর কে না জানে যে, গ্রামের প্রতিবেশে নতুনত্ব কিছু নেই। সবই চিরাচরিত, পথঘাট-গাছপালা-বাঁশবন-লোকজন—সবই গতানুগতিক। শহরের জীবন ঠিক এমনটা নয়। সেখানকার পথ-ঘাট বাড়িঘর রোজ রোজ পালটায় না বটে তবে সেখানকার ত্বরিত জীবনযাত্রায় অল্পসময়ের মধ্যেই বৈচিত্র্যের অবকাশ অনেক বেশি। কাজেই শহুরে মানুষের পক্ষে যেমন দীর্ঘদিন পল্লীবাস ক্লান্তিকর ও পীড়াদায়ক ঠিক তেমনি শহরে পাঠকের কাছেও গ্রামের গল্প পড়তে গিয়ে তার চারপাশের গতানুগতিক ফ্রেমগুলিকেও ক্লান্তিকর অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। তারাশংকর নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তাই এ বই উৎসর্গ করেছেন কবিশেখর কালিদাস রায়ের মত এমন একজন মানুষকে যিনি শহরবাসী হলেও রাঢ়ের পল্লীজীবনের মাটি 'মানুষ তাদের অপভ্রংশ ভাষা' তাঁর 'সুপরিচিত' এবং যাঁর নিজের কাব্যেও রাঢ়ের মানুষের 'প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন' চিরস্থায়িত্ব লাভ করেছে। শহুরে মানুষের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার কথা মনে ভেবেই উৎসর্গপত্রে তিনি কবিশেখরকে লিখেছেন ঃ 'এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে।' শহুরে শিক্ষিত পাঠকসমাজ ও গ্রামের এই অজ্ঞাত অবজ্ঞাত পরিবেশের মধ্যে যে অপরিচয়ের ব্যবধান রয়েছে তা কমিয়ে আনার জন্যই উপন্যাসের এই কলেবরবাহুল্য। এটা ত্রুটি নয়, এটা অতিপ্রয়োজনীয় ঔপন্যাসিক কর্তব্য।

সে কথা যাক। আসল কথা হচ্ছে, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কোনক্রমেই তাঁর শিথিল লেখনীর রচনা নয়। এ তাঁর সুচিন্তিত প্রস্তুতির ফল। পাঠকের সঙ্গে পাঠ্যের কমিউনিকেশন-ঘটিত ব্যবধান কমাবার জন্য তিনি একদিকে যেমন গল্প-বাহ্য অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসের ভাষাব্যবহারেও সতর্ক অভিনিবেশ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালের প্রায় সমস্ত ঔপন্যাসিকই চলিত বাংলায় লেখেন, তবে অদূর অতীতে এমন একটা সন্ধিক্ষণ ছিল যখন কথাসাহিত্যিকেরা লেখ্যভাষার সাধু-চলিত দুই জমিতেই বিচরণ করেছেন, অথচ সামান্য কিছু অঙ্গুলিগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া অনেক লেখকই সঠিক জানতেন না বা ভাবতেন না কেন তাঁরা সাধু ছেড়ে চলিতের জমিতে চলে আসছেন—নিতান্ত নতুনত্বের মোহে, না লেখার বিষয়বস্তুই তাঁদের বাধ্য করছে নতুন ভাষাভঙ্গী বা Code-কে অবলম্বন করতে? ভাষার দিক থেকে তারাশঙ্কর নিজেও উভচর লেখক, কিন্তু তিনি নিজেও বোধহয় লেখার ভাষা নিয়ে আগে এতটা চিন্তা করেন নি, তবে আলোচ্য উপন্যাসে তাঁর ভাষা-প্রয়োগ সুপরিকল্পিত। তিনি জানেন তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রগত জীবনধারায় যে ভাষা প্রচলিত তা হচ্ছে রাঢ়ী উপভাষার বীরভূমী বিভাষা—যা তাঁর অসংখ্য পাঠককুলের কাছে অপরিচিত, অথচ এই বীরভূমী বিভাষার ভাষিক পরিমণ্ডলকেই খুব সহজে অচেনা পাঠককুলের কাছাকাছি আনা যায় যদি গল্প বলার ভাষায় চলিত রীতি অবলম্বন করা যায়, কারণ পয়ার ছন্দের মত বাংলা চলিত ভাষারও আছে অসংকোচ শোষণশক্তি, অর্থাৎ চলিত ভাষা দেশী, বিদেশী, তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি নানা শাব্দিক উপকরণকে অকাতরে শুষে নিতে পারে; এবং চলিতের সঙ্গে বীরভূমী বিভাষার একটি আমূল সংযোগও আছে, কেননা, বীরভূমী বিভাষা ও চলিত ভাষা উভয়েই রাঢ়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্বয়ে আবদ্ধ—চলিত উপরের দিক থেকে, আর বীরভূমী নিচের দিক থেকে। কাজেই এই বইয়ের উপরিস্তরে চলিত ভাষা ব্যবহার করলে আভ্যন্তর স্তরের ভাষার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ বা বৈষম্য দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই, বরং একটা বাড়তি সামঞ্জস্য ঘটারই সম্ভাবনা। তারাশঙ্কর এই সুযোগটিরই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাই এই বইয়ের ভাষিক সংগঠনে তিনটি স্তর কিংবা আরো সঠিকভাবে বললে দুটি পূর্ণস্তর একটি উপস্তর লক্ষ্য করা যায়। একটি স্তর পুরোপুরি চলিত ভাষার, এটি লেখকের নিজের ভাষা, এই ভাষায় তিনি গোটা কাহিনী (বিবরণ ও বর্ণনাসমেত) উপস্থাপিত করেছেন, আর একটি স্তর বীরভূমী বিভাষার, এটি উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভাষা, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র এই ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা-বলাবলি করেছে। আর

উপস্তরটির ভাষা একটু মিশ্র ধরনের—এর বাইরের কাঠামো চলিত ভাষার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আছে বীরভূমী বিভাষার শাব্দিক উপকরণ, লেখক যেগুলিকে চিহ্নিত করেছেন উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে। এগুলি আসলে প্রথাগত ব্যাকরণের পরিভাষা অনুসারে অনেকটা পরোক্ষ উক্তির নমুনা। এই বাক্যগুলি চলিত ভাষায় লেখা হলেও এগুলি আসলে লেখকের বাক্য নয়, এগুলি চরিত্রেরই মনোগত বাক্য, তবে যেহেতু এগুলি উচ্চারিত নয়, সেইজন্য লেখক নিজেই এগুলির বিবরণ দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর নিজের বাক্যরচনার ভাষায়, অথচ এগুলি মূলতঃ চরিত্রের বাক্য বলে এদের মধ্যেকার ঔপভাষিক নিজস্বতাটুকু বর্জন করতে পারেন নি। বর্জন করলে তা নিতান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়ত। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে এই বাক্যগুলি চলিতভাষার শোষণশক্তির নমুনা, সেই কারণে এগুলিকে চলিত ভাষার পূর্ণ স্তরটিরই একটি উপস্তর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এবারে পূর্ণস্তর-দুটির আলোচনায় আসা যাক। প্রথমতঃ লেখকের ভাষা তথা পূর্ণ চলিতের স্তর। এ যাবৎ বাংলা চলিত ভাষার যত অনুশীলন হয়েছে তাতে দেখা যায় বাংলা চলিত ভাষার দুটি প্রান্তিক (peripheral) ও একটি মধ্য (focal) রূপআছে। এই মধ্যরূপটিই হচ্ছে চলিত ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ড বা আদর্শরূপ। এই স্ট্যাণ্ডার্ড রূপটি প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ীর একটি মার্জিত রূপ। সমগ্র বাংলা বাচকগোষ্ঠীর উপরে রাঢ়ীর প্রভাব যত ব্যাপকই হোক, রাঢ়ী মূলতঃ একটি আঞ্চলিক উপভাষা, তাই সর্বজনমান্য লেখ্যভাষার মর্যাদা পেতে হলে সেই ভাষাকে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্তি পেতেই হবে। এইজন্য চলিতের মধ্যে দেখতে পাই, তার ভিত্তিমূলে রাঢ়ীর কাঠামো থাকলেও, তার ধ্বনি ও রূপের কোথাও কোথাও আঞ্চলিকতা থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস, এর সঙ্গে রয়েছে তার অপরিসীম শোষণশক্তি যার সাহায্যে সে অনায়াসে নানা ধরনের শাব্দিক উপকরণকে নিমেষে আত্মসাৎ করে নিতে' পারে। বাংলা চলিত ভাষার লেখকেরা সাধারণতঃ এই মধ্যরূপটিরই অনুশীলন করে চলেছেন। তবে এই মধ্যরূপের দুইপাশে কখনো কখনো দুটি প্রান্ত (extremity) লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রান্তে চলিত তার বীজভাষা কথ্য রাঢ়ীর খুব কাছাকাছি থেকে গিয়েছে (এমন কি রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকেও) ; এ ব্যাপারটি ঘটেছে সাধারণতঃ সেই সব লেখকের ক্ষেত্রে যাঁরা নিজেরাই রাঢ়ী এলাকার মানুষ এবং যাঁদের চলিত-চর্চায় বুদ্ধির চেয়ে ইন্‌স্টিংক্‌টের প্রেরণাই প্রবলতর (যেমন, সিমলের নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দ, জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হুগলির দেবানন্দ-পুরের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যদিকে আর একটি প্রান্তে যাঁরা লেখার বিষয়ের সঙ্গে

সঙ্গে লেখার ভাষারও সৌকর্য-বিধানের কথা আলাদা করে মনে রেখেছেন সেইসব বুদ্ধিপ্রধান লেখকদের হাতে চলিত ভাষা তার মধ্যরূপের ন্যূনতম মাত্রাগুলি ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে ; রবীন্দ্রনাথ-সমেত সবুজপত্রের লেখকবৃন্দ ও সবুজপত্র-প্রভাবিত অন্যান্য লেখকের রচনা এর দৃষ্টান্তস্থল। তারাশঙ্কর নিজে রাঢ়ের লোক হয়েও চলিতচর্চায় কোন বিশেষ প্রান্তে ঝুঁকে পড়েন নি, তিনি যথাসম্ভব মধ্যরূপটিরই অনুশীলন করেছেন। এর জন্য তিনি একদিকে বীজ-বিভাষার শব্দগুলিকে উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে আলাদা করে রেখেছেন, অন্যদিকে যে অলংকারবাহুল্যের সূত্রে চলিত ভাষা তার মধ্যরূপ ছেড়ে অনেক দূরে সরে যাবার সুযোগ পায় সেই অলংকার তিনি যথাসম্ভব কম ব্যবহার করেছেন ; যেখানে বর্ণনার প্রয়োজনে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের ব্যবহার নিতান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, সেখানে উপমানটি নির্বাচন করেছেন বর্ণনীয় বিষয়ের পরিচিত প্রতিবেশ থেকে :

[১] আউশধানে থোড় হয়েছে—দশ মাসের পোয়াতির মত থমথম করছে আউশের মাঠ। [পৃঃ ৩৪৫]

[২] এল। হাঁসুলিবাঁকের দেশের কালবৈশাখীর ঝড়। কালো মেঘের গায়ে রাঙা মাটির ধুলোয় লালচে 'দোলাই' অর্থাৎ চাদর উড়ছে। কালো কষ্টিপাথরের গড়া বাবা কালারুদ্রের পরনের রক্তরাঙা পাটের কাপড় যেন ফুলে উঠছে। হাঁ-হাঁ করে হাঁকতে আসছে। দু'হাত দোলাতে দোলাতে, বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, সামনে যা পারে সাপটে জাপটে ধরে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে ফেলতে ছুটে চলে পাগলা হাতির মত, শিঙ-বাঁকানো বুনো মোষের মত। গাছ ভাঙে মাঝখান থেকে, ডালও ভাঙে, মূলসুদ্ধ উপড়েও পড়ে ; পাতা ফুল ছিঁড়েকুটে সারি সারি। চালের খড় উড়ে ভাসতে ভাসতে চলে যায় বানভাসি কুটোর মত। [পৃঃ ২১২-১৩]

[৩] হাঁসুলিবাঁকে বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকার বাসা বেঁধে থাকে। সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ধেয়ে ঘনিয়ে আসে সে অন্ধকার বাঁশবন থেকে বসতির মধ্যে। প্রদীপটা নিবে যেতেই সে অন্ধকার ছুটে এল যেন কোপাইয়ের বুক থেকে হড়পা বানের মত। সেই তমসার মধ্যে মদের নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারি এবং কালোশশী বিলুপ্ত হয়ে গেল। [পৃঃ ৬৭]

[৪] এক চাপ ছোলা-কলাই যখন ভিজে-ফুলে ওঠে তখন যেমন সবগুলি ছোলা থেকেই অঙ্কুর বার হয়ে মাটি ফাটিয়ে উপরের দিকে একসঙ্গে ওঠে তেমনি

ভাবে এই খবরের অন্তর্নিহিত আশার সরসতায় সকল কাহারের অন্তর থেকে
একই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। [পৃঃ ৩০]

পাঠকেরা মন দিয়ে পড়লে এই ধরনের আরো উদাহরণ খুঁজে পাবেন। এখানে যেটি লক্ষণীয় তা হলো বর্ণনীয় বিষয়ের সমপ্রতিবেশ থেকে উপমান সংগ্রহ; তা যদি না হতো, অর্থাৎ লেখক যদি প্রথাগত বা ভিন্ন কোন প্রতিবেশ থেকে উপমান সংগ্রহ করতেন তবে ভাষা বিষয়ভ্রষ্ট হতে পারত, এবং তার ফলে পাঠককেও তিনি বিষয়ের কেন্দ্র থেকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নিয়ে যেতেন। তা করেন নি বলেই ঔপন্যাসিক হিসেবে এখানে তাঁর ভাষাব্যবহার একান্তভাবেই বিষয়সচেতন। আর এই কারণেই এই বইয়ের চলিত ভাষা শুধু লেখকেরই ভাষা নয়, এই বইয়ের বিষয়-বস্তুর নিজস্ব প্রকাশমাধ্যম। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, এই বইতে তারাশঙ্কর বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে চলিত ভাষাকে একটি বিশেষ মাত্রার মধ্যে ধরে রেখেছেন। তাঁর অন্য বইয়ের কথা ভেবে দেখি নি, তবে এ বইতে তারাশঙ্কর অবশ্যই ভাষা-কুশলী।

এবার ভাষার দ্বিতীয় স্তর সংলাপের কথায় আসা যাক। এ বইয়ের সংলাপগুলির প্রায় সমস্তটাই রাঢ়ী উপভাষার বীরভূমী বিভাষায় রচিত। বীরভূমী বিভাষার ব্যাকরণ লেখক কতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে রক্ষা করতে পেরেছেন আপাততঃ সে বিচারে যাব না। কারণ সংলাপের ভাষার ঔপন্যাসিকতা নির্ণয়ে সে প্রসঙ্গ খুব একটা জরুরি নয়। এখানে যেটা খুব জরুরি সেটা হলো তাঁর সংলাপসৃষ্টি উপন্যাসের মৌল সৃষ্টিকর্ম বা সৃষ্টিধর্মের কঙ্গে কতটা যোগ রাখতে পেরেছে। এই বইতে লেখক সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন বটে, তবে সৃষ্টি করেছেন একাধিক ব্যক্তিচরিত্র যারা স্থূলতঃ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হলেও বয়স, পেশা, বিশ্বাস ইত্যাদি দিক দিয়ে একে অন্যের থেকে পৃথক, এছাড়া এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক-মানসিক তফাৎ তো আছেই। আমাদের দেখতে হবে, চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখক যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ রেখাগুলি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাদের মুখের সংলাপেও তেমনি সেই সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরা পড়েছে কি না। তারা সকলেই স্থূলতঃ বীরভূমী বিভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তবু তারা যেহেতু স্থূলতঃ কাহার হয়েও মূলতঃ আলাদা আলাদা মানুষ, সেইজন্য তাদের মুখের ভাষার মধ্যেও কিছু আমূল ব্যবধান থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। সেই সম্ভাবনা কতটা রূপায়িত হয়েছে সেটাই আমাদের কৌতূহলের বিষয়। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য সংলাপের ব্যাকরণ নয়, সংলাপের সমাজতত্ত্ব। ভাষাবিজ্ঞানে যাঁরা বিভিন্ন সমাজ-

তাত্ত্বিক মাত্রা প্রয়োগ করেন তাঁদের মতে মানুষ একই সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত হলেও বয়স, পেশা, লিঙ্গ, শিক্ষা ইত্যাদির দিক থেকে পার্থক্যের দরুন তাদের ভাষা-ব্যবহারেও নানা পার্থক্য দেখা দেয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গী এই উপন্যাসের সংলাপ-বিচারেও সমভাবে প্রযোজ্য। এখানে কাহিনীর মূল কেন্দ্র অনুন্নত কাহার-সমাজ, তবু তারই মধ্যে স্থানে স্থানে উপন্যাসের প্রয়োজনেই তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির আবির্ভাব হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই হাঁসুলীবাঁকের এই দুই সামাজিক স্তরভেদের কথা লেখক বলে নিয়েছেন (পৃঃ ১)। এইসব শিক্ষিত বাঙালির মুখের সংলাপে যে শিক্ষা ও রুচিগত পরিমার্জনা থাকা স্বভাবসংগত লেখক খুব অল্প-পরিসরেই তা ফুটিয়ে তুলেছেন। স্থানাভাবে সেইসব উদাহবণ উল্লেখ করা গেল না, তবু জাঙল গ্রামের শিক্ষিত ভদ্রলোক ঘোষ-পরিবারের স্ত্রী-পুরুষের সংলাপের (বড় ঘোষ ; পৃ• ২৭৭,৩১০, ৩১১, ৩২৯ ; মেজ ঘোষ ঃ পৃ• ৫১, ৫৩, ৩১৯ ; ঘোষগিন্নি ঃ পৃ• ৬৪, ২০৭, ৩৭৯) সঙ্গে কাহার সম্প্রদায়ের মেয়ে-পুরুষের সংলাপের তুলনা করলেই বোঝা যাবে লেখক এই এলাকার সামাজিক স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে ভাষিক পর্যায়েও কতটা সচেতন ছিলেন। শুধু ঘোষপরিবারের লোকই নয়, শিক্ষিত দারোগাবাবুর ক্ষণিক সংলাপেও (পৃ• ৭৭-৭৭) এই সচেতন পার্থক্য। এ তো গেল খুব প্রাথমিক স্তরের আন্তঃসামাজিক ভাষাবিভেদ, যেখানে কাহার ও ঘোষ পরিবার (এবং দারোগাবাবু-এর মধ্যে গোড়া থেকেই একটা মোটা-রকমের চাক্ষুষ সামাজিক পার্থক্য আছে। কিন্তু কাহার-সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে যেখানে বাহ্যতঃ কারো মধ্যে কোন প্রভেদ নেই সেখানেও বয়স, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদির দিক থেকে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ দেখা যায় সেইসব অন্তঃসামাজিক ভাষাভেদও এই উপন্যাসে চমৎকার নিরূপিত হয়েছে। অনগ্রসর সমাজের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যেসব ব্যাপারে কতকগুলি মৌলিক তফাত দেখা যায় (যেমন, পুরুষের চেয়ে নারীর ভাষা বেশি রক্ষণশীল, তাতে প্রত্নশব্দ সংরক্ষিত, তার শব্দভাণ্ডার সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ) সেইসব লৈঙ্গিক ভাষাভেদ এখানেও পাওয়া যাবে (বৃদ্ধা সুচাঁদের সংলাপ এই মন্তব্যের বড় সমর্থক), তবে তার চেয়েও বড় সূক্ষ্মতা দেখা যায় একই লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্যে বয়স, বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দিক থেকে চরিত্রগুলির ভাষিক পার্থক্য নিরূপণে। বয়ঃক্রমের দিক থেকে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি মোটামুটি দুটি বর্গে বিভক্ত ঃ প্রবীণ ও নবীন, যথা

প্রবীণ	নবীন
বনওয়ারি, পরম,	করালী, মাথাল, নটবর

পুরুষ	রমণ, প্রহ্লাদ, রতন, গুপী, পাগল, পানু বয়সে নবীন হলে ও মনে প্রাণে প্রবীণ, পৃ. ১১০) ইত্যাদি।	নয়ান ইত্যাদি।
নারী	সুচাঁদ, বসন, গোপালীবালা, বাসিনী-বৌ, কালোশশী, ইত্যাদি	পাখি, সুবাসী, পানুর বৌ, সিধু, জগদ্ধাত্রী, নসুবালা (পুরুষ হয়েও হাবভাবে মেয়েলি) ইত্যাদি।

এছাড়া পেশার দিক থেকেও চরিত্রগুলিকে অন্ততঃ দুটি স্তরে সাজানো যায় ; গ্রামবদ্ধ ও বহির্গামী। যারা গ্রামবদ্ধ তারা গ্রাম ছেড়ে বাইরে কোথাও যায় নি, পুরুষরা খেতমজুরি, দিনমজুরি, চাষবাস ইত্যাদি কায়িক শ্রম নিয়ে ব্যস্ত, আর মেয়েরা ঘরকন্না এবং কখনো কখনো খেতের কাজে পুরুষের সহযোগিতায় ব্যাপৃত, উভয়েরই জগৎ খুব সীমাবদ্ধ ; অন্যদিকে যারা জীবিকার জন্য গ্রামের বাইরে গিয়েছে বা গ্রাম থেকে বাইরে প্রায়ই যাতায়াত করে তারা বহির্গামী, বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের যোগ থাকায় গ্রামবদ্ধদের সঙ্গে তাদের আচার-আচরণে পার্থক্য ধরা পড়ে। যথা :

	গ্রামবদ্ধ	বহির্গামী
পুরুষ	বনওয়ারি, পরম, গুপী, রমণ, প্রহ্লাদ, রতন, পানু, নয়ান, ইত্যাদি।	করালী ; মাথলা, নটবর (এরা বাইরে কাজ না পেলেও বাইরে যেতে ইচ্ছুক), পাগল, ইত্যাদি।
নারী	সুচাঁদ, বসন, গোপালীবালা বাসিনী বৌ, সুবাসী ইত্যাদি।	কালোশশী (বছর দুই চন্দনপুরে কাটিয়েছে) পাখি, নসু-বালা, সিধু জগদ্ধাত্রী, ইত্যাদি।

উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে যে-দুটি বর্গে বিন্যস্ত করা হলো তাতে দেখা যায় দুটি-একটি চরিত্র ছাড়া সব চরিত্রকেই আর একটি বড় সাধারণ বর্গে বিভক্ত করা চলে, এই বর্গের বিভাজনসূত্রটি হচ্ছে সামাজিক চলিষ্ণুতা (mobility)। অর্থাৎ প্রবীণ ও গ্রামবদ্ধ বর্গের চরিত্রগুলো মোটামুটি স্থাবর, আর নবীন ও বহির্গামী বর্গের চরিত্রগুলো মোটামুটি জঙ্গম। কয়েকটি চরিত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সাধারণীকরণের সূত্র খাটে না, যেমন, পাগল, নয়ান, কালোশশী, পানুর বৌ, সুবাসী ; এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম আছে তারও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, এবং সেই ব্যাখ্যায় দেখা যাবে ব্যতিক্রমগুলি চূড়ান্ত নয়, প্রতীয়মান। যাই হোক, স্থাবর বর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো : এরা শারীরিক ও পেশাগত কারণে গ্রামের বাইরে যেতে

পারেনা, তাই এদের জ্ঞান-বিশ্বাস-চিন্তা-কল্পনার জগৎ সীমাবদ্ধ, ভাষাব্যবহারের দিক থেকে এরা প্রবর্তনার চেয়ে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ঃ অন্যদিকে জঙ্গম বর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো ঃ এরা তারুণ্যের উন্মাদনায় সাবেক পরম্পরাকে মানতে চায় না,জীবনকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করার বাসনায় গ্রামের বাইরে জীবিকার সন্ধান করে, বাইরের জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের ফলে ভাষাব্যবহারের দিক থেকে এদের মধ্যে নতুন নতুন ভাষিক প্রবর্তনার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়বর্গের প্রত্যেকটি চরিত্র ধরেই এই সাধারণ সূত্রের প্রযোজ্যতা ব্যাখ্যা করা যায়, তবে স্থানাভাবহেতু এখানে শুধু উভর বর্গের প্রতিনিধিস্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রের আলোচনা করা গেল। স্থাবর বর্গের স্ত্রী ও পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা যাক যথাক্রমে সুচাঁদ ও বনওয়ারিকে, আর জঙ্গম বর্গের স্ত্রী ও পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা যাক যথাক্রমে সিধু ও করালীকে (পাখি যদি পুরোপুরি গ্রামছাড়া হতো তবে তাকেই জঙ্গম বর্গের মেয়েদের প্রতিনিধি ধরা যেত, সেদিক থেকে সিধুর ঔপন্যাসিক ভূমিকা গৌণ হলেও সামাজিক চলিষ্ণুতার লক্ষণ তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি) বনওয়ারি ও করালীর সংলাপগুলি আগাগোড়া তুলনা করে দেখলে বোঝা যায়, বনওয়ারি কখনো বিভাষার বাইরে যায় নি, তার শব্দভাণ্ডারও সীমাবদ্ধ, মাঝে মাঝে সে অবশ্য কিছু ভাঙা-ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছে, এই ভাঙা-ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করাকে যদি নতুন ভাষিক প্রবর্তনার সূচক বলে ধরে নেওয়া যায় তবে করালীর সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। করালী ও বনওয়ারি দুজনেই ইংরেজি 'time' শব্দটির অপভ্রষ্ট রূপ ব্যবহার করেছে ঃ করালীর মুখে Time>টায়েম (পৃ. ২৫৬), বনওয়ারির মুখে Time>টায়েন (পৃ. ৮৭) এক্ষেত্রে করালীর চেয়ে বনওয়ারি মূল শব্দ থেকে বেশি দূরবর্তী অর্থাৎ নতুন ভাষিক প্রবর্তনার দিক থেকে বনওয়ারি করালীর চেয়ে অনেক পশ্চাদ্‌বর্তী ও পরোক্ষ। ইংরেজি rail শব্দটি করালীর মুখে 'রেল' ('এখন রেলের কাজ ছাড়তে পারি ?···রেলের কাজ যুদ্ধের সামিল হবে' পৃ. ১৯৩), এবং বনওয়ারির মুখে rail>অ্যাল (স্বদেশী-বাবুরা 'অ্যাল-লাইন' তোলাতুলির পর থেকে বাজার আরও লাফিয়ে চড়ছে। পৃ. ৩৪১) [নসুবালার মুখে rail-line>এল লাইন (পৃ. ৪০৩), নিমতেলে পানু ঃ অ্যাল (পৃ. ১১১)]। শুধু এই কয়টি শব্দের ক্ষেত্রেই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অন্যান্য এলাকার বাংলা-বাচকগোষ্ঠীর মত হাঁসুলীবাঁকের বাংলাভাষী কাহারগোষ্ঠীর মধ্যেও যেসব নতুন বিদেশী শব্দ (প্রধানতঃ ইংরেজি) অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে মূলানুগত্যের তুলনামূলক বিচার করলেও করালী তথা বহির্গামী বর্গের সঙ্গে বনওয়ারি তথা

গ্রামবদ্ধ বর্গের ভাষিক আচরণের তারতম্য পরিমাপ করা যাবে। যেমন, Towel> চলিত বাংলায় তোয়ালে ঃ করালী—তইলা, নসুবালা—থইলা (পৃ. ১১০) Kerosene করালী—কেরোসিন (পৃ. ৩৩১), বনওয়ারি (পৃ. ৩২৯), প্রহ্লাদ, রতন, গুপী (পৃ. ৩২৭) বসন (পৃ. ৩৩৮)—কেরাচিনি। Union Board শব্দটির উচ্চারণ করালীর মুখে পাওয়া যায় নি, তবে কাহারদের মধ্যে বিভিন্নজন (কিংবা একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে) বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করেছেঃ বনওয়ারী (পৃ. ৩২৩), প্রহ্লাদ (৩৩৮)—নিউনাইন বোড, প্রহ্লাদ (অন্যত্র), রতন-গুপী—নিউনিয়ন বোড (পৃ. ৩২৭), বসন—নেওনাইন বোড (পৃ. ৩৩৮)ঃ একই শব্দের এমন বিচিত্র অপভ্রংশ থেকে বোঝা যায় যে এরা মূলশব্দের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে কতখানি দূরে রয়েছে। শুধু ইংরেজি শব্দের যথাসাধ্য মূলানুগত্যের দিক থেকেই নয়, ইংরেজি তথা বিদেশী শব্দকে সহজে গ্রহণ করার মত সচল গ্রহিষ্ণুতা অন্যান্যদের চেয়ে করালীর মধ্যে বেশি, যেমন, হাঁসুলীবাঁকে যে প্রলয়ঙ্কর ঝড় এল, করালী তার ইংরেজি নামটিই মোটামুটি ব্যবহার করে বলেছেঃ 'পে-ল-য় ঝড় আসছে, সাইকোলন, সাইকোলন—কলকাতা থেকে চন্ননপুরের ইষ্টিশানে তার এসেছে (পৃ. ৩৭৫), অথচ অন্যান্য গ্রামবাসীর মধ্যে 'সাইক্লোন' শব্দটি একেবারেই ঢুকতে পারেনি, তাদের কাছে এই ঝড়ের জন্য অব্যাহত আছে সাবেকি দেশজ শব্দদ্বৈত 'আউলি বাউলি' (পৃ. ৩৭২)। এছাড়া, করালী যেমন অনায়াসে নানা ইংরেজি শব্দ (তা সে যত অপভ্রষ্টই হোক) ব্যবহার করেছে, অন্যান্যরা তা পারে নি, তার কারণ করালী সচল ও গ্রহিষ্ণু এবং অন্যেরা স্থাবর, তাই বিদেশী শাব্দিক উপকরণ অত সহজে তাদের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় নি। করালীর এই জঙ্গম গ্রহিষ্ণুতা শুধু ইতস্ততঃ বিদেশী শব্দের বিচ্ছিন্ন আত্তীকরণে নয়, প্রয়োজনবোধে সে নিজের মাতৃভাষার স্তর অতিক্রম করে অন্য ভাষার স্তরকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। যুদ্ধের দৌলতে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী অহিন্দী-ভাষীদের কাছে দাপট বা বিক্রম প্রকাশের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুচাঁদের উক্তি থেকে আমরা জানি হাঁসুলীবাঁকে যখন সায়েবদের নীলকুঠি ছিল তখনও সায়েবদের মুখে কাহারেরা বিক্রমপ্রকাশক হিন্দী শুনেছে (পৃ. ১৪১-৪২), কিন্তু কাহাররা নিজেরা কখনো বিক্রম প্রকাশের জন্য হিন্দীর মাধ্যম বেছে নেয় নি, প্রতিপক্ষের সামনে দাপট দেখাতে নিজেদের বিভাষাই তারা ব্যবহার করেছে। এর কারণও তাদের রক্ষণশীলতা, হিন্দী তাদের কাছে বিজাতীয় সংস্কৃতির ভাষিক প্রতিনিধি, কাজেই তাদের পক্ষে অনধিগম্য; কিন্তু করালীর পরম্পরার প্রতি আনুগত্য অনেকটা আলগা, এইজন্য দাপট প্রকাশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হিন্দীকে

সে সংস্কারবশে পরিত্যাগ করেনি ; হিন্দী তার কাছে কেবল বিভিন্ন বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোজক ভাষা (link language) নয়, দাপট প্রকাশের উপযুক্ত একটি দরকারি ভাষিক মাত্রা, এইজন্য একদিকে সে যেমন হিন্দীতে (তার পক্ষে যতটা হিন্দী বলা সম্ভব) গ্রামে আগত অবাঙালি কাবুলিকে শাসিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বাংলাভাষী ঘরামি মজুরদের তাগাদা দিয়েছে হিন্দীতেঃ জোরসে ভাই, কাম চালাও (পৃ. ২৬৮), সুচাঁদ যখন তাকে কোঠাঘর তুলতে বারণ করতে গিয়েছিল তখন সে বৃদ্ধাকে দরজা দেখিয়ে বলেছেঃ নিকালো (পৃ. ২৫৪)। নটবর, মাথলা প্রভৃতি সঙ্গীসাথিরা যখন বনোয়ারির আগমন-সম্ভাবনা উল্লেখ করে তাকে সাবধান করতে যায়, তখন সে বনোয়ারি সম্পর্কে বেপরোয়া উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করে তার বিদ্যাসম্মত হিন্দীতে —'যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাম কেয়ার করতা নেহি হ্যায়। হুঁ।' (পৃ. ৫৬)। এইসব ক্ষেত্রে শ্রোতৃপক্ষ বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও সে তার 'বিদ্যাসম্মত' হিন্দী ব্যবহার করেছে, কারণ যুদ্ধের দৌলতে হিন্দী তার কাছে কোন প্রতিবেশী স্বতন্ত্র ভাষা নয়, তার মাতৃভাষারই পরিস্থিতি-নির্ভর আর একটি মাত্রা বা স্তর, যা কেবল ক্রোধ, দাপট, বাহাদুরি ইত্যাদি বিক্রমমূলক মনোভাব প্রকাশের জন্যই সংরক্ষিত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভাষিক ব্যবহারের দিক দিয়ে করালী অনেক বেশি সচল, নমনীয় ও গ্রহিষ্ণু। করালীর সংলাপে লেখক যে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরান্তর দেখিয়েছেন, এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, লেখক নিজে করালীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন বলেই তিনি এটা করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ করালী সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেনঃ (১) কাহারপাড়ায় করালী যেন ভিনদেশী মানুষ। জাত এক হলে কি হয়, রীতকরণ আলাদা—বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলিবাঁকের কাহারপাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে (পৃ. ২৬৭), (২) চন্ননপুরের কারখানা কাহারপাড়ার কাছে বিলাত ; সেখান থেকে করালীও হয়েছে কাহারপাড়ার বিলাত-ফেরত (পৃ. ২৬৭-৬৮)।

অন্যদিকে মেয়েদের মধ্যে ভাষিক ব্যবহারের দিক থেকে সুচাঁদ ও সিধু দুই বিপ্রতীপ মেরুর বাসিন্দা। সুচাঁদ এই উপন্যাসের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ চরিত্র সেই জন্য তার মানসিক চলিষ্ণুতা ও তৎসংশ্লিষ্ট ভাষিক গ্রহিষ্ণুতার মাত্রাও সবচেয়ে কম। তার ভাষায় বাঁধাধরা অর্ধতৎসম শব্দের বাহুল্য একদিকে যেমন কাহার-সংস্কৃতির মধ্যে উচ্চ অভিজাত সংস্কৃতির বাঁকা-চোরা আলো-আঁধারির অপ্রত্যক্ষ প্রতিফলনের পরিচয় দেয়, অন্যদিকে তার ভাষায় ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের প্রাচুর্য কাহার-জীবনের সঙ্গে কোন সুদূর আদিম সংস্কৃতির নিগূঢ় সংযোগের নিশ্চিত সংকেত বহন

করে (এরকম আদিম সাংস্কৃতিক সংস্রবের ইঙ্গিত তো লেখক নিজেই দিয়েছেন (পৃ. ৯৪)। তুলনামূলকভাবে নতুন বিদেশী শব্দ সম্পর্কে সে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়াশীল : কাহারদের মধ্যে লণ্ঠনের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ, শৌখিনতার প্রতীক হিসেবে করালীর বাড়িতে তা জ্বলে, এই লণ্ঠন তরুণী পাখির কাছে 'লণ্ঠন' হলেও বৃদ্ধা সুচাঁদের কাছে 'সায়েবী কল' (পৃ. ১৯৫)। পক্ষান্তরে 'সিধু আর জগধাত্তি এরাও ঘর ছেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভালোবাসার লোক তাদের সঙ্গে নিয়ে যায় নাই। তারা এখনও রয়েছে চন্ননপুরে, এই ইস্টিশান এলাকাতেই থাকে। মাস্টারদের বাড়িতে ঝিয়ের পাটকাম করে, ইস্টিশানে পোড়া কয়লা কুড়োয়, কয়লা-চুনের ডিপোতে কামিনের কাজ করে। আবার রাত্রিকালে অন্য রূপ ধরে। বনওয়ারিই তাদের গাঁয়ে ঢুকতে দেয় নাই' (পৃ. ১০০) অর্থাৎ সিধু বহির্গামী বর্গের আদর্শ মেয়ে-চরিত্র। উপন্যাসের ১০১ থেকে ১০৩ সংখ্যক পৃষ্ঠা জুড়ে বনওয়ারির সঙ্গে তার যে সংলাপ আছে তাতেই দেখা যায় তার পরিবেশ ও জীবিকা তাকে তার নিজের সাম্প্রদায়িক বিভাষা থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, শহুরে বাবু-লোকদের সঙ্গে দিনে-রাতে নানাভাবে তার সংস্রব ঘটায় তার ভাষাও হয়েছে অনেকখানি শহুরে ও মার্জিত। সুচাঁদ তো বটেই, এমনকি বনওয়ারি তার সঙ্গে যেটুকু কথা বলেছে সেই সংলাপের সঙ্গে তার সংলাপের সমান্তরাল তুলনা করলেই বোঝা যাবে সিধু মূলতঃ কাহার হলেও কাহার-জীবনধারা থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। সিধুর ভাষার এই পার্থক্যও লেখকের সচেতন পর্যবেক্ষণের ফল : 'চন্নন-পুরে এসে সিধুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রঙকে সে অঙ বলে না। নতুনকে লতুন বলে না। ঢলকো করে চুল বাঁধে' (পৃ. ১০৩)।

এই আলোচনায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র নবম সংস্করণ ('গ্রন্থ প্রকাশ', কলকাতা-১২, ভাদ্র ১৩৭৭) অবলম্বিত হয়েছে।

শীর্ষনাম ঃ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

সমরেশ মজুমদার

(তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসসমূহের শীর্ষনামের ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন) নদী-মাটি-মানুষ থেকে নাগিনী কন্যার কাহিনী-কবি-বিচারক--আরোগ্য নিকেতন-সন্দীপন পাঠশালা ইত্যাকার বিষয়সূচীর অভাব নেই। (স্রষ্টা হিসেবে বহুদর্শী, ভূয়োদর্শনের সঙ্গে নদ-নদী-মাটির সঙ্গে নিবিড়তম সংযোগ রক্ষা করেছেন। অসংখ্য উপন্যাস, লক্ষ্যবস্তু গণনাতীত, তাদের উপস্থাপিত করেছেন কোনো রঙ না মাখিয়ে। চোখ-দুটিতে যেমন ধরা পড়েছে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় উঠেও এসেছে তেমনি করে। আবেগ তাঁর মজ্জাগত অথচ বস্তুদৃষ্টি অভিনন্দনযোগ্য, বাংলা উপন্যাসের সোস্যাল-রিয়ালিজমের অন্যতম পুরোধা অথচ কোনো তত্ত্ব বা তথ্যের ধার ধারেন নি।) 'কল্লোল' 'কালিকলমে'র সময়কার লেখক তবু বিদেশ থেকে ধার করা বাস্তবতার বঙ্গীকরণের তাগিদ অনুভব করেন নি। কোনো সাঙ্কেতিক প্রতিভাস বয়ে আনবার কথা তার আদৌ মনেই পড়েনি। 'গণদেবতা'র পূজারী 'ধাত্রীদেবতা'কে স্মরণ করেছেন। 'কালিন্দী' নদী মানুষের জীবনধারা কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করে তার সংবাদের সঙ্গে কালীয় অনিত্য জীবনে নিত্য প্রবহমান নদীর ধারার চিরন্তনতাকে ধরে রেখেছেন। বাগ্দী-কাহার-ডোম কাউকেই অচ্ছুৎ বলে মনে করেন নি। সাঁওতালদের জীবনের গতি-প্রকৃতি-যাযাবরী প্রবৃত্তি, আগমন, বসবাস, স্থানান্তরের ইতিবৃত্ত জানিয়েছেন। ইতিহাসকে ধরে না রেখে আপাত তাচ্ছিল্যময় কাহিনীর মধ্যে চিরস্থায়িত্বের দৃশ্য নির্মাণ করেছেন। এমন কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি যাতে সাফল্য লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নগর জীবন অপেক্ষা গ্রাম্য পরিবেশেই তাঁর নির্ভরতা বেশি, স্বস্তিও, তাই সাময়িকপত্রে 'নাগরিক' উপন্যাস পূর্ণ করবার উৎসাহ পাননি। অথচ একই লেখা অসংখ্যবার সংশোধনের শ্রম তাঁর চেয়ে বাংলা উপন্যাসে কেউ দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। কাহিনী-উপকাহিনীর সঙ্গে উপকথাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ছোটকাহিনী অর্থে উপকাহিনী ক্ষুদ্র কাহিনী বোঝাতে চান নি। (বস্তুত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র আকার দীর্ঘকাহিনীরই সমীপবর্তী।) পরিভাষাবিদ্ বলেন, 'উপকথা কি তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব আছে। কারো মতে 'রূপকথা' থেকে 'উপকথা'র সৃষ্টি। কেউ আবার মনে করেন

'উপকথা'র সঙ্গে অদ্ভুত ঘটনা ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়েই 'রূপকথা'র সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র আবার ছোটকাহিনী বা আখ্যায়িকাকেই উপকথা বলেছেন। তাঁর মতে, তাঁর ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলি 'উপকথা'। কেউ কেউ আবার ছেলে ভুলানো গল্পকে উপকথা মনে করেন। ভূত প্রেত দৈত্য মানব নিয়ে রচিত শিশু সাহিত্যকেও 'উপকথা' বলা হয়। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস রচনা করে 'উপকথা' শব্দটিকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (উপকথা বলতে এখানে আমরা বুঝব কোন বিশেষ গ্রাম্য অঞ্চলের লোকজন-প্রথা-বিশ্বাস-জীবিকা বৃত্তান্ত। জীবনধারা সম্পর্কিত জীবন্ত চালচিত্রের উপস্থাপন—যাতে গল্পের কাঠামো (plot) থাকবে না, কিন্তু গল্পরস থাকবে। যা রিপোর্ট না হয়ে সু-সাহিত্য হবে।) তারাশঙ্করের উপন্যাসটিই এক্ষেত্রে উপকথার উদাহরণ বলে গণ্য হবে। অরুণ বসু লেখেন তৃতীয় দশক থেকেই ইতিহাসের মতো অধ্যায় বিন্যস্ত ঘটনা বিবরণ রীতি, পাঁচালির মতো গতানুগতিক একঘেঁয়ে সুরেলারীতি, রূপকথা উপকথার স্পোকেন ন্যারেটিভ রীতির চল হচ্ছিল। মহাযুদ্ধের ইতিকথা, পথের পাঁচালী, পুতুল নাচের ইতিকথা, শহরবাসের ইতিকথা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ইতিকথা প্রভৃতি নামকরণে তার আভাস মেলে। হয়ত হার্ডির 'সাগা' ও ব্যালাডধর্মী উপন্যাসরীতি দূরপ্রেরণা হয়েছে কারো কারো কাছে।

উপর্যুক্ত কাহিনীর বিচিত্রতা লোকবিশ্বাস, সংস্কার, প্রচলিত লোককথা, লোক-জীবন কীরকম বিস্তৃত আঞ্চলিক মানুষের ওপর কী অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার বিবৃতিতে উপন্যাসটি পরিপূর্ণ। (হাঁসুলীর বাঁকের এই অংশ আপাতত স্থান সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয় বটে কিন্তু কাহারের জীবনে যুগবাহিত ধারণা তাদের পুরাতনকাল থেকে, আদিমতম বিশ্বাসের জগৎ থেকে মহাযুদ্ধের প্রবাহের কাল পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছে। উপকথা একদিকে সুচাঁদের মতো প্রাচীনা নারী, অন্যদিকে পাগল নামক ব্যক্তিটির গীতের মধ্য দিয়ে খরতর স্রোতে বাহিত হয়ে চলেছে। কাহারপাড়ার আদি ইতিহাস গল্পচ্ছলে শুনিয়ে গেছে সুচাঁদ, অনাধুনিক থেকে একালের কথা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উভয় যুগের সেতুবন্ধনের কাজে ব্যাপৃত রেখেছে পাগল। তারাশঙ্করের সাহিত্যে নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব আছে সংঘাত নেই, দ্বৈতরূপ আছে ভাঙনের দুর্বিপাক নেই। অস্তিত্ববাদ তাঁর সাহিত্যের মূলকথা, সংশয়বাদী নন, দ্বিধার অচলায়তনকে সরিয়ে স্থিতির সৌধ নির্মাণই তাঁর লক্ষ্য। আলোচ্য উপন্যাস তা থেকে পৃথক নয়। নিয়তির চরম ভূমিকা তাঁর কোনো উপন্যাসে চরিত্র ও পটভূমি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছে। হাঁসুলী

বাঁক তারই ধারাবাহী, কর্তাবাবা, কালারুদ্র প্রাচীন কিংবদন্তী ও ব্যাখ্যায়নের সূত্র ধরে সমগ্র উপন্যাসকে ঘিরে রেখেছে। তবু এরই একদিকে বনোয়ারী, অন্যদিকে করালী, একজন অলৌকিক বিশ্বাসের সংরক্ষক, সেই অমোঘ নিয়ন্ত্রীর প্রতিস্পর্ধী। 'সুচাঁদ যে কাহার-সমাজের ঐতিহ্যরক্ষক ও আধিদৈবিক বিপদের সংকেতবাহী, মাতব্বর বনোয়ারী তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচালক ও ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধনের প্রধান হোতা। সুচাঁদের দৃষ্টি অতীত-পরাবৃত্ত ও ঊর্ধ্বলোক-নিবিষ্ট—বর্ত্তমান তাহার নিকট জীবনধারণের কালাধার হইলেও তাহার মানসলোকে ইহা গৌণ। ঠিক অতীতের ছাঁচে বর্তমান ঢালা হইতেছে কিনা কালারুদ্র ও কর্তা-বাবার ইঙ্গিত ঠিক মত ইহার মধ্যে অনুসৃত হইতেছে কিনা, সেদিকে তাহার অতন্দ্র দৃষ্টি।' (নিয়মের দাসত্ব বনোয়ারীর মতো যার ধাঁচে নেই, সেই করালী বিশ্বাসের মর্মমূলে আঘাত হেনে নবযুগের বার্তা আনছে, তার পিছু পিছু বিজ্ঞান-নির্ভর বর্তমান অতীতকে নিশ্চিহ্ন করে সুপ্রতিষ্ঠ। বর্তমানকে উপকথার দেশে প্রাণ দান করছে। প্রকৃতি যেমন মানুষের প্রচলিত জীবনযাত্রাকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিচ্ছে, তেমনি কর্ত্তাবাবার থান, তার অবস্থানকারী শিমুলবৃক্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করছে, অতীতমুখী বনোয়ারি দীর্ঘ অসুস্থতার পর বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে দেখে বাবার থান নেই, বৃক্ষ নেই, তাঁর বাহন চন্দ্রবোড়া নেই, যুদ্ধের সরঞ্জাম নিশ্চিহ্ন ভূমির ওপর হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে বনোয়ারি নয়, এমনকি করালীও নয় প্রভুত্ব বিস্তার করেছে হাঁসুলী বাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ। কাহারকুলের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য কোপাই নদী, দহ ও ভূমি, ভূমির উপরিস্থিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল—আর সবই তার কাছে অনিত্য।)

উপন্যাসের আদ্যপর্বে হাঁসুলী বাঁকের নামকরণের ব্যাখ্যা লিখেছেন তারাশঙ্কর তা যেমন বাস্তবসঙ্গত, তেমনি একই সঙ্গে সাঙ্কেতিক সঙ্কেতবহ, কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁধটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যল্প অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, যেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলীর গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপায়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলার সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে—তখন মনে হয় রুপোর হাঁসুলী। এই জন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি। লাট্ জাঙুলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই

সামান্য খানিকটা মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম, বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম ; দুটি পুকুরের চারি 'পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি'। রূপোর এই হাঁসুলীকে কেন্দ্র করে কোপাই নদী, জাঙল গ্রাম, বাঁশবাঁদি নিয়ে এই উপকথার সাম্রাজ্য। 'গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহা ইতিহাস নহে, উপকথা। ইহার জীবনযাত্রা অতি প্রাকৃতের ঘন-কুহেলিকা মণ্ডিত ; পৌরাণিক কল্পনা, অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ও আখ্যান, সদ্য অতীতের ঘটনা প্রতিফলিত জীবনদর্শন—এ সমস্তই প্রাত্যহিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবনদর্শন অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থিরীকৃত —তাহাদের জীবনে যাহা কিছু ব্যতিক্রম ও বিপর্যয়, যাহা কিছু আকস্মিক ও অসাধারণ সবই দেবলীলা অদৃশ্য শক্তির দুর্বোধ্য অভিপ্রায় হইতে উৎক্ষিপ্ত'।[৩]

(সমগ্র উপন্যাস জুড়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার জের চলেছে, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কাহিনীর অন্য সব অংশ উপকথার প্রয়োজনে এসেছে, প্রাচীনতম কাল থেকে একমাত্র বিশ্বাসের বস্তু চলে স্থিরীকৃত। তাই সুচাঁদের মুখে এর ইতিবৃত্ত শোনা যায়, বনোয়ারী তারই উত্তরসূরী। আদিমতা অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত উপন্যাসে, তার সঙ্গে, পুরুষ ও নারী সমাজের সম্পর্ক এর সঙ্গে যোজিত হয়েছে, সাপবাঘ, কর্তাবাবা, তার দহ, তার সঙ্গে 'নেকন' বা অ-দৃষ্টবাদ সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মুখ্যত উপন্যাসের নামকরণকে সরাসরি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, কেন্দ্রীয় চরিত্র ও কেন্দ্রীয় ঘটনা, নিয়ন্ত্রীশক্তি কেন্দ্রীয় চরিত্রের থাকলে তার যাথার্থ্য নিরূপিত হয় অথবা ব্যক্ত কেন্দ্রীয় বিষয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে চরিত্রকে ঘিরে রয়েছে তার পরিবেশ, সেই পরিবেশের বিরাট অংশ সংস্কার বা বিশ্বাসের রূপধরে এসেছে। পরিবেশ বা বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। অলৌকিক কর্তাবাবা বা কালারুদ্রের নির্দেশে বাঁকের জীবন নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, তিনি প্রথম এবং তিনি শেষ। এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনেছে করালী, তার বাহনকে মেরেছে, তার অবস্থানের বৃক্ষের উপরি শাখায় উঠেছে সংস্কারকে ভেঙে, তবু বনোয়ারীর বিশ্বাসে ফাটল ধরে নি, কাহিনীর উপান্তে যেখানে বাবার থান বা বৃক্ষ বা বাহন কারুর অস্তিত্ব নেই, তখন সে বিস্মিত, লাঁ ফঁতেন যেমন বলেছিলেন, **'We believe no evil till the evil's done'**। উপকথায় যে আদিম বা 'অঙে'র খেলার লীলা বনোয়ারীকে তা ছুঁয়ে গেছে কালোশশীকে কেন্দ্র করে যা এই আদিম সমাজে স্বাভাবিক সমস্ত বিপর্যয়ের মূলে এগুলির ভেতরে অলৌকিকতাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে সে মনে করেছে।) সুচাঁদ বলেছে, এই বাবার দয়াতেই হাঁসুলী বাঁকের যা কিছু—

চৌধুরীরা যখন গৃহস্থ, নীলকুঠির গোমস্তা, কুঠি ভাঙা-ভাঙা অবস্থা সেবার এল কোপাই নদীতে প্রলয়, দুপুর থেকে কোপাই ভাসল 'হুদে'র পুকুরের শাহীপাড় পর্যন্ত ডুবে গেল, দেখতে দেখতে পঞ্চ শব্দের বাদ্যি বাজিয়ে নদীর এ আলোর 'আলোবীন্নী' করে এক বিয়ে শাদীর নৌকোর মত নৌকো এল। বাঁকের দহের মাথায় সাহেব দেখছিল, সে মেমের বারণ না শুনে ঝাঁপ দিল মেমও নামল, সাহেব এককোমর জল ভেঙে চলল নৌকো ধরতে। হঠাৎ ওই বাবার থান থেকে বেরিয়ে এলেন কর্তা। ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষীর মালা, পরনে কাল কাপড়, পায়ে খড়ম পরে জলের ওপর খড়ম পায়ে চলে এলেন। এই পুরনো কথায় সূত্রে বহুকাল বাদে বনোয়ারী, চমকে দেখলো, 'বাবার থানের আলো আকাশে বিদ্যুৎ হয়ে 'ললপাচ্ছে' অর্থাৎ চমকাচ্ছে। আরো পরে পরমের সঙ্গে লড়াইয়ের পর কালোশশীকে নিয়ে নদীর ধারে এসে ক্ষত ধোয়ার জন্যে জলে নেমেছে, আহত পরম ছুটে আসছে দেখে কালোশশী ছুটতে লাগল। 'সর্বনাশ!' সামনে যে 'সাহেবডুবিরদহ'; কেউ বলে 'যখের দহ'; কাহার পাড়ার লোক বলে কত্তার দহ। কত্তা ওই দহে চান করেন। কালারুদ্র ওই দহে জলশয়ানে আছেন। বনোয়ারীর কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হাঁসুলী বাঁকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা, কালোশশীর অলৌকিক মৃত্যুর পর স্থির করে মা শ্মশানকালীর রক্ষাকবচ ধারণ করবে, কত্তাবাবার পুষ্পও মাদুলীতে পুরে ধারণ করবে। তাই সে নিশ্চিন্ত। ভূত প্রেত যত নিষ্ঠুর—দেবতা তত ভয়াল। এই সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই চলে হাঁসুলী বাঁকের রাত্রি দিন।

আবার বাঁশবাঁদির দক্ষিণ মাথা থেকেই প্রচুর ধোঁয়া উঠছে আকাশে। বাঁশবেড়ের বাঁশের মাথাগুলি ঢেকে বেগে কুণ্ডলী পাকানো রাশিরাশি ধোঁয়ার মেঘ; আষাঢ়ের মেঘের মত জমাট ধোঁয়ার মেঘ। তাই বনোয়ারীর বুক বড় তোলপাড় করে ওঠে—'কত্তার ক্রোধ'। এদিকে উপকথার কাহারদের জীবনে নদীর ভাবনা চার মাসের—আষাঢ় থেকে আশ্বিন। 'আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভ'রে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে যেন এক-একদিন বাপমা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাড়া পড়শীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইঁট পাটকেল পাথর দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ওই নদী ওঠে ভেসে'। এর সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য বজায় রাখে উপন্যাসের নিম্নধৃত অংশটি—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় তুফান

বানে ঝাঁপ খেয়ে যুবতী বউ পাড়ায় যার উপরে মন পড়ে তার কাছে, তার গাছের উপরে তার পাতা সংসারেই গিয়ে ওঠে বসে। পাখীর মা বসন্ত যৌবনে নিত্য রাত্রে বেশভূষা ক'রে একাই চ'লে যেত চৌধুরী বাবুদের গাঁয়েব ধারের বাগানে, কোনদিন ফিরত গভীর রাত্রে, কোনদিন ভোর বেলা। পাখীও আজ চ'লে গেল করালীর বাড়ি'। একসময় বনওয়ারী টলতে টলতে কালোশশীকে নিয়ে কোপাইয়ের গর্তে এসে নামল। ('সমাজ-ব্যবস্থার শৈথিল্য কাহারদের জীবনের নানাক্ষেত্রে প্রসারিত, যৌন শিথিলতা তার একটি; এ কেবল 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বৈশিষ্ট্য নয়, সাধাবণভাবে অন্তজ শ্রেণীর জীবনধারারই প্রকৃতি। তবু অলৌকিক কুসংস্কার ও লৌকিক বিশ্বাসের বাবার ভূত প্রেত দানো দৈত্যের একদিকে, উৎসবও গান অপরাংশে —এ দুয়ের চিত্রণে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বৈশিষ্ট্যময়—বিচিত্র উপকরণসমূহ একত্রিত হয়েছে যা একান্তভাবে এই অঞ্চলের জীবন বোধের পরিচয় জ্ঞাপক। আঞ্চলিকতা—বর্ণনায় তারাশঙ্কর ঋদ্ধ, তাঁর সমগ্র সাহিত্যে তার পরিচয় মেলে। লোক-সংস্কৃতির প্রকাশও তাঁর রচনায় সুলভ। লোকজীবনের বিস্তৃত কাহিনী লভ্য তাঁর উপন্যাস গল্পে। এই সাধারণ রীতির বাইরে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' অনন্যতার অধিকারী, সঙ্গত কারণেই লেখক শীর্ষনামের ক্ষেত্রে অন্যথা ভাববার অবকাশ পান নি, পাঠকের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রেও সহজ গ্রাহ্য বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে।

একথা সত্য যে, অলৌকিক সংস্কার বিশ্বাস ও বাণ গোঁসাই, কালরুদ্র, কর্তাবাবা উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করে আছেন, কিন্তু লেখক এখানেই থেমে থাকেন নি, মনুষ্যত্বের বিজয় পতাকা উড্ডীন দেখতে তিনি উৎসাহী বেশি। পুরাতনের প্রতি মোহ থাকলে অবশ্যম্ভাবী আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত মহিমায় দেখাতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হন নি, উপন্যাস প্রথম ও মধ্যলগ্নে প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারের দীর্ঘতম অধ্যায় শেষ করে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় এ সকলের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হতে সময়ও ব্যয় করেন নি বেশি। কাহারকুলের জীবনে তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। লেখক এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে স্থাপন না করে দুইকালের দুই প্রতিভূ বনোয়ারি ও করালীর মধ্যকার সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিশিষ্ট বিষয়বস্তু। '...অতীত আর বর্তমান—ক্রমাবক্ষয়ী পুরাতন আর অপ্রতিরোধ্য নবীন—এই দুয়ের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের শিল্পী সত্তার দ্বন্দ্ব'।) আপাতগ্রাহ্য সংস্কারবদ্ধ দেবতার আবাহন ও বিসর্জনের দুই

প্রান্তিক সংঘাতের চিত্রে শিল্পীর অন্তর্গত সত্তার দ্বন্দ্ব রূপায়িত। অন্যান্য উপন্যাসে এই বিশিষ্ট প্রবণতা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে সত্যকথা কিন্তু গ্রামীণ জীবনে যে পন্থা ও রীত্যনুসারে তার আগমন সমুচিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মতো এতো বিস্তৃত ধর্মবোধ তথা প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে এমন সাযুজ্য রচনা করে প্রেক্ষিত সৃষ্টি তারাশঙ্কর অন্যত্র রচনা করেন নি। সেদিক থেকে গ্রাম্য সমাজের গভীরতর বোধের থেকে জাত উপলব্ধি বা সংস্কার ছড়িয়ে দেবার সুযোগও লেখক আর পাননি। লক্ষণীয় যে পাগলের মুখে একদিকে শোনা যায় 'হায় কলিকালে, কতই দেখালে—। দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে তাও মারলে রাখালে। / ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর। / অতিবাড় বাড়িল যারা তাদের ভেঙে পাড়ো।'—অন্যদিকে আধুনিক জীবনযাত্রা, কোম্পানী রেলগাড়ি থেকে সামান্য হলেও যুদ্ধের প্রভাবের ধাক্কা এসে পড়েছে তার আভাস তারই গানে আভাসিত ঘেঁটুগানে, 'ও সাহেব আস্তা বাঁধালে / হায় কলিকালে। কালে কালে সায়েব এসে আস্তা বাঁধালে / ছ মাসের পথ কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে / ও সায়েবের আস্তা—' এইসব মিলিয়েই উপকথার আঙিনাটি পূর্ণ হয়েছে। ('উপকথা' জীবন গ্রামীণ আর পাঁচটা সংস্কার বিশ্বাসের মতোই। তবু পার্থক্যটি দুর্নিরীক্ষ্য নয়, উপন্যাসের আদিমতার লীলার দুটি অংশ একটি 'অঙের খেলা'কে কেন্দ্র করে কিছু যৌন-শিথিলতা-বসন, বসনের কন্যা পাখীর। উপকথার তুফান বানে ঝাঁপ খেয়ে যুবতী বউ পালায় যার ওপরে মন পড়ে তার কাছে, তার গাছের ওপরে তার পাতা সংসারেই গিয়ে ওঠে। চৌধুরীবাবুদের বাগানবাড়ির সঙ্গে বসনের সম্পর্ক, বসনের কন্যা পাখীর সঙ্গে দুর্বিনীত করালীর অ-সামাজিক সম্পর্ক যেখানে তার স্বামী নয়ান উপেক্ষিত, বনোয়ারী-কালোশশী উল্লেখ্য ঘটনা, ঘরে গোপালী থাকলেও, কালোশশীর চেহারার সঙ্গে মিলের কারণে সুবাসীকে ঘরে তুলতে বনোয়ারী দ্বিধা করে নি। উৎসবের দিনে মদ্যপানের আধিক্যে গোপালীর মৃত্যুর পর সুবাসী পাখীর ঘর ভেঙে করালীর ঘরে এসে ওঠে। পরিণতিতে পাখী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে, কালোশশীর প্রেতযোনিপ্রাপ্তি পাখীর মৃত্যু একই রীতি ভিন্ন পথ মাত্র। রঙের খেলার বাইরে দ্বিতীয় অংশটি আধিভৌতিক ও অলৌকিক দেবতার ওপর নির্ভরতা ও তজ্জনিত ভীতি-শ্রদ্ধা। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যা কিছু হঠাৎ ঘটে। তাই দৈব, দেবতার রোষ বিনা অপরাধে হয় না—এই কথা শাস্ত্রে আছে—সেই কথাই তারা বিশ্বাস করে। দেবতার রোষ হলে জানতে হবে অপরাধ হয়েছে। সে তুমি জেনেই ক'রে থাক আর অজানতেই ক'রে থাক। আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও তারা

বিশ্বাস করে—'কে করলে ব্রহ্মহত্যে কার প্রাণ যায়।...'—এই বিশ্বাস ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যায় নবীনের অবিবেচনাপ্রসূত দুর্দান্তপনা—করালী তারই প্রতীক—এই ভাবে যে বৃত্তটি পূর্ণ হয়ে যায় তাকেই বলা যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র আদ্য-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত কাহিনী যা প্রকৃতি ও পরিবেশে সম্পূর্ণ বলে ধরে নিতেই হয়। এখানেই উপন্যাসটির নামকরণের যাথার্থ্য।)

তথ্যসূচী :

১. সাহিত্যের পরিভাষা : কৃষ্ণগোপাল রায়, পৃঃ ৩০

২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃঃ ৫৬৫

৩. তদেব, পৃঃ ৫৬৫

৪. বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩২

মিথময় জগৎ ঃ হাঁসুলী বাঁকের ইতিকথা

রবিন পাল

(জার্মান ঔপন্যাসিক হার্মান ব্রখ (১৮৮৬-১৯৫১) বিংশ শতাব্দীকে বলতে চেয়েছিলেন 'মিথময় যুগ'।[১] এমন ধরনের কথা কেউ কেউ বলেছেন, যদিও অনেকের মতে এ হল মিথমুক্তির যুগ। ব্রখের মতোই বলছেন আলোচক রিচার্ড চেস যে, এই শতাব্দীর সৃজন সাহিত্যে লেখকদের মধ্যে উত্তরোত্তর মিথের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।[২] হোয়াইটও তো বলতে চান—মিথে প্রত্যাবর্তন এ শতাব্দীর সূচনার বৈশিষ্ট্য। অনেক উপন্যাসের নাম দেওয়া হচ্ছে—ইউলিসিস, প্রসারপিনা, দি সেণ্টর, দি লেবারস্ অফ হারকিউলিস, নাগিনী কন্যার কাহিনী, তিতাস একটি নদীর নাম, চাঁদবেনে ইত্যাদি। আগের শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপন্যাসে মিথলজি থাকলেও সুবিন্যস্ত মোটিফ প্যাটার্ণ ছিল না যা এখন এসেছে, আসছে।

মিথ বলতে কি বোঝায় এ নিয়ে মতভেদ আছে। এমন কয়েকটি ধারণা উল্লেখ করি—(ক) মিথ আদিম বিজ্ঞান, বা ইতিহাস বা অচেতন ফ্যানটাসির রূপ গ্রহণ ছাড়া আর কিছু নয়।[৩] (খ) মানবজীবনের সীমাবদ্ধতা, অতিমানব আকাঙ্ক্ষা এবং কল্পপূরণের গল্পই মিথ, যাতে পার্বণ এবং আনুষ্ঠানিকতা থাকে। শরীর ও মনের নানা যাতনার প্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ, অনিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিমন্ডল-সংঘটনের প্রকাশই মিথ।[৪] (গ) মিথ এক গল্প, বংশানুক্রমিক গল্পমালা, যা কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর লোকেরা একদা বিশ্বাস করত। পৃথিবী কেন এমন, কেন এমন ঘটনা ঘটে, তা দেবতা বা অলৌকিক অস্তিত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করত, যার মাধ্যমে সামাজিক প্রথা ও পর্যবেক্ষণের এক বিচার, জীবনাচরণের এক সূত্র নির্ধারণ হত।[৫] (ঘ) মিথ হল পবিত্র কাহিনী সত্য ইতিহাস, কারণ তার কারবার বাস্তবতা নিয়ে।[৬] (ঙ) দেশ অভিযান, দেশান্তরণ, জঙ্গম পরিবর্তনাদি, বিদেশী কাল্ট ও সামাজিক সংস্কারের নাটকীয় শ্রুতিলিপি হল মিথ।[৭] মিথ হল মুখে মুখে চলা তারিখহীন স্রষ্টাহীন গল্প, যাতে একটা কাল নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে, বার্থ যেমন বলেছিলেন। মিথের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বাস্তবের অজস্র রেণু, বিপরীতের সংশ্লেষে সেই অন্তর্লীন অভিজ্ঞতা আমাদের চেতনায় ধাক্কা মারে। সমাজবিবর্তন, শ্রেণীবৈষম্য, বিজ্ঞান চেতনার সংঘাত এসবই অবচেতনের কার্যকারিতায় মিথের অন্তর্ভুক্ত। মিথের সঙ্গে

ধর্মের ও পার্বণের একটা যোগ আছে। আচার মিলিয়ে যায়, কাহিনী থেকে যায়। এ কাহিনীতে সম্ভব অসম্ভব অবাস্তব কল্পনার আধিক্য আছে। কিন্তু সমাজতত্ত্বগত বিশ্লেষণে ঐ সমাজের মানসিক প্রবণতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। আর যে জন-গোষ্ঠী যত প্রাচীন ও পুরাতন মূল্যবোধে অনড় তাদের মধ্যে মিথের সন্ধান তত বেশী মিলবে। (আলোচ্য উপন্যাসে সমাজের অনড়তা এবং পার্বণ প্রাবল্যকালে মিথের আধিক্য এবং সমাজ চাঞ্চল্যের কালে তার স্বল্পতা লক্ষণীয়।)

অনেকে বলেন মিথের দিন শেষ, কিন্তু কেউ কেউ বলেন আজকেও আমরা মিথ বানাচ্ছি। সুপারম্যান, ফ্যানটম, টারজান কল্পনা তার প্রমাণ। রাথভেন তাই বলছেন—মিথ যেমন ইতিহাসিত হয় তেমনি ইতিহাসও মিথিকৃত হয়ে প্রকৃতকে (অ্যাকচুয়াল) অপ্রামাণিক (অ্যাপোক্রফাল) স্তরে উন্নীত করে।

প্রতিতুলনায় ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট করা যাক। আর্কেটাইপ কথাটি মিথ প্রসঙ্গে বহু ব্যবহৃত। বোধহয় মড্ বডকিন এর ব্যাপক ব্যবহার করেন তাঁর কবিতা বিষয়ক আলোচনায়। য়ুং-এর মতে—আর্কেটাইপ হল **Primeval images and ideas which are said to be genetically inherited and to be common to all men. They are contained in the racial unconscious or collective unconscious.** (রূপকথা ও মিথে অসাধারণ চরিত্র ও ঘটনার দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য আছে। রূপকথার সামাজিক কর্তৃত্ব নেই, যদিও কখনও কখনও তাতে নীতিকথা আছে।) এর লক্ষ্য বিনোদন। 'ফেবল্'-এর উৎস শব্দ 'fabula' ও mythos সম অর্থ বহন করলেও ফেবল এর কাহিনী কাল্পনিক ও শিক্ষণীয়, যদিও মিথকে কাল্পনিক বলা যায় না। কাহিনী, স্রষ্টা পরিচয়ের অভাব, প্রজন্ম পরম্পরায় প্রচলন, মৌখিকতা প্রভৃতি মিল থাকলেও তফাৎ হল—মিথে থাকে সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা নিরসন। লোক-কথা শুধুই মনোরঞ্জন ও নীতিশিক্ষার্থে ব্যবহৃত। (মিথ ও লেজেণ্ডকে অনেক অনেক সমালোচক এক করে দেখলেও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। লিজেণ্ড মূলতঃ ধর্মীয় বা ভোজন অনুষ্ঠানেই পড়া হত আর এর বিষয় সাধু, শহীদ বা বীর বৃত্তান্ত। কখনও স্থান বা ঘটনাকেন্দ্রিক। মিথে দেবদেবী, অলৌকিকতা, লিজেণ্ডে শ্রদ্ধাযোগ্য ব্যক্তি। প্রথমটিতে চরিত্রের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে চরিত্রের বিশিষ্টতা।[৮])

(মিথের কাজ—(ক) প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বায়োলজিক্যাল বিষয়ের ব্যাখ্যা (খ) এ বিষয়ে গল্প বয়ন ও বর্ণন (গ) রিচুয়াল এবং কাল্টিক কাস্টমের

সঙ্গতি ও স্থিতি বিচার (ঘ) তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত শিক্ষাদানের প্যাটার্ন করে দেওয়া (ঙ) বিশ্বনিয়ন্ত্রণে ব্যবহার (চ) যাদুকরী ও শিল্পগত প্রয়োগ।[৯]

রাথভেন ঠিকই বলেন, মিথ **open ended process** কিন্তু সাহিত্য **closed product.** মিথে যে কেউ যাইহোক উপাদান জমা দিতে পারে কিন্তু একটা সাহিত্য-কর্ম, তার মৌলিকত্ব, **integrity** অন্যের অবদান সাপেক্ষ নয়। মিথ কবিতা নাটক উপন্যাস যে কোনো শাখাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কবিতায় মিথের প্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেঘেব আড়াল থেকে বিদ্যুতের ঝিলিকের মত, যদিও মিথ প্রধান কবিতা বিস্তর আছে। উপন্যাসে অনেক সময় মিথ সরাসরি তার ঐতিহ্যময় ভঙ্গিমায় আসে না। (যদিও ব্যতিক্রম আছে) কিন্তু নাটকে অনুরূপ ব্যবহার বেশী, যা দর্শক ও শ্রোতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে বেশী মাত্রায়। আধুনিক গল্প উপন্যাসে অনেক অনাটকীয় ঘটনা এবং মিলিউ-এর মধ্যে মিশে থাকতে পাবে মিথ। থিয়োডোর জিওলকোস্কি মিথ প্রধান উপন্যাসেব বিভাজন করতে গিয়ে সাম্প্রতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্রুপদী ও মধ্যযুগীয় মিথেব নবব্যাখ্যান এবং ঐতিহ্যগত মিথের গড়নে আধুনিক কাহিনীর বিন্যাসের কথা বলেছেন।[১০] ই. ডব্লু. হার্ড মিথ প্রধান উপন্যাসকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে চান—(ক) স্বীকৃত মিথের প্রকাশ যে উপন্যাসে (খ) কোনো বিশেষ বিষয় বা পরিস্থিতির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাহিত্যগত পরোক্ষ উল্লেখ হিসেবে মিথেব ব্যবহার যে উপন্যাসে (গ) উপন্যাস কায়া গঠনে মিথের সচেতন প্রয়োগ (ঘ) উপন্যাস গঠনের একাংশে মিথ কায়ার অচেতন প্রয়োগ (ঙ) উপন্যাসে নব মিথের সৃজন।[১১] পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই ভাবে বিভাগ খুব সুচিন্তিত নয়। হোয়াইট তাঁর বইতে মিথ-উপন্যাসের চারটি ভাগ করেন। তা হল (ক) ধ্রুপদী মিথের পুনবর্ণন। লেখক মিথের চরিত্র ও পরিস্থিতি উপন্যাসে স্পষ্ট ব্যবহার করছেন তাই সংশয় থাকে না। (খ) একটি পর্যায় আধুনিক পৃথিবী আর একটি পর্যায় মিথ পৃথিবী—এভাবে উপন্যাসটি এগোতে থাকে। এখানে একটি সমস্যা হয়ত ওঠে—কোনটা প্রাধান্য পাচ্ছে, মিথ না সাম্প্রতিকতা ? (গ) উপন্যাসে আধুনিক জীবন বিন্যাসে প্রাসঙ্গিক প্যাটার্ন হিসেবে মিথের ব্যবহার। (ঘ) এমন এক উপন্যাস যেখানে মিথলজিক্যাল মোটিফ ন্যারেটিভের অংশে অর্থাৎ একটি ঘটনা, একটি চরিত্র বা একগুচ্ছ লোকের ওপর ছায়াপাত করছে।[১২] হোয়াইট এর বিভাজন মান্য করে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রসঙ্গে বলা যায় এটিকে আমরা প্রথম বিভাগের অন্তর্গত করতে পারি। তারাশঙ্কর-এর উপন্যাসে মিথের প্রয়োগ বহুবার ঘটেছে। বস্তুতঃ তিনি যে জীবন ও জগতের, বোধ ও বোধির গল্প বলতে

ভালোবাসেন, বীরভূমের সেই অনুন্নত ভূমির অশিক্ষিত, সামন্ততান্ত্রিক জীবন বিন্যস্ত মানুষগুলির জীবনে মিথ, লিজেণ্ড, ফোকটেল আসবে বারে বারে। লেখক নিজেও এ অঞ্চলের মানুষ, স্বেচ্ছায় সম্পর্কিত, শ্রদ্ধাশীল মানুষ তাই এসব প্রসঙ্গ অনিবার্য হবেই। হাঁসুলী বাঁকের ভূমিবন্ধ জীবনের চিত্রায়নে তিনি মিথকে আনছেন। এখানে মিথ হয়ত কোনো কোনো জায়গায় (বিশেষতঃ মধ্য পর্বের পর) বৈপরীত্যে আসছে ঘটনা পরম্পরায়, কিন্তু অধ্যায় পরম্পরার বৈপরীত্যে নয়) এ উপন্যাসে আধুনিক বা নাগরিক জীবন নেই, একাংশে মিথের ক্রিয়া, অন্যত্র তার অভাব—এমনও নয়।

(এবার সরাসরি প্রবেশ করা যাক উপন্যাসটির অভ্যন্তরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগের সময়ে বীরভূমের একটি নগণ্য গ্রাম বাঁশবাদি, তার পাশ দিয়ে বয়ে যায় কোপাই। এই ভৌগোলিক পটভূমিতে লেখক দুটি সম্প্রদায়কে রাখছেন—গাঁয়ের বাবুমশায়রা এবং গাঁয়ের চাষী, সদগোপ, গন্ধবণিক, নাপিত, কলু প্রভৃতি নিয়ে 'সভ্য' সম্প্রদায় আর কাহারপাড়া যাদের নিম্নবর্গ বলা যেতে পারে) এদেরও আবার দুটো ভাগ—প্রথম সম্প্রদায় অর্থাৎ 'সভ্য' ও বিত্তবানদের উপস্থাপনা (এ উপন্যাসে নগণ্য, দ্বিতীয় সম্প্রদায়কেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। কাহাররা অশিক্ষিত ও বিত্তহীন। তাদের উপার্জন অল্প, ব্যস্ততাও অল্প। শিক্ষা ও বিত্তের অভাব তাদের রুচি ও সংস্কৃতির ভুবনে ছাপ ফেলে। এই হল মিথ ক্রিয়ার ভুবন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঢেউয়ে, করালী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের বিদ্রোহে জীবন ও চেতনায় চাঞ্চল্য আসে। আসে মিথবিশ্বাসেও। একটা মিথময় জগৎ কিভাবে ভাঙনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের জগতে চলে আসে তারই গল্প বলতে চান এখানে তারাশঙ্কর)

এই ভারমন্থর, সুরাসেবিত জীবনে আদিম প্রবৃত্তির বিশেষ করে কাম, ক্রোধের গুরুত্ব অধিক। লালসা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী বদল এ সমাজে অচলিত নয়। অলৌকিক বা দৈবে বিশ্বাস (যা বর্ণহিন্দুর পুরাণ মাহাত্ম্য নয়) বরং কথিত সামূহিক অচেতনতা সঞ্জাত। (বনোয়ারী ও সুচাঁদ-একজন তার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্যে এবং অন্য জন নানা মিথ ও মিথ-প্রভাবিত নীতি-নিয়মে বেঁধে রাখতে চায় কৌম জীবনকে। এই বেঁধে রাখার কাজে মিথ ব্যবহৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে মিথ উপস্থাপিত হচ্ছে প্রধানতঃ তিনটি মাধ্যমে—সুচাঁদ, বনোয়ারী এবং লেখক মারফৎ) তিনেরই বিশ্বাস আছে এই জগতে, যদি ও লেখক আধুনিক মন ও মনন প্রভাবে মিথ ও মিথের ব্যাখ্যা এবং মিথ ও রিয়ালিটির সংঘাত দেখান, যেটা সুচাঁদ ও বনোয়ারীর মধ্যে পাওয়া যায় না) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

'বালক যেমন সূক্ষ্ম সূত্রাকর্ষণে আকাশের ঘুড়ির গতিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি এই দৈবশক্তি-অধ্যুষিত হাঁসুলী বাঁকে আকাশবিহারী কালারুদ্র ও বিল্ববৃক্ষ-সঞ্চারী কর্তাবাবা সমস্ত মানুষের ভাগ্য লইয়া খেলিতেছেন ; তাঁহাদের সূক্ষ্ম, সর্ব-ব্যাপী প্রভাব প্রতি মানুষের চিন্তাধারায়, জীবন-রহস্য উপলব্ধিতে ও স্থূল কর্ম-প্রয়াসে সুপ্রকট।'[১৩] কিন্তু এই মন্তব্য সর্বাংশে মানা যায় না। এখানে সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ নেই, আছে বিশ্বাস অনুযায়ী ঘটনাকে মিথ অনুযায়ী, দেবতার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় আস্থা রেখে ব্যাখ্যা।

(এই উপন্যাসে মিথের কথক প্রধানতঃ তিনজন একথা বলেছি। এখানে মিথ আসে কখনও বর্ণনার বিস্তারে, কখনও প্রসঙ্গ কথায়, কখনও গানে, কখনও প্রবচনে। মিথের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে সনৎ মিত্র বলেছেন মিথের বিষয় অন্তত আট প্রকার—(ক) কালানুগতিক, প্রাকৃতিক ও ধাতু পরিবর্তন (খ) অনন্যসাধারণ অথবা অনিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা (গ) বিশ্বসৃষ্টির রহস্য (ঘ) ঈশ্বরগণের উদ্ভব রহস্য (ঙ) মানুষ ও জীব জগতের সৃষ্টিরহস্য (চ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আবিষ্কার (ছ) সুর-অসুরের বা দেব-দানবের যুদ্ধ বিষয়ক (জ) জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক।[১৪] হাঁসুলী বাঁকের মিথের আলোচনায় দেখব প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য যেন স্পর্শ করে যায় মিথ-গুলিকে।) যখন জন আপডাইক তাঁর 'দি সেন্টুর' (১৯৬৩) উপন্যাসটি প্রকাশ কবেন তখন তাতে একটা মিথোলজিক্যাল ইন্ডেক্স দিয়েছেন উপন্যাস পাঠকদের সহায়তার জন্য। তারাশঙ্কর অবশ্য তা করেন নি। কোনো উপন্যাসেই নয়। আমরা আমাদের সুবিধার্থে এমন একটি তালিকা করে নিতে পারি। যেমন—(ক) কর্তাবাবা, তার সমক্ষমতাবান দেবতা, বাহন ইত্যাদির মিথ। (খ) অপদেবতা (গ) ইন্দ্র (ঘ) রাম রাবণ (ঙ) বাণ গোঁসাই (চ) সাপ (ছ) উকুন ইত্যাদি।

(উপন্যাস শুরুই হয় মিথ দিয়ে। রাতে ঘন জঙ্গলে শিস কার—দেবতা যক্ষ রক্ষ কার—এ নিয়ে কাহাররা সন্ত্রস্ত। বাবুমশায়রাও। শিস কখন ও বেলগাছে শ্যাওড়া ঝোপে ভর্তি ব্রহ্ম দৈত্য তলায়, কখন ও কোপাইয়ের তীরে কুলকাঁটার জঙ্গলে, কখনও কাছে কখনও দূরে। অনেক তদন্ত, বন্দুকের আওয়াজ, টর্চের আলো কোনো কিছুই এর রহস্য ভেদ করতে পারে নি।) পূর্ববঙ্গের দারোগা বুঝতে না পেরে তার নদীতীরবর্তী অভিজ্ঞতার প্রভাবে বলেছেন—নদীর ভেতর থেকে কোনো কিছু শব্দ তুলছে। (নদীকে লক্ষ্মীর গলার হার বা মনসার গলার অজগরের বেড় ধরনের চিত্রকল্পে (যা নাগিনী কন্যার কাহিনীতেও) মেঘের 'বিষম ঢাকি'র বাজনায় (অর্থাৎ মেঘ গর্জনে, মিথ ঢেউ তুলে যায়) নদীর ডাকিনী রূপ, তার আগ্রাসনও মিথিক্যাল,

এই উপস্থাপনা অবশ্য লেখকের। এইবার মিথ পা ফেলে কাহার পাড়ার ভেতরে। শিসের মধ্যে দেবতার ক্রোধ, সুচাঁদের ভাষায় যাতে কাহারদের অনিবার্য মরণের ইঙ্গিত। ক্রোধের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলির পাঁঠা খুঁতো দেওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য করে সবাই ভয়ে মরে। সুচাঁদ, কাহাররা পিতৃপিতামহ সূত্রে জেনেছে বাবার দয়াতেই হাঁসুলী বাঁকের যা কিছু। তিনিই কাহারদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। সুচাঁদের বর্ণনায় আমরা পাই এক বন্যাপ্লাবিত দিনে আলোকময় এক নৌকার আগমন। এক নীলকর সাহেব বৌ-এর বারণ অগ্রাহ্য করে এক কোমর জল ভেঙে নৌকাটি ধরতে যায়। হঠাৎ বাবার থান থেকে বেরিয়ে আসে কত্তা। (এ বর্ণনায় সুচাঁদের শিউরে ওঠা তার ভয় ও বিশ্বাসের ইঙ্গিত) তাঁর ন্যাড়া মাথা, ধবধবে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষ, পৈতে, পরণে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম (এ বর্ণনায় ব্রাহ্মণ ইমেজ, হয়ত সংস্কৃতি সংমিশ্রণ জাত)। কত্তা জলের ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে এগিয়ে এসে বলেন—কোথা যাবে সায়েব, নৌকো ধরতে? যেয়ো না, ও নৌকো তোমার নয়। সায়েব মানে না, বন্ধুক তুলি সাশায়। কত্তা হেসে বলেন—'বেশ, ধরাঙ্গা তবে নৌকো।' সঙ্গে সঙ্গে এক কোমর জল হয়ে এক ঘুরণ চাকিতে সায়েব মেম তলিয়ে যায়। এবার গাছের ডালে বসে থাকা সাহেবের গোমস্তা চৌধুরীকে ডেকে কত্তা সেই নৌকা দিলেন। আর বললেন—'আমার পুজো করিস, দেবতার কাছে মাথা নোয়াস, অতিথকে জল দিস, গরীবকে দয়া করিস, মানুষের শুকনো মুখ দেখলে মিষ্টি কথা বলিস। যখের কাছে ছিলেন লক্ষ্মী, তোকে দিলাম।' এইভাবে প্লাবনের নৈশমায়ায় শুরু হয় কাহারদের মিথময় ইতিহাস। এই মিথের পিছনে অতর্কিত বন্যা ও ঘূর্ণিতে নিষেধ অমান্য করায় তলিয়ে যাওয়া, চৌধুরীদের হঠাৎ অর্থলাভ, এবং কিছু সমাজকল্যাণমূলক নীতি শাসন রয়েছে। একটা শ্রেণীবিরোধ, সায়েব ভারতীয় বিরোধ ও কাজ করতে পারে। বিভিন্ন আলোচকরা দেখান মিথের তালিকায় সৃষ্টি বিষয়ক মিথ সংখ্যায় যথেষ্ট বেশী। দ্বিতীয়তঃ এই সৃষ্টিবিষয়ক মিথ 'আদিমতম' তৃতীয়তঃ, এর উদ্ভব স্রষ্টার আনন্দানুভূতির জন্য নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সহজ-ভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশে মানসিক বল সংগ্রহে। চতুর্থতঃ দেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি মিথে (এখানে যেমন, বীরভূমের নদীতে হঠাৎ বন্যা)।[১৫]

এইখানে বলা যাক কর্তাবাবা ও কালরুদ্র এ উপন্যাসে এই দুই দেবতা মিলে মিশে গেছে, বীরভূমে অনেক জায়গায় যেমন ধর্মঠাকুর ও শিব মিলে মিশে গেছে। এ কথা সমর্থিত হয় গোপালকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবদেবী' (পৃঃ ১৬৬) গ্রন্থেও।

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় বলেন, পঞ্চানন শিব পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে 'বাবাঠাকুর' নামে পূজিত হন। হাঁসুলী বাঁকের কালরুদ্র বা কালারুদ্দু বা 'বাবা বুড়ো শিব' বেলতলার বাবাঠাকুর ও ধর্মরাজের চেয়ে বড়। কর্তা কালরুদ্রের সহচর, কর্তার ইচ্ছায় তাদের প্রতিদিনের কাজ কর্ম ভালো মন্দ ঘটে, আর 'আদিবুড়া' কালরুদ্রের কৃপায় মরণ বাঁচন ভাগ্যফল লাভ হয়। একেই তাদের বেশী ভয়। এর বার্ষিক পূজা চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন উৎসবে।[১৬] ধর্মঠাকুর যে ব্রাত্যদের দেবতা একথা সুকুমার সেন, নীহার রায় ও বলেছেন। অমলেন্দু মিত্র দেখিয়েছেন—ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্য বরুণ, কূর্ম ও শিবের সাদৃশ্য আছে।[১৭] উপন্যাসটির ৩য় পর্বের সূচনায় চৈত্র সংক্রান্তিতে বাবার গাজন বর্ণনায় 'শিবো হে, কালারুদ্দু হে' কথা দুটি আছে। তার পরই শিবের জলশয়নে যাত্রা, তার সঙ্গে ভূতপ্রেত দানা দৈত্যের কথা। অমলেন্দু উল্লেখ করেন দক্ষিণাকালীর কাছ থেকে মদ্য ভাঁড়াল আনার কথা। এ উপন্যাসে পূজায় পাড়ার জন্য মদের ভাণ্ড আনার প্রসঙ্গ একই। লৌকিক পুরাণে যমজ ভাই বোন ধর্ম ও মনসা—বলছেন সুকুমার সেন। অমলেন্দু বলেন ধর্মের কামিনী মনসা। কোনো কোনো গ্রামে একই সঙ্গে পূজা হয়। এ উপন্যাসে বাবার বাহন সাপ, বাবার দহে সাপ, শিমূল গাছে সাপ, প্রভৃতিতে এই নৈকট্যের ব্যাপারটার ইঙ্গিত দেয়। বাবা কালারুদ্রের চড়কের পাটা ধর্ম এবং শিব দুইতেই বোঝায়। তারাশঙ্কর এক জায়গায় এই দেবতাদের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন। তাহল সব দেবতার আদি ও বড় দেবতা—বুড়ো শিব, বাবা কালারুদ্দু। বেলতলার যে বাবাঠাকুর তারও দেবতা হলেন এই কালারুদ্দু। ধম্মরাজেরও বড় বাবা কালরুদ্র।' 'লারায়ণের যেমন লারদ, বাবা কালারুদ্দুরের তেমনি ন্যাড়া মাথা গেরুয়া পরা খড়ম পায়ে দণ্ড হাতে কর্তা ঠাকুর। পল্লব সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—'লোক পুরাণ সংস্কৃতির লোকায়ত এবং ধ্রুপদী দুটি পরস্পর সাপেক্ষ ঐতিহ্যের মধ্যে মেলবন্ধন করে।'[১৮] কর্তাবাবার মিথের মধ্যে এর পরিচয় মেলে, তবে কিছুটা।

(ধর্মের বাহন ঘোড়া। বাবাঠাকুরের বাহন 'অজগর' (পৃ. ৩০১)) তারাশঙ্কর উপন্যাসের এক জায়গায় লিখছেন কাহার পাড়া আটপৌরে পাড়ার রেষারেষি ঘোড়া গোত্র না বাহন গোত্র তা নিয়ে। বাবার হাতে বেতের ছড়ি। (গাজনের সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যাপারটি এ উপন্যাসে বেশ গুরুত্ব পায়। বনোয়ারী গাজন-সন্ন্যাসী হয়। শুদ্ধ সংযত জীবন যাপন। ধর্মরাজের 'পাতা পরব' আর 'চড়ক' একই) শিবভক্ত, দেয়াশী এসব উপাধি ধর্ম এবং শিব ভক্তদের মধ্যে খুব চালিত। (এইভাবে মিথ ও রিচুয়াল বীরভূমের ব্রাত্যজীবনে এবং এ উপন্যাসে মিলে মিশে যায়।)

বাবাঠাকুরের অধিষ্ঠান ভূমি নিয়ে উপন্যাসটিতে অনেক কথা আছে। কেউ বলে কত্তার দহ, কেউ সায়েব ডুবির দহ, যখের দহ। যেমন বাবাঠাকুরের দয়ে বাবাঠাকুর আছে, কুমীর আছে। কত্তা ওখানে স্নান করেন। কাহাররা বছরে চারবার নামে তাতে। গাজনে কালরুদ্রের শিলারূপকে তুলে নিয়ে যায়, আবার জলশয়ানে রেখে আসে। ওইখানে থাকে কালরুদ্রের বেটি (একটু ভিন্ন কল্পনা) মা মনসার 'বারি'। একবার বারি নিয়ে যায় আর একবার বারি ডুবিয়ে দেয়। ওই দহ পাহারা দেয় এক বুড়ো কুমীর। মধ্যে মধ্যে সেটা এদিক ওদিক বেড়াতে যায়। তবে দহের বিঘ্ন হলে কোপাইয়ের জল কেটে তীরের মত ছুটে আসে। কালোশশীর মৃত্যু হয় এক কুমীরের হাতে। আর শিমুল গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে সাদা গোখরো দুলতে থাকে। কর্তা এক বেলগাছে বসে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করেন আর গোটা হাঁসুলী বাঁকে দৃষ্টি দেন। এই কারণে এই দহ, এই গাছ, এই সব পাথর পুজো করে কাহাররা। প্রাচীন আদিম সমাজে গাছ জল, পাথর পুজোর চিহ্ন এতে। চৌধুরীরা যেমন কত্তাবাবার কৃপায় সম্পত্তি পায়, তেমনি কত্তার আদেশে চৌধুরীরা কাহারদের জমি দেয়। জাঙলের কয়েক ঘর হাড়ি ডোম মুচি সদগোপ মশায়দের জমি চষত। (আজ তারা হটে গেছে। কাহাররা চাষ ভাল জানত না, এখন তারাই সবচেয়ে ভালো চাষী ও মুনিষ। আরণ্যক জীবন থেকে কৃষি জীবনে এই উত্তরণ মিথের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাবে) যার যা প্রতিশোধের ইচ্ছা তা কায করী করার প্রার্থনা হয় বাবাঠাকুরের কাছে। যেমন সুচাঁদ করালী প্রসঙ্গে, নয়নের মা পাখী করালী প্রসঙ্গে। শাস্তির অনিবার্যতায় বিশ্বাস (পৃ• ৩৯৯) ও আছে। করালীর শ্বশুর মুখে রক্ত তুলে মরলে কাহাররা বিশ্বাস করে এ হল বাবাঠাকুরের কোপ। স্বপ্নে বনোয়ারী এক দাঁতাল বুনো শুয়োরের দ্বারা আক্রান্ত হয়, কালোশশী ভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। কর্তা এসে তাদের রক্ষা করেন। (এ কালোশশীর প্রতি বনোয়ারীর কামনা, কালোশশীর স্বামী দুরন্ত ক্রোধী পরমের আক্রোশ—এভাবে মনস্তত্ত্বগত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।) বাহন (চন্দ্রবোড়া) মারার কারণে সুচাঁদের কান্না। তার মানসে মিথ সাময়িকতায় বিপন্ন। সে বাবার কাছে প্রতিবিধান প্রার্থনা করে। 'তোমার মহিমা তুমি পেচার কর বাবা।' যেমন শাপে তেমনি শাস্তিতে বাবাঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। (স্বপ্ন অনুষঙ্গে মিথের ব্যবহারের আর একটি সুন্দর উপস্থাপনা এখানে আনা যাক। পাখির পরিত্যক্ত হেঁপো রোগী স্বামী নয়ান মনশ্চক্ষে দেখে কত্তাঠাকুর বেল-গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন—একটি কুটিল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি করালীর ঘরের দিকে। পায়ের তলায় পড়ে আছে সেই বিরাট চন্দ্রবোড়া—করালী

যাকে মেরে বাহাদুরি নিয়েছে। সে কি মরে? বাবার সাপ সে। কত্তার বাহন। সে বেঁচে উঠেছে। লক লক ক'রে জিব নাড়ছে। বাসর ঘরে ওই সাপ ঢুকবে।') (পৃ. ২৪৬) অক্ষমের এই যে প্রতিশোধ কল্পনা স্বপ্নে চমৎকার ফোটে। মৃত জীবন্ত হয়ে যায় স্বপ্নে। (ফ্রয়েড ও ফ্রয়েডপন্থীদের স্বপ্ন ব্যাখ্যান এখানে মনে পড়বে। আবার একই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মনসামঙ্গলের মিথ যাকে কোনো কোনো আলোচক বাংলার সবচেয়ে পুরোনো মিথ বলতে চান।[১৯] কালনাগিনীর মিথ ও ঢুকে পড়ে।) (পৃ. ৪১১)

(বাবার বাহনের উল্লেখ একট আগেই করেছি। তারাশঙ্কর লেখেন বাবার বাহন কালবৈশাখীর মেঘে ফুঁসিয়ে উঠেছিল। (পৃ. ৩৮৬) এই মিথ চিত্রকল্প আসলে বৃষ্টি থমথমে আকাশে মেঘ গর্জন। এই মেঘ গর্জন কোথাও বর্ণিত হয় দেবতার হাঁকাড় (পৃ. ৩৯৬) হিসেবে। আবার বর্ষার মেঘ যে ইন্দ্ররাজার মেঘ একথাও বলা হয়। (পৃ. ৪০২) আছে প্রলয়ের মেঘ, দেবতার ক্ষেপে যাওয়ার কথা। টুকরো টুকরো ভাবে এইসব প্রসঙ্গ দিয়ে আকাশ, বৃষ্টি, মেঘ, ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি জড়ানো একটা মিথ গড়ে উঠতে থাকে)। (বনোয়ারী বাবাঠাকুরের বেলতলায়, এবং কালরুদ্রের দরবারে লুটিয়ে পড়ে বারবার অপরাধ মার্জনা চাইত।) সে অপরাধ হল বাবার অস্তিত্ব তার রক্ষণ করার কথা ভুলে বাবাকে সে সন্ধান করেছে এখানে ওখানে। এটা বনোয়ারী চরিত্রের পরিস্থিতিগত বিচ্যুতি, (মিথ বিশ্বাসে ফাটল ধরলেও তা তার মানসে থেকেই যায়। কিন্তু করালী চরিত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন রূপ। করালী উপন্যাসের শুরু থেকেই বনোয়ারীর নেতৃত্বের বিরোধী, কাহারদের মধ্যে প্রচলিত মিথ ও তজ্জনিত ভয়, শ্রদ্ধা কিছুই আমরা করালীর মধ্যে দেখি না। সে শিসের প্রতি ব্যঙ্গ করে, পবিত্র-বৃক্ষে আগুন লাগায়। শিমুল গাছে উঠে নাচে। আগুনে ভীত সাপ (বাবার বাহন) পড়াকে ব্যঙ্গ করে বলে—"ওই-ওই-ওই শালা পড়ছে। ওই—ওই দেখ, তোমার কর্তা পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে। হুই—হুইয়ো।" (পৃ. ১৯০) করালী তিনটে হাঁস বলিদানে দিতে চাইলে বনোয়ারী তার জরিমানা না নিয়ে এ হাঁস নিতে চায় না। তখন রেগে হাঁসগুলোর মুণ্ডু ছিঁড়ে করালী বলে—'কত্তা খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন তাই কর।' (বনোয়ারী সাপের মৃত্যুতে দাহ, সকলের স্নানের বিধান দেয়। যা মিথ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে মোড়ল আনুগত্য। মিথ ব্যবহৃত হচ্ছে বারংবার সমাজ শাসনে।[২০] কিন্তু মিথ-মোহমুক্ত করালীর কাছে সেটি চন্দ্রবোড়া সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।)

সূচাঁদের আর এক কর্তাবাবাকেন্দ্রিক মিথ বন্যা নিয়ে। বন্যা ও সৃজনের মিথ বহু দেশেই প্রচলিত। নোয়া-র সময়ে সর্ব বিধ্বংসী বন্যা, বন্যায় মায়া সভ্যতার সর্প, বিষ্ণুর Primal egg of the cosmio ocean, অনন্ত নাগে হেলান দিয়ে থাকা প্রভৃতি তার কয়েকটি উদাহরণ। (আলোচ্য উপন্যাসে গাজনের গল্প প্রসঙ্গে পাখি বলছে এক সময় সৃষ্টি ছিল না, চন্দ্র সূর্য পৃথিবী মানুষ পশুপক্ষী কিছুই না। শুধু আঁধারে কালারুদ্রের চড়ক ঘুরছিল। (পৃঃ ৩০৩) এবং অন্যত্র—'পিথিমী 'ছিষ্টি' হল, কাহার ছিষ্টি করলেন বিধেতা, কাহারদের মাতব্বরও ছিষ্টি হয়েছে সেই সঙ্গে, (পৃঃ ৩৮০) এ হল অন্য সব দেশের আদিম জাতি উপজাতির সৃষ্টি বিষয়ক মিথের সগোত্র) (উপন্যাসে আছে এক প্রবল বানের কথা, যাতে গরু বাছুর মানুষের মৃত্যু হয়, কুঠি ভেসে যায়, সাহেব মেমের মৃত্যু হয়, কুঠি বিকিয়ে যায়। এর উল্লেখ অবশ্য পূর্বে করা হয়েছে কর্তাবাবার ক্ষমতা প্রসঙ্গে। যাইহোক, সব ভেসে গেল, লোক জন্তু পালালো—'কাহারদের পিথিমী অন্ধকার হয়ে গেল।' এই হল 'মহা-মারণের' মিথ) এর পরই আসে মন্বন্তর, কর্তাবাবা চৌধুরীদের স্বপ্ন দিলেন, এই বিপদে 'মানুষকে ভিটে ছাড়া করতে নাই, কাহার দিগে তুলে দিলে আমার 'ওষ' (রোষ) হবে তোর ওপর।' (পৃঃ ২১৮) চৌধুরী কাহারদের ভিটেবাস বজায় রাখলেন। এখানে জমিদারদের আকস্মিক সুবিবেচনার একটা ব্যাখ্যা এল, যদিও তা মিথিক্যাল। (২৩৫/৩৬ পৃষ্ঠায় আছে চৌধুরীদের লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়ার কথা। লক্ষ্মী আসা, লক্ষ্মী ছাড়া—এই মিথটা চাপা ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। মিথের চাপা ব্যবহার প্রসঙ্গে আমরা কলিযুগের মিথের কথা বলতে পারি) এক জায়গায় বলা হচ্ছে করালী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কলিযুগ এনেছে। কলিযুগ অর্থাৎ অধর্মের আধিক্য। অর্থাৎ বনোয়ারীর ও কাহারদের প্রচলিত রীতি-নীতি না মানাই এখানে অধর্ম। অধর্ম—অন্যায় অর্থে—কি পূর্বে ছিল না, নিশ্চয়ই ছিল।

(অপদেবতার মিথও এ উপন্যাসে আছে।' বনোয়ারী বারংবার অপদেবতার অস্তিত্ব অনুভব করে। বাবার ক্রুদ্ধ মূর্তি ভেসে ওঠে চোখে। অজগরের মাথায় খড়ম পায়ে দিয়ে গেরুয়া পরে, ন্যাড়া মাথা বাবাঠাকুর ভেসে ওঠে।) অমলেন্দু তাঁর বইয়ে (পৃঃ ১৩৪) এমন এক দেবতার কথা বলেন। ন্যাড়া মাথা হয়ত শিলা। বাবার পৈতে হয়ে যায় দুধ গোখরোর পৈতে। এই রূপান্তরণ লক্ষণীয়। সাপের সঙ্গে যোগ মিথ হিসাবে সেটাও লক্ষণীয়। আমরা এমন ধরণকে সংমিশ্রিত মিথ বলতে পারি। তবে বাবাঠাকুর ঠিক 'অপদেবতা' নন, এ শব্দটি ওই ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের অসচেতন প্রয়োগ। অপদেবতা প্রসঙ্গ আছে অন্যভাবে। এরা নদীর ধারে দপ দপ

করে জঙ্গলে বেড়ায়, শাঁকচুন্নির ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া ও শিমুলের মাথা থেকে, বাঁশবনে ক্যাঁ ক্যাঁ ডাক—গেছো পেত্নী ও ছোকরা ভূতের কারসাজির কথা আছে। (পৃঃ ২৪৯) (অপদেবতা নিয়ে সুচাঁদ বলে—এরা হাঁসুলী বাঁকের মাঠে দিব্যি থাকেন, শোঁশানের হাড়গোড় নিয়ে বাদ্যি বাজান, সাধ গেলে নদীতে বিলে মাছ ধরেন, চিতার আগুন লুফে খেলা করেন, এই গাছের মাথা থেকে হুপ করে ভেসে চলে যান ওই গাছে) (পৃঃ ৩৬৭) আর দু'এক জায়গায় আছে কালোশশীর প্রেত প্রসঙ্গ। বনোয়ারীর গা ঘেঁষে যে বাতাস বা 'বাওর' বয়ে যায় তা কালোশশীর প্রেতাত্মা বলে অনুভব হয়। রমণের বৌ অমাবস্যার ভরা দুপুরে এলোচুলে লঙ্কা নুন পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেতে বসেছিল। তখন এই লোভনীয় খাদ্যের লোভে চলে আসে অশান্ত প্রেতলোকবাসী অর্থাৎ কালোশশীর প্রেতাত্মা। সুবাসী একথা বিশ্বাস করতে চায় না, প্রেতে অবিশ্বাসী বলে নয়, কালোশশী তার মাসি বলে। সুচাঁদ কিন্তু বিশ্বাসে অবিচল—কালোশশী পেত্নী হয়েছে, সুবাসীর শত্রুদের সে নিপাত করবে।' (পৃঃ ৪১৭) আলেকজাণ্ডার এলিয়ট বলেন—মিথ এবং ধর্মে একটা জায়গা আছে যেখানে দানো, অপদেবতা, এবং অন্য সব প্রেতরা মিলে এক পীঠস্থান বানায় যেখানে তাদের দাপট, যেখানে মানুষও অলৌকিক সত্তার কথা বলে। মানুষ এইসব ভূত-প্রেতকে প্রাণবান অস্তিত্ব হিসেবে পার্থিব এবং নক্ষত্রজগতের বিশেষ কর্মে সক্রিয় দেখে, মানুষের এই সম্পর্ক রচনা তার চরিত্রের উভয় বলতার প্রমাণ। অপদেবতারা মিথ-এ দানব শত্রু হিসেবে আসে, পাতালের প্রতিনিধি হিসেবে আসে, যাদের তাড়াতে মন্ত্র আওড়াতে হয়, অথবা তারা স্বর্গীয় পথপ্রদর্শকও হতে পারে যারা ঈশ্বরের পথে যেতে মানুষকে সাহায্য করে, অথবা তারা হতে পারে পূর্বপুরুষদের ভ্রাম্যমান আত্মা যারা তাদের উত্তরপুরুষদের জীবনে নাক গলায়।[২১] কালোশশীর বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে এসব কথার অনেকটাই সমর্থিত হবে।

বাণ গোঁসাইয়ের মিথ বলছে সুচাঁদ পিসি। বাণ গোঁসাই ছিল ছোটজাতের রাজা, মহেশ্বর ভক্ত, সন্ন্যাস করত, হাড়ের মালা পরত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তার একশ বৌ, এক মেয়ে, নাম উষা, যাকে দেখে নারায়ণের নাতির মন টলে। একদিন নাতি উষার ঘরে ঢুকে পড়লে বাণ গোঁসাই তাকে খুন করতে যায়। আসন টলে গেলে নারদের সাহায্যে জানতে পেরে নারায়ণ গোঁসাই বাড়ি হানা দেয়। লড়াইয়ে পৃথিবী টলমল করে ওঠে, জলে আগুন, মাটির বুক ফেটে জল, আকাশের তারা খসে যায়। চক্র দিয়ে নারায়ণ বাণের হাত পা কেটে ফেলে। তবু তার জিদ দেখে বাবা কালরুদ্র এসে হরি হর মিল করিয়ে দেন, নাতির বিয়ে হয় উষার সঙ্গে। নারায়ণ

বাণের হাত পা জোড়া লাগার বর দিতে চাইলে সে তা নিতে চায় না। সে চায় কালরুদ্রের সঙ্গে তারও পুজো হোক। (পৃঃ ২৮৪) অমলেন্দুবাবুর বইতে বাণ গোঁসাইয়ের কথা আছে। চড়কের সময় এ পুজোর বিশদ বিবরণ আছে ১৫৪, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৬ পৃষ্ঠায়। আমরা লক্ষ্য করব, এই মিথে আদিম ও উচ্চবর্ণীয় সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। এতে মিথের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা এবং মর্যাদা উন্নয়নের ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। অমলেন্দুবাবুর বইয়ের প্রসঙ্গ-উল্লেখ থেকে বলা যায়, এসব মিথ তারাশঙ্করের কল্পিত নয়, তা ওই সমাজে বহমান।

ইন্দ্রের মিথ প্রসঙ্গেও শেষের কথাগুলি প্রযোজ্য। দেবরাজ ইন্দ্র হাতিতে চড়ে মেঘের সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ান। তার বাহন মেঘের সাত সমুদ্র থেকে শুঁড়ে জল টেনে নিয়ে ছিটিয়ে দেয় চারধারে। মাঝে মাঝে দেবরাজ তার হাতের বজ্রদণ্ড দিয়ে মেঘের সমুদ্রে আঘাত করেন, তা থেকে ঝলকে ওঠে আগুনের লকলকানি। কখনও ইন্দ্রের ভাই পবনও তার সঙ্গে বার হয়। মাঝে মাঝে হাতিটা ক্ষেপে পিলখানা থেকে শিকল ছেড়ে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘের সমুদ্রে। তখন অন্ধকার নামে। হাতির শুঁড় মাটি পর্যন্ত নেমে আসে, দুলতে থাকে। সব ধুয়ে মুছে উপড়ে তাণ্ডব করে। (পৃঃ ৪১৪) লেখক নিজেই বলে দেন—এ হল জলস্তম্ভ। মাইতো ঘোষ মিথ মান্য না করে এই ব্যাখ্যা দেয় বলে ক্ষমা চাওয়া হয়। অর্থাৎ মিথ ব্যাখ্যায় মিথচ্যুতির ভয়।

এইখানে চট করে আমরা রামরাবণ মিথের কথাটা বলে নেব। এটি পাগলের মুখে। রাম লক্ষ্মণ সীতা বনে গেল, দেশসুদ্ধ লোক কাঁদল। শূর্পনখার নাক কাটা, রাবণের ক্রোধ, সীতা হরণ, রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয় অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, সর্পবাণ, ওড়ে, মহাপাপী রাক্ষসের বুক কাঁপে, পৃথিবী কাঁপে, পশুপক্ষী কলরব করে, নদীর জল স্তম্ভিত হয়, গাছপালা ঝলসে যায়। (পৃঃ ৩১৫) এই মিথ রামায়ণের প্রচলিত গল্প অবলম্বনে। রাক্ষসের আগে 'মহাপাপী' বিশেষণে, হিন্দু নামভক্তিবাদের, উচ্চবর্ণের প্রাধান্যের দিকটি ক্রিয়া করে, লেখকের অবচেতনায় তা ছিল অনুমান করা যায়। ৩১৭ পৃষ্ঠায় আসে হনুমানের প্রসঙ্গ। লেখক বলেন—'উনিরা হলেন পবন নন্দন, ওঁদের মারলে পবনঠাকুর মেঘ আনবেন সে অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হবেই।' এই প্রসঙ্গে বলি ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের সঙ্গে কর্তাবাবার তুলনা, ভীমের ব্যাটা ঘটোৎকচের তুলনা মিথ ছাড়িয়ে পুরাণ কাহিনীতে চলে যায়।

সাপের মিথ 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে যেমন এখানেও। সুচাঁদ বলে—সাপ মা বসুমতীকে ধরে আছেন মাথায় করে। (পৃঃ ৪০৮) নাগ নর পরম্পরকে এড়িয়ে

চলে। সামনা-সামনি পড়ে গেলে ধৈর্য ধরতে বলে, চলে যেতে বলে, প্রণাম জানায়। সুচাঁদ বলে, সামান্যতে কারো অনিষ্ট করে না, মাথায় পা, লেজে পা দিলে এরা ছোবল মাবে, তাও চন্দ্র ও সূর্যকে সাক্ষী রেখে। আর ছোবল মারে কালের হুকুমে, বাবার হুকুমে। এই বিবেচনার জন্যই কাহারদের কাছে সাপ 'তিনি'। সাপের মিথ নানা দেশে নানা ভাবে বিদ্যমান। আমরা দেখব নিউ গিনির বন্যা সংক্রান্ত মিথে সর্পরাজের উল্লেখ, ভারতীয় মিথে বাসুকীর পৃথিবীকে শিরে ধারণ, ইত্যাদি এই মিথের সঙ্গে মেলে। সাপের বিজ্ঞতার কথাও কোনো কোনো দেশের মিথে আছে। এখানেও উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের সংস্কৃতির মিল আছে বলা যায়।

(একটি চমৎকার সৃষ্টি তত্ত্বের মিথ আসছে বৈষ্ণব ফকিরদের গানে। তা হল— মায়ের গর্ভের মধ্যে বসে এক কারিগর খাঁচা তৈরী করে, হাড়ের শলা দিয়ে খাঁচা তৈরী করে, পরিপাটি চামড়ার ঘেরাটোপ করে দেয়, তাতে সুড়ুৎ করে ঢোকে এক পরাণ পাখি, যে নাচে, বুলি বলে, রঙ্গ করে। তারপর একদিন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। কাহাররা এই পরাণ পাখির আনাগোনার পায়ের দাগ, আজব কারিগরের আস্তানা খোঁজে। সুফিদের ও বাউলদের গানে আমরা এই মিথিক্যাল পাখির সাক্ষাৎ পাই। তারাশঙ্কর এমন একটি সুপ্রচল মিথ এখানে ব্যবহার করেন)

গৌণ মিথের মধ্যে উল্লেখ করব পাথরের মিথের। এ হল প্রাণ সৃষ্টির মিথের অন্তর্গত। পাথরের গায়ে সাদা দাগ, যা পৈতের মতো। আর এক ধরনের পাথর আছে, যা গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে। সুচাঁদ বলে অসুরের কাঁড়ি। অর্থাৎ অসুরের হাড় জমে পাথর হয়ে গেছে। দেবতারা অসুর মেরেছিলেন, তাদের হাড়। বনোয়ারী আবার এধরনের মিথে বিশ্বাসী নয়। আর আছে উকুনের মিথ (পৃঃ ৩১০) উকুন হাতে নিয়ে নখ দিয়ে টিপে মারলে পট করে শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে একজনকে মুখ দিয়ে শব্দ করতে হবে—হুঁ। ঐ শব্দটি না করলে উকুনের স্বর্গ লাভ হয় না। এ মিথ লেখক বলেছেন। (কখনও কখনও প্রবচনে মিথ ব্যবহৃত। যেমন—পরের ধন কালারুদ্রের কণ্ঠের বিষ। (পৃঃ ৩৩৭) দক্ষিণ দিক পানে চেয়ে না দেখার নিষেধ (পৃঃ ৩১৪) মিথিক্যাল বলা যায়। নিশি ডাকার প্রসঙ্গটিও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। আমরা বলতে পারি তারাশঙ্কর দক্ষ হাতে মিথ থেকে পুরাণ, পুরাণ থেকে মহাকাব্যের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। যা বিদেশী বড়ো মাপের মিথিক্যাল উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যাবে।)

(এই উপন্যাসে যেমন আছে মিথের ব্যাপ্ত উপস্থাপনা তেমনি তা বিচিত্রও বটে, যাতে একটি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, সংস্কার, সংশয় কাজ করে যায়। চতুর্থ পর্ব থেকেই

মিথে, দেবতার কার্যকারিতায় সংশয় আসতে থাকে—অর্থনৈতিক সংঘাতে, অভিলষিত শাস্তি না দেখে। এই সংশয়, মানে ক্রমঅগ্রসরমান সাম্প্রতিকতায়, মিথ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বের যে কথা আমরা একাধিক আলোচকের লেখায় পাই তা এ উপন্যাসে এসেছে বিচিত্রভাবে।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা এরকম। সুচাঁদের নেতৃত্ব শুধুই ধর্ম ও পার্বণ বিষয়ক। তার হারানোর ভূমিটি অল্প। তবু সে বলে, মানুষের জীবন বদলাচ্ছে, দেবভক্তি কমে যাচ্ছে। তাই বন্দুক দিয়ে লোকে ভূতপ্রেত পরখ করতে এলে ভূত প্রেত দূরে চলে যায়। সুচাঁদ প্রধান কথক হয়ে দেখা দেয় উপন্যাসের যাবতীয় মিথের। একটা কাল ও বিশ্বাসের প্রতিভূ হয়ে দেখা দেয় সুচাঁদ। সে কখনও গল্প বলে, কখনও গান করে, কখনও নীতিনিয়ম বিধিবিধানের কথা বলে। সমাজ সংরক্ষণ তার লক্ষ্য, যদিও সে সমাজের integrity রক্ষা করতে পারে না। যে সামর্থ্য পরিবর্তমান একটা সমাজ, গোষ্ঠীকে তার বলয়কে চূর্ণ হবার হাত থেকে বাঁচায়, তা তার নেই।

বনোয়ারী উপন্যাসের শুরুতে মিথে যতদূর গভীর ভাবে বিশ্বাসী, পরে সেই দৃঢ়তা শিথিল হয়। এক সময় সে দেবতার বিশেষ অধিষ্ঠান ভূমি নিয়েও সংশয়ী। বনোয়ারীর বিশ্বাস টলে যুদ্ধকালীন দুর্বহ জীবনের চাপে। করালীর দলবলের রেল লাইনে চাকরি, স্বচ্ছলতা, স্ফূর্তি আর স্থিতাবস্থার পক্ষে যারা তাদের অর্থনৈতিক দৈন্য মনে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে একাধিক কর্তাবাবা-বিরোধী কাজ করা সত্ত্বেও করালী যখন শাস্তি পায় না, তখন বাবাঠাকুরের ন্যায় বিচারে তার সংশয় আসে। সে ভাবে—'করালীর সাজা কি আজও পাওনা হয় নাই? হবে হয়ত।' (পৃঃ ৩৯৫) পাপের ভার পূর্ণ হয়নি, তাই শাস্তি হয়নি, এই ভেবে বনোয়ারী নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। তবে শাস্তি আসবে নিশ্চয়। (পৃঃ ৩৯৯) এই বিশ্বাসও ওই বেল গাছের মতই টলমলে। ওকে জোর করে সোজা করা যায়, কিন্তু তার ভিত চিরকালের মত দুর্বল থেকে যায়। সুচাঁদের মতো সে মিথরোমন্থনে বিভোর নয়, ঐতিহ্য শাসনে দুর্নিবার। কুলাচার তার জীবন নিয়ামক ধ্রুবতারা—কুলাচার আর মিথ কিন্তু আলাদা।

এক সময় তাকে সমাজ পরিবর্তনের চাপে স্বীকার করতেই হয়—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। মানুষের সে বিক্রম নেই, ভক্তি নেই, বাবাও নিজ মহিমা গুটিয়ে নিয়েছেন। কলিকাল তাই এমন। (পৃঃ ৩৬০) আর এক জায়গায় সে বলছে—নিশ্চয়ই বাবাঠাকুর আর নাই, হাঁসুলী বাঁকের দেবতা, উপকথার বিধাতা-পুরুষ চলে গিয়েছেন। তবে আর কি রইল তাদের? বেদনাহত চিত্তে সে হামাগুড়ি

দিয়ে বাড়ির দিকে এগোয়। এ দ্বিধার বীজ আসবে নয়ানের মার মধ্যেও। নয়ানের মা চেঁচায়, পানা বাবার থানে ভালো পাঁটা দেওয়া সত্ত্বেও (!) তার ছেলে মরল কেন? করালী বাবার বাহন মারলেও তার শাস্তি নেই কেন? কিন্তু নয়ানের মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। শুধুই আক্ষেপ। ঘোষমশায়ের কাছে সরল বিশ্বাসের বিপন্নতায় বনোয়ারী যখন কাহার পাড়ার ব্যত্যয় করালীর স্পর্ধা ও বাবাঠাকুরের বিলম্বিত শাস্তির কথা বলে, তখন তিনি একটু হাসেন। 'কাহার কুলের কৌতুকজনক কুসংস্কারের কথা শুনে আনন্দ আছে।' (পৃঃ ৪১০) কিন্তু ঘোষকর্তাও অদৃষ্ট মানেন।

(এ উপন্যাসে যথার্থ বিদ্রোহী চরিত্র করালী। সে বনোয়ারীর নেতৃত্ব মানতে চায় না, মিথের নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না। কর্তা বাবার প্রতি বিশ্বাসে সে আদৌ শ্রদ্ধা রাখে না, ভয় ও নেই। তাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, শিমুল গাছে উঠে নাচে, কত্তার দহে ঝাঁপ দিতে চায়। আগুন ধরলে মজা পায়। গাছ উপড়ে গেলে দেখায় কর্তার মহিমা কল্পনার অন্তঃসারশূন্যতা। বনোয়ারী করালীর দ্বন্দ্ব তাই মিথ ও রিয়্যালিটির দ্বন্দ্বও ঘটে। প্রথম থেকেই করালী ভিন্ন মানসিকতার প্রচল মিথে বিশ্বাসী নয়। এ ভিন্নতা কিভাবে তা অবশ্য লেখক স্পষ্টতঃ দেখান না। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন তেমন করালী কাহার পাড়ার মানুষগুলোর একাংশকে চাষ বাস ও গাছ পালার পরিমণ্ডল থেকে উপড়ে নিয়ে চলে কারখানায়। যেমন গাছ উপড়ে যায়, তেমনি মানুষ ও)

(লেখক নিজেও মিথের প্রাকৃত ব্যাখ্যানে তৎপর। অনেক সময় তিনি লৌকিক ব্যাখ্যা করে বসেন। কখনও সমান্তরাল সাজিয়ে দেন। যেমন—করালী চন্দনপুর থেকে তারে খবর আনে দু এক দিনের মধ্যে খুব জোর বৃষ্টি হবে। কিন্তু বনোয়ারীর কাছে বাবাঠাকুর আকাশময় সে খবর ছড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ অভিজ্ঞ চাষী আকাশ দেখে বৃষ্টির সম্ভাবনা বোঝে। লেখক বলেন 'দুটোই সত্যি' অর্থাৎ দুটিরই মর্যাদা দেন) আবার এক সময় প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কায় তার মনে হয় এ প্রলয়ের মেঘ, দেবতা ক্ষেপলেন। লেখক চিত্তে দুয়ের সমন্বয় দুয়ের মর্যাদা এ কি পরবর্তী পরিমার্জনার ফল? একমাত্র সুচাঁদই মিথ বিশ্বাসে অবিচল। উপন্যাসের শেষেও সে বলে—বাবা কালরুদ্রের চড়ক পাটার ঘোরার শেষ নেই। এই আবর্তন কোনো দিনই স্তব্ধ হবে না। (পৃ ৪৭৭) পাগলের গানেও সেই দেবতার ভাঙাগড়ার আবহমান খেলার কথা।

(কিন্তু যুগ বদলাচ্ছে। (যুদ্ধসংকুল জীবনে কালরুদ্র, ধর্মঠাকুর, শিব, ইন্দ্র,

অপদেবতা, মনসা কারোরই নিয়ামক ভূমিকা নেই। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মতো এতেও (অর্থাৎ সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথায়) পরিবর্তন ঘটেছে। (পৃ. ৩৬৭) তাই সুচাঁদ ঠিকই বলে—'আমার সাথে সাথেই এই উপকথার শেষ। তবে পারতো নিকে রেখো।' তারাশঙ্কর সুচাঁদের সেই আর্তিকে মর্যাদা দিয়েছেন। এক সম্প্রদায়েব, একটা কাল পরম্পরার, মিথলালিত মানসিকতার এক ব্যাপক, গভীর, জীবন্ত, দ্বন্দ্বময় আলেখ্য রচনা করেছেন। এ মোটেই 'ভানুমতীর ভেলকি' নয়। 'সবই অলীক অবাস্তব' বলা যায় না—যা বলেছিলেন হিরণ সান্যাল। তবে বামপন্থীদের নিন্দা নিশ্চয়ই তার মনে লেগেছিল। তাই দীর্ঘ বিস্তার সংযোজনে তিনি মিথ থেকে ইতিহাসে পা রাখতে চান– রাখভেন্ কথিত natural history থেকে historyতে। (তাই উপন্যাস শেষ হয়—'উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে, এই পংক্তিতে) ম্যালিনোস্কি বলেছিলেন—মিথ তাই মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এ হয়ত বৌদ্ধিক ব্যাখ্যান নয়, শৈল্পিক চিত্রকল্প নয়, বরং তা এক pragmatic character of primitive faith and moral wisdom হয়ে আসে। (মির্চা এলিয়াডও বলেন—মিথ যথার্থ ইতিহাস কারণ তা ব্যবহার করে বাস্তবকেই। এই যে উপকথাকে ইতিহাসে উত্তরণ করা, এখানেই তারাশঙ্করের মহত্ত্ব, এখানেই তার আধুনিকতা)

হোয়াইট বলেছিলেন—A mythological novel is largely successful when it manages to present the reader with an important realistic theme and at the same time makes him feel the chosen analogy has enriched his understanding of the primary material.[২২] হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে মিথও সাম্প্রতিকতার অসামঞ্জস্য নয়, মিথ এখানে ভান সর্বস্ব নয়, অপ্রয়োজনীয়ভাবে দুর্বোধ্য নয়, বরং এখানে আছে এক সুষম সামঞ্জস্য। মিথ ধ্বংসের আর্তনাদ এবং বস্তু পৃথিবীর নির্মম রথের চাকার শব্দ এখানে পেয়েছে এক নান্দনিক নির্মিতি, যা দুর্লভ, যা বিস্ময়কর, যা বাস্তবও তো বটে।)

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. Mythology in the Modern Novel—John J. white বইতে উল্লিখিত। Pg 3.

২. Quest for myth—Richard Chase, Introduction, Pg. V.

৩. Myth—K. K. Ruthven, 1976, Pg. 1

৪. Ancient Myths in Modern Poetry—Lyllian Feder 1971, Pg. 11.

৫. A Glossary of Literary Terms—M. H. Abrams. 1993, Pg. 122.

৬. Myth and Reality—Mircea Eliade, 1963, Pg. 1.

৭. Robert Graves-এর ভূমিকা New Larousse Encyclopedia of Mythology. Pg. vii

৮. এই অংশটি লিখতে বরুণকুমার চক্রবর্তীর 'প্রসঙ্গ ঃ লোকপুরাণ' বইটির সাহায্য নিয়েছি।

৯. মিথের নৃতাত্ত্বিক বিচারে ক্লদ লেভি স্ট্রাস্ মিথের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। Myths incorporate and exhibit binary oppositions which are present in the structure of the society in which the myth was born. In the myth these oppositions are reconciled and overcome. তিনি মিথ ও বিজ্ঞানের লজিক্যাল মডেলকে একই প্রকার নিয়মানুগ মনে করেন। স্ট্রাস-এর বিরোধী এলিয়াড, যিনি কোনো বিশেষ সমাজের স্থানিক ও বিশেষ ধরণকে গুরুত্ব না দিয়ে এক সার্বিক, মানবিক ধর্মীয় আগ্রহের কথা বলেন।

১০. The Novels of Hermann Hesse—Theodore Ziolkowski, Pg. 118.

১১. Myth Criticism : Limitations and Possibilities—E. W. Herd, Pg. 70.

১২. Mythology in the Modern Novel—J J. white, 1971, Pg, 52-54.

১৩. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ৫৫৫।

১৪. লোক পুরাণ ঃ রূপ ও চরিত্র—সনৎকুমার মিত্র, লোক পুরাণ ও সংস্কৃতি, ১৯৯৫, পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত, পৃঃ ১২৪-২৫।

১৫. এ নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন দিব্যজ্যোতি মজুমদার (আদিম সমাজ-মনন ও সৃষ্টি বিষয়ক লোক পুরাণ) এবং মাধুরী সরকার (সৃষ্টি ও প্রলয়ের লোক পুরাণবৃত্ত), পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৬. তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা, রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৭।

১৭. রাঢ়ের সংস্কৃতি—অমলেন্দু মিত্র, ১৯৭২, পৃঃ ৫৬-৭০।

১৮. পল্লব সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫।

১৯. এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সুজিত সুর তাঁর 'বাংলার প্রাচীনতম লোকপুরাণ ঃ মনসামঙ্গল' প্রবন্ধে, পল্লব সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২০. 'At all times reasons used to solidify a political unit, whether a village or a nation, have had a mythological component. In recent times, however, people have begun to think of social and political 'ideologies' in terms of mythical function, and conscious have been made to utilize myth for social and political purposes, The most conspicuous example has been the Nazi endeavour to revive Germanic mythology, Karl W, Butzer

Encyclopaedia Britannica vol 12 1974ed, Pg, 803

২১. Myths—Alexander Eliot, 1976, Pg, 107

২২. হোয়াইটের পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯১।

[এই প্রবন্ধে পৃষ্ঠা সংখ্যা তারাশঙ্কর গ্রন্থাবলী (মিত্র ও ঘোষ) ৭ম খণ্ড থেকে]

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : নিসর্গ চেতনা

অনিলকুমার রায়

বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে প্রকৃতি এক সজীব সত্তা নিয়ে ধরা দেয়। তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস প্রকৃতি চিন্তাব এক অপরূপ ভাষ্য। নিসর্গ প্রকৃতির ছত্রছায়ায় আজন্ম লালিত হয়ে কোন মানুষী যে স্বভাবে আরণ্যক হয়ে যায়, সে যে আর সংসার সমাজেব সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না তারই পরীক্ষা মূলক প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। কপালকুণ্ডলা ও প্রকৃতি—'দ্বাবপি অত্র আরণ্যকৌ'। প্রকৃতি সত্তারই একরূপ কপালকুণ্ডলা। কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টিতে প্রকৃতি অনেকটাই রোম্যান্স রসসিক্ত। তা বড় রহস্যময়। শরৎচন্দ্র প্রধানত সুখ-দুঃখে গড়া মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের রূপকার। 'সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই' তাদের কথাকে দরদী হৃদয় নিয়ে তুলে ধরতেই তিনি কৃতসংকল্প। ফলে তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। তবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের নৈশ অভিযানের বর্ণনায় তিনি কালো অন্ধকার রাত্রির রূপ তুলে ধরছেন এইভাবে, 'নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালী মূর্তি।' শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি দৃষ্টি-ও এখানে রোম্যাণ্টিক সুন্দর হয়ে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে সত্তার গভীরে নিয়ে গেছেন। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাঁর কবি চিত্তকে বিস্ময় মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়া তাঁর গল্পে শুধু আবহ সঞ্চারই করেনি। পল্লী মানুষ ও কমনীয় সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি প্রসঙ্গ তুলনায় কম। কেননা, উপন্যাসে সমস্যা সঙ্কুল নাগরিক জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে নর-নারীর হৃদয় রহস্য উন্মোচনের চেষ্টাই প্রবল। তবু কখনো কখনো তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি যখন আসে তখন তা কবিত্বের সুষমায় সমৃদ্ধ যেমন হয়ে ওঠে তেমনি হৃদয় রহস্য উদ্ঘাটনেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। উপন্যাসে প্রকৃতিকে স্বরূপে প্রাণবন্ত করে তোলার আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার স্নিগ্ধ সজল কান্তিময় প্রকৃতি আর বিহারের রুক্ষ প্রকৃতি তাঁর মননলোকে নিয়ে আসে সুদূরের মহিমা। তাঁর 'পথের পাঁচালি', 'আরণ্যক' প্রধানত দুই ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে রচিত হয়ে প্রকৃতি জিজ্ঞাসার নব ভাষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ

ও একদিক থেকে রোম্যাণ্টিক কবিমনস্ক। প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, তার গা ছমছম করানো ভয়াল রূপ বিভূতিভূষণকে নিয়ে যায় কোন এক রহস্যলোকে। প্রকৃতির আদিমতা, তার ভয়াল কুটিল রূপ মানবজীবনে কোন্ গভীর প্রভাব ফেলে তা বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে দেখান নি। তাঁর উপন্যাসে ব্রাত্য জীবন আছে, প্রাগার্য জাতির বংশধর আছে কিন্তু তাদের জীবনে নেই আদিম আরণ্যক জীবনের পূর্ণায়ত রূপ।

এদিক থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। রাঢ় অঞ্চলের মানুষ তারাশঙ্কর রাঢ়ের ব্রাত্য মানুষগুলির সাথে মিশেছিলেন গভীরভাবে। ডোম, সাঁওতাল, বাউড়ী, বাগ্দী, কাহার প্রভৃতি জাতির মানুষগুলির জীবনযাত্রা তিনি দেখেছিলেন অত্যন্ত কাছ থেকে। ভদ্র সমাজের থেকে দূরে বাস করে এই প্রাগার্য জাতির মানুষগুলি। সভ্যতার ঊষালগ্নে অরণ্যবাসী যে অস্ট্রিক গোষ্ঠার মানুষগুলির পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই তারা তো বনজঙ্গলকেই আপন করে নিয়েছিল। বনের ফলমূল খেয়ে আর বন্য জীবন যাপন করে তারা তো হয়ে উঠেছিল আরণ্যক। পরে মানুষ সভ্য হয়েছে, সমাজ গড়েছে, নগর গড়েছে, দেখা দিয়েছে কৃত্রিম জীবন যাপন। কিন্তু যে প্রাগার্য মানুষগুলি অরণ্যের গাছপালাকেই দেবতা বানিয়ে, অরণ্যেই লালিত পালিত হয়ে জীবনযাপন করেছিল তাদেরই তো ঐতিহ্যবহন করছে বাংলার রাঢ়ের ঐ ডোম, সাঁওতাল, বাগ্দী, কাহার প্রভৃতি সম্প্রদায়। এরা এখনো গাছকে, শিলাখণ্ডকে দেবতা বানায়, ফুল বেলপাতা দিয়ে কল্পিত বৃক্ষদেবতাকে পূজো করে, মানত করে। তারাশঙ্কর এদের নিবিড় করে দেখেছিলেন বলেই এদের মধ্যে আবিষ্কার করেন আদিম আরণ্য জীবনকে। আরণ্য প্রকৃতির মতই এরা বিশাল, উদার মনস্ক আবার হিংস্রও বটে। তারাশঙ্করের গল্পে উপন্যাসে প্রকৃতির সেই চির পুরাতন দিকটি নবাবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তেও এই প্রকৃতি দৃষ্টির পরিচয় মেলে। ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান, বিশেষ পরিবেশে অধ্যুষিত মানুষগুলির জীবিকানির্বাহ প্রভৃতি ব্যাপারে তারাশঙ্করের বিশেষ অভিজ্ঞতা তাঁর প্রকৃতি চেতনাকে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "আঞ্চলিক পটভূমির অনুপুঙ্খ সম্বন্ধে জ্ঞান, ভূমি ব্যবস্থার এবং গ্রামীণ আর্থ-নীতিক প্যাটার্নের সঠিক চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি এই উপন্যাসের সঠিক পরিবেশকে জমাট করে তুলেছে।"[১] আমরা এই উপন্যাস পাঠে পৌঁছে যাই সেই আদিম আরণ্য সভ্যতায় যেখানে মানুষ মঙ্গল-অমঙ্গল বোধে, পাপপুণ্য বোধে, অদৃশ্য কোন শক্তি

আবিষ্কারে প্রকৃতি নির্ভর। কুসংস্কারে, আচার আচরণে, চরিত্র গঠনে, আধিভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রকৃতিই তাদের সব। প্রকৃতি এখানে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে উপন্যাসের সার্বিক অবস্থাটাই পাল্টে দেয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কথাসাহিত্যে নিসর্গের ব্যবহার দুভাবে হতে পারে। **Robert Liddell** বলেছিলেন, যদি বস্তুগতভাবে ব্যবহার হয় তাহলে দেখতে হবে ঘটনা পরম্পরাকে ব্যাখ্যা করতে তা কত দূর সাহায্য করেছে। কিন্তু সাবজেকটিভ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি চরিত্রের প্রেক্ষণ প্রভাব ফেলতে পারে। লেখকের অভিপ্রায় ও নিসর্গ নির্বাচনে, চিত্রকল্প ব্যবহারে নেপথ্য থেকে গুরুত্ব পূর্ণ কল কাঠি নাড়ে। স্থানকাল ভেদে প্রকৃতির যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য গোচর হয় তা বিশেষ অঞ্চলের মানুষের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে মানুষের সমস্ত ব্যক্তিত্বটি গড়ে উঠে। তারাশঙ্কর বলেছিলেন—"মানব মনের যে চৈতন্য দেশ ভেদে, গ্রাম ভেদে, বিশেষ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়, তা মাত্র সমাজ ও শিক্ষার প্রভাবেই হয়—তা হয় না। তার মধ্যে ভূমি এবং প্রকৃতিরও প্রভাব আছে। রাঢ় অঞ্চলেব মাটি ও প্রকৃতির প্রভাবে মানব প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য, কাজল কোমল নদীবহুল পূর্ববঙ্গের মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তা থেকে পৃথক।"[২]

লাল কাঁকুরে মাটির দেশ বীরভূমের কোপাই নদীর তীরে বাঁশবাদি অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে পুরুষ পরম্পরায় বাস করে কাহারেরা। বর্তমানে যে সব কাহার এখানে বাস করে তাদের মাতব্বর বনওয়ারী। সকলেই এখানকার অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে এমন মিশে গেছে যে কোন চরিত্রকেই প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। তারা হয়ে ওঠে আরণ্যক। তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে লেখক পরিচয়ও করিয়ে দেন হাঁসুলী বাঁকের কোন না কোন নৈসর্গিক উপাদানেব সাহায্যে। মাতব্বর বনওয়ারী স্বভাবে ভালমানুষ, শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু যখন সে বিদ্রোহ জানায় তখন তার উপর ভর করে আসুরিক শক্তি। এ বনোয়ারী তখন 'বিধাতার মোটা হাতে পাথর কেটে গড়া।' সুচাঁদ পিসি চির রহস্যময়। নানা উপকথা বলে সে কাহারদের বশে রাখতে চেষ্টা করেছে। সে বলে, বাবা কালারুদ্দুরের নিদেশ যেন কেউ অমান্য না করে। এই 'আদ্যিকালের বুড়ী' সুচাঁদ পিসি অকারণে কাঁদে, 'বোমা ফাটার মত' ফেটে পড়ে, ছোট সামান্য ঘটনাকে অসামান্য করে দেখে। তার প্রকৃতিটাই 'অরণ্য অর্থাৎ অরণ্যের মত।' লেখক বলছেন, "অরণ্য যেমন মাতলে ঝড় ওঠে, কাঁদলে বর্ষা নামে, তেমনি পিসি তিলকে করে তাল, উইঢিপিকে করে পাহাড়, কাঁদলে গগন ফাটিয়ে চেঁচায়···" কালোশশী, 'কোপাই নদীর দহ' পাখি পাখির মতই চঞ্চলা, আষাঢ় মাসে

ঘনমেঘে তালচড়ুই যেমন নেচে নেচে ওঠে পাখিও সেরকম নাচে। নখ আর ঠোঁট দিয়েই সে বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করে। আর সুবাসীর চোখ দুটো 'ঠিক সাপের মত'। পাগল কাহার 'নীলের বাঁধের জলের মত'। আকাশের রঙেই নীলের বাঁধের জলের রঙ বদলায়। অনুরূপ পাগলের কাছেও কাহার পাড়া আকাশ। 'কাহার পাড়া হাসলে সে হাসে কাঁদলে সে কাঁদে।' 'নিমতেলে পানু' নিমগাছের মতই বুঝি তেতো। কোন ঘটনাকেই সে সহজে ছাড়ে না। তার ঘোর প্যাঁচের কথা কাহারদের মনে তিক্ততার স্বাদ আনেই। এইভাবেই চরিত্রগুলি হয়ে ওঠে হাঁসুলী বাঁকের অঞ্চল প্রকৃতির প্রতীকরূপ।

হাঁসুলী বাঁকের বিশেষ অঞ্চল প্রকৃতির পরিমণ্ডলে বাস ক'রে, নানা গালগল্প, অলৌকিকতার মধ্যে জীবনকে চালিত ক'রে কাহারদের মধ্যে যে আদিমতা লক্ষ্য করা যায় সেই আদিমতা ফুটিয়ে তুলতে বাঁশবাদর প্রকৃতির ভূমিকা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি মানবিক চিত্তবৃত্তিগুলি কাহারদের মধ্যে যখন প্রকাশ পায় তখন তাকে উপলব্ধি করতে বাঁশবনের নিসর্গ প্রকৃতির অনুষঙ্গ দরকার হয়। নইলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না কাহারদের আদিম চিত্তবৃত্তিগুলি। করালী রুগ্ন নয়ানকে নির্মমভাবে প্রহার করলে সেই প্রহারের তীব্রতাকে অরণ্যে বাঘ-ভাল্লুকের পরস্পর আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্যে প্রতীকায়িত করা হয়।

সুচাঁদ পিসি মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে উপকথা বলে। আর এই নেশার তীব্রতা 'কোপাইয়ের হড়পা বানের' প্রতীকেই আশ্চর্য ব্যঞ্জিত হয়। সুচাঁদ পিসি ও পাখির পারস্পরিক চরিত্র হননের মধ্যে দিয়ে বিবাদ চরমে উঠে যে ভয়ানক আকার নিতে চলেছে তা তুলে ধরতে গিয়ে লেখক প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। "ঠিক মাথার উপরে যে চিলটা স্থির পাখা মেলে ভেসে চলেছিল বলে মনে হচ্ছিল সেটা এই মুহূর্তেই সজোরে পাখা আন্দোলিত ক'রে দ্রুততর বেগে অতিক্রম ক'রে গেল স্থানটা।" উড়ন্ত চিলের প্রতীকে সুচাঁদ পিসি পাখির পরবর্তী কাণ্ডকারখানা যেন আভাসিত হয়ে উঠে। নতুন যুগের অপ্রতিহত গতিকে আর প্রাচীন পন্থী বনোয়ারীর পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই ভেঙ্গে দেওয়া কোঠাবাড়ীটা করালী আবার নতুন করে গড়ল। পুরনো বিশ্বাস বিদায় নিচ্ছে, নতুনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এটাকেই ব্যঞ্জিত করলেন লেখক এই বলে, 'সেই মরাগাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে হুকুম দিয়েছিল-লাগাও। আবার করালী চন্নপুর যাবার পথে জানিয়ে দেয়, 'বাবাঠাকুরের মুড়ো বিম্ববিক্ষাটি প'ড়ে গিয়েছেন'। পৃথিবীতে যুদ্ধ লেগেছে। ধনবাদী সভ্যতা মানব সভ্যতাকে গ্রাস করছে। দিকে

দিকে কলকারখানা গড়ে উঠেছে। অর্থের নেশায় মানুষ কারখানায় মজুরী খাটতে চলেছে। মানুষ হয়ে উঠছে বাস্তববাদী, যুক্তিপরায়ণ ও বিচারমনস্ক। করালী ও তার দলবলের মধ্যে দিয়ে লেখক সেটা দেখিয়েছেন। আর কল্পিত কোন দেবতাকে খাড়া করে যে জীবন যাপন সম্ভব নয় তা ব্যঞ্জিত করতেই তারাশঙ্কর এখানে নিয়ে এলেন 'মরাগাছের গুঁড়ি' ও 'মুড়ো বিল্ববিক্ষটি'কে। এইভাবে প্রকৃতিই হয়ে ওঠে যুগ পরিবর্তনের ভাষা।

প্রকৃতির বস্তুধর্মী বর্ণনায় হাঁসুলীবাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এ প্রকৃতি যেন হাঁসুলিবাঁকের নিজস্ব। পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য নিয়ে হাঁসুলিবাঁক হয়ে ওঠে বড় মনোরম। এখানকার রাত্রির বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক এইভাবেঃ "হাঁসুলীবাঁকে রাত্রি প্রভাত হয় পৃথিবীর সঙ্গেই যথা নিয়মে। গাছে গাছে পাখী ডাকে। ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশির বিন্দু ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে। বাঁশ বনের মাথা থেকে বনশিরিষ, নিম, আম জাম, কাঁটাল শিরিষ বট পাকুড়ের মাথা থেকে টুপটাপ করে শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুল ফোটে। পূর্বদিকে নদীর ধার পর্যন্ত অবারিত মাঠের ওপারে—কোপাইয়ের ওপারের গ্রাম গোপগ্রামের চারিপাশে গাছপালার মাথায় সূর্য ওঠে।"

হাঁসুলীবাঁকের প্রকৃতি নব রূপ ধারণ করে হেমন্ত ঋতুতে। মাঠে কত না পাকা ধানের লাবণ্য, রবিফসলের সবুজ রূপ হাঁসুলিবাঁককে বড়ই সৌন্দর্যময়ী করে তোলে। লেখকের বর্ণনায় সেই প্রাকৃতিক পরিবেশটি অপূর্ব। "কার্তিক অগ্রহায়ণে হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় পলেনের মাঠের রঙ হয় সোনার বরণ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস, পাকা ধানের গন্ধে ভুরভুর করে।······আউশের মাঠে আউশধান উঠে গিয়ে রবিফসলের সবুজে ভরে ওঠে। গম, কলাই, আলু, যব, সরষে, তিসির অঙ্কুরে রোমাঞ্চ দেখা যায়। হিল হিলে বাঁশবনের মাথা উত্তরের বাতাসে দুলতে থাকে।······আকাশে উড়ে নেচে বেড়ায় নতুন পাখীর দল। দুপুরের রোদ চনচন করে, রাত্রিবেলা গা সিরসির করে।" প্রকৃতির এই পরিবেশ অঙ্কনে তারাশঙ্কর হয়ে উঠেছেন কবি। কবির মতই সূক্ষ্ম অনুভূতি এসব প্রাকৃতিক পরিবেশকে লাবণ্যময় করে তুলেছে। একই সঙ্গে প্রকৃতির বস্তুরূপ (**Objective**) ও তন্ময় (**Subjective**) রূপ যেন ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতি-মানুষে একাত্মতা হাঁসুলীবাঁকের প্রকৃতিকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। বাঁশবাদি অঞ্চলে কয়েক ঘর কাহারের বাস। প্রকৃতির ছত্রছায়ায় থেকে কাহারদের আচার-

আচরণ, গতিবিধি প্রকৃতিরই পরিপূরক হয়ে উঠে। আবার প্রকৃতিও এখানকার নর-নারীরই দোসর হয়ে ওঠে। কাহারদের ঝিউড়ী মেয়ে হঠাৎ রেগে উঠলে ভয়ংকরী হয়ে ওঠে। বাড়ীর সকলের সঙ্গে বিবাদ করে, পাড়াপড়শীকে শাপশাপান্ত ক'রে কাহার কন্যা বেরিয়ে যায় আবার রাগ পড়লে 'গাঁয়ের ধারে বসে থাকে, তারপর একপা দু-পা করে এগিয়ে এসে বাড়ির কানাচে গুণগুন করে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না।' অনুরূপ, কোপাই নদীও ভরা অবস্থায় হয়ে ওঠে ডাকিনী। 'শতমুখে কলকল খলখল শব্দে' কেবল ছোটে। দুদিন কি চারদিন পর আবার আপন কিনারায় নেমে আসে। কুলকুল করে বয়ে যায়। তাই কোপাই 'যেন কাহার কন্যে।' কালোশশী ও বনওয়ারীর নিভৃতে সাক্ষাৎ হলে, প্রদীপ নিভে যেতেই উভয়ে ডুবে যায় আদিম অন্ধকারে। আর সেই অন্ধকারকে আরও গাঢ়তা দিতেই ছুটে আসে বাঁশবনের তলার পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকার। প্রকৃতি ও মানুষ সেখানে একাকার। "প্রদীপটা নিবে যেতেই সে অন্ধকার ছুটে এল যেন কোপাইয়ের বুক থেকে হড়পা বাণের মত। সেই তমসার মধ্যে মদের নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারী ও কালোশশী বিলুপ্ত হয়ে গেল।"

নিভৃতে এই একান্ত প্রণয়ালাপ পানুর দৃষ্টি কিন্তু এড়ায় নি। বাঁশবনের ঘোর অন্ধকারেও কাহারদের দৃষ্টি যে কী তীক্ষ্ণ তা বলতে গিয়ে লেখক বলছেন, "ওদের চোখেও তখন জেগে ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নি আবিষ্কারের পূর্বযুগের মানুষের চোখের অন্ধকারভেদী আরণ্য জন্তুর দৃষ্টিশক্তি।" বনোয়ারী পরমের লড়াই যেন 'দুই বুনো দাঁতালের গুঁতোগুঁতির লড়াই।' প্রকৃতি ও মানুষ অভিন্ন হয়ে কী দুর্ধর্ষ শক্তির রূপ নেয় তা দেখতে পাই উপন্যাসের শেষে করালীর বিরুদ্ধে বনোয়ারীর গর্জে ওঠার মধ্যে। করালী এখন পাখিকে ছেড়ে সুবাসীকে ভালোবাসে। সুবাসীকে সে ছাতিম ফুল উপহার দিয়েছে। পাখী তা জানতে পেরে করালীর সঙ্গে বিবাদ করে এবং বনোয়ারী নিজকানে তা শুনে করালীর উপর যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাকে বাঁশবনের প্রাকৃতিক অন্ধকারের পরিবেশ তৈরী করেই লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন, "সঙ্গে সঙ্গে গাছের তলাটাই যেন গর্জন করে উঠল। মনে হ'ল বাঘের মত কোন ভয়ানক জানোয়ার চীৎকার ক'রে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। সে চীৎকারে করালী পাখী ভয়ে চমকে উঠল। অন্ধকার গাছটার ভিতরটায় ঘুমন্ত পাখীরা ভয়ে চমকে উঠে পাখা ঝটপট করতে লাগল। শনশন শব্দ তুলে কয়েকটা বাদুড় উড়েও গেল।"

অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে যে উন্মুক্ত অকৃত্রিমতা আছে তা এই কাহার মানুষ-মানুষী-

গুলির মধ্যেও সমানভাবে বর্তমান। বনোয়ারী গোপালীবালাকে নিজ স্ত্রী রূপে পেয়েও কালোশশীকে গোপনে ভালোবাসে। কেউ জানলেও এতে তার কিছু এসে যায় না। বসন চৌধুরীবাড়ী যাতায়াত ক'রে অবৈধ কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে। সে হল পাখী। আবার পাখীও হেঁপোরুগী নয়ানকে তার স্বামী হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে করালীর প্রতি প্রণয়াক্ত হয়েছে। করালী শেষে পাখীকে ছেড়ে সুবাসীর প্রতি আসক্ত। বনোয়ারী কালোশশীর মৃত্যুতে আবার সুবাসীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে। এজন্য কাহারদের কোন লজ্জা নেই, সামাজিকতা নেই। অরণ্যলালিত প্রাণীর মতই তারা জৈবিক আকর্ষণে তৃপ্ত। সভ্য সমাজের রীতি এখানে খাটে না। বাঁশবাদি অরণ্যাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে তারা আরণ্যক জীবনযাপন করছে। তাই আরণ্যক জীবনের ঐতিহ্যও তারা বহন করছে। নারীপুরুষের পারস্পরিক ভালো লাগাটাই বড় কথা। সে ভালোলাগা আসলে এদের কাছে মনে 'অং' ধরা অর্থাৎ রং। রং যখন ধরে তখন আরণ্যক প্রাণীর মতই এরা স্বয়ং-প্রকাশ। "ওদের এতে লজ্জা নাই। ভালবাসলে সে ভালবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়াপড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই ঢাকতে জানে না কাহারেরা। সে অভ্যাস এদের নেই, সে ওরা পারে না। সেই কারণেই মধ্যে মধ্যে কাহারদের তরুণী মেয়ে বানভাসা কোপাইয়ের মত ক্ষেপে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ায়।" তাদের এই উন্মুক্ত প্রেম বাঁশবনের প্রাকৃতিক পরিবেশেই সামঞ্জস্য পায়।

প্রকৃতিই কাহারদের কাছে আশা ভরসা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সুবিচারক। শিমুল-বৃক্ষে দীর্ঘ অজগর সাপটি হয়ে যায় বাবা কালারুদ্দরের বাহন। সুচাঁদ পিসি নিজ চক্ষে দেখেছেন, বাবা ঐ বাহনে চড়ে ভ্রমণ করেন। বিল্ববৃক্ষটি হয় কর্তাবাবার থান। এই কর্তাবাবার কাছেই কাহাররা পুজো দেয়, মানত করে। কোন অন্যায় করলে তারা 'মাজ্জনা' চেয়ে নেয়। কালোশশীর সঙ্গে বনোয়ারীর অবৈধ সম্পর্ক জানাজানি হলে বনোয়ারী কর্তাবাবার কাজে 'মাজ্জনা' চেয়ে বলেছে, 'পড়ুক একটি বেলফুল তোমার থানে পড়ুক।' আর নয়ানের মা কর্তাবাবার থানেই নিষ্পলক চেয়ে থেকে তার ঘর ভাঙাদের এবং করালীর বিরুদ্ধে শাস্তি দেবার জন্য কাতর মিনতি জানায়। ঘূর্ণিহাওয়া বনোয়ারীর কাছে কালোশশীর প্রেতাত্মা বুঝি। বাঁশবনে অন্ধকারে ভয় লাগলে কাহাররা 'বাবার থানের' দিকেই তাকায়। তাদের বিশ্বাস বাবাই তাদের ভয় কাটিয়ে দেন। বৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা ঝড়ের খবর নিতে তারা করালীর দেওয়া 'তারের খবর' এর অপেক্ষায় থাকে না। তারা বেলগাছ, শ্যাওড়া গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধা পিঁপড়েগুলির দিকে তাকায়, পিঁপড়ের নীচে নামা

উপরে উঠার গতিবিধি লক্ষ্য করেই বনওয়ারী আবিষ্কার করে বৃষ্টি হবে, না, অনাবৃষ্টি হবে।

চৈত্রসংক্রান্তি শেষ মানে বছরেরও শেষ, সেই বছরের পরিসমাপ্তি বোঝা যায় গোটা বাঁশবনের চাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে "হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবনে বনে আদ্যিকালের অন্ধকার চ'কে চ'কে অর্থাৎ চমকে চমকে উঠল। কীটপতঙ্গ পশুপক্ষীরা কলকল ক'রে উঠল। সাপেরা গর্তের মধ্যে পাক ঘুরে ফণা তুললো, জন্তু জানোয়ার গা ঝাড়া দিলো। তারাও জানলে বছর শেষ হল।" গোটা প্রকৃতি যেন কাহারদের মতই ব্যক্তিত্ব পেয়ে যায়। প্রকৃতির মধ্যে এইভাবে ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে তারাশঙ্কর হাঁসুলিবাঁকের প্রকৃতিকে দুর্দান্ত, স্বতন্ত্র স্বভাব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করে তোলেন। হাঁসুলিবাঁকের কালবোশেখী ঝড় যেন দৈত্যের চেহারা নেয়। লেখকের বর্ণনায় তা অপূর্ব হয়ে ওঠে : 'কালো মেঘের গায়ে রাঙা মাটির ধুলোর লালচে 'দোলাই' অর্থাৎ চাদর উড়ছে। কালো কষ্টি পাথরের গড়া বাবা কালারুদ্রের পরনের রক্তরাঙা পাটের কাপড় যেন ফুলে ফুলে উঠছে। হাঁ হাঁ করে হাঁকতে হাঁকতে আসছে। দুহাত দোলাতে দোলাতে বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সামনে যা পাবে সাপটে জাপটে ধ'রে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে ফেলতে ছুটে চলে পাগলা হাতির মত, শিঙ বাঁকানো বুনো মোষের মত, গাছ ভাঙে মাঝখান থেকে, ডালও ভাঙে। মূলসুদ্ধ উপড়েও পড়ে, পাতাফুল ছিঁড়ে কুটে সারি সারি।" কড়া মাটির দেশ এই হাঁসুলি বাঁক। মাটিতে কোপ দিলে আগুন ঠিকরে পড়ে। সব মিলে হাঁসুলিবাঁকের প্রকৃতি হয়ে উঠে সজীব ব্যক্তিসত্তাময়। এছাড়া, এই উপন্যাসে স্বল্পজ্ঞাতবা অজ্ঞাত জনগোষ্ঠীর জীবনের উপকথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর কয়েকটি অজ্ঞাত নিসর্গের ব্যবহারও করেছেন। যেমন, বাবাঠাকুরের থানের বর্ণনা, অসুরের কাঁড়ি (নুড়ির গায়ে পৈতের দাগ), বনোয়ারীর চড়ক চাপার স্থানের বর্ণনা, শিমুল গাছের বর্ণনা প্রভৃতি।

সবশেষে বলা যায়, প্রকৃতি এ উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যক্তিজীবন এবং গোষ্ঠী জীবনে অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী বাঁশবাদি গ্রামের আকাশ, মাটি, জল, বৃক্ষ, প্রাণী, পুজোর থান সমন্বিত আদিম বিশ্বাসের প্রাকৃতিক জগৎটি সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতি এখানে কখনো বা চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে বাঁধা পড়েছে, কখনো চরিত্রের সুখদুঃখে নিজেও উদ্বেলিত হয়েছে, আবার কখনো চরিত্রগুলির সুখদুঃখ, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সমগ্র কাহিনীটিরই যেন সে নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এ উপন্যাসে নায়কবিচারে বনওয়ারী, করালীর পাশে বাঁশবাঁদির প্রকৃতিকেও এক

যোগ্য প্রতিযোগী হিসাবে স্বীকার না করে উপায় থাকে না। অথবা, বলা যায়, এই বাঁশবাদি অঞ্চলের প্রকৃতি একটি জনপদ জীবনের পরিপূরক। তারাশঙ্করের মৌলিকতা জনপদ জীবনের চিত্রায়ণে। সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র তারাশঙ্করের এই মৌলিকতার কথা বলতে গিয়েই বলেছেন, "কিন্তু ছুঁয়ে ছিলেন কিসে? রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি, বোধি ও পরিশীলিত সৌন্দর্য চেতনার রাজ্য তাঁর নয়, শরৎচন্দ্রের মত হৃদয়ের ভার নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় অসামান্য বিন্যাসনিপুণ যাদুকরও তিনি নন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন যাপনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে নেই, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈসর্গিক স্বভাব সারল্য নেই। আবেদন তাঁর ভিন্ন, বাংলা সাহিত্যে তিনি ভিন্ন ধারায় দেখা দিয়েছিলেন। উপযুক্ত উপাধি না মেলা পর্যন্ত সে ধারাকে জনপদ সাহিত্য বোধহয় বলতে পারি। জন নয়, জনপদ—ব্যক্তি নয়, আবহমান কালস্রোতে কখনো শ্লথ, কখনো হয়ত পরিবর্তনশীল দেশের গ্রামভিত্তিক গোষ্ঠীদেহ, তারাশঙ্করের সাহিত্য সৃষ্টির তাই হল মূল উপাদান ও মুখ্যচরিত্র। বস্তুত, এই জনপদ জীবনের কথাকার হওয়াতেই তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই এসেছে নিসর্গ প্রকৃতির আদিম জৈবিক রূপটি। এই উপন্যাসেও অনভিজাত জনজীবনের কাহিনী তুলে দিচ্ছেন তারাশঙ্কর বাঁশবাদি অঞ্চলের প্রকৃতিকে দোসর করে নিয়ে। তারাশঙ্করেরর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি। ডিকেন্সের যেমন লণ্ডন, দোদের যেমন প্রভাঁস, জয়েসের ডাবলিন, হার্ডির পশ্চিম ইংল্যাণ্ড তেমনি তারাশঙ্কর আর রাঢ় অঞ্চল প্রধানত বীরভূম এক হয়ে গেছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

(১) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

(২) 'আমার কালের কথা', শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'সোনার মলাট তারাশঙ্কর।

(৩) 'শতপ্রসঙ্গ', প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৩৮৮।

উপকথার কথক সুচাঁদ

তপতী মুখোপাধ্যায়

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যাঁর সাহিত্যকৃতি প্রসঙ্গে একদা মন্তব্য করেছিলেন, "তাঁর সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য—মাটি আর মানুষ। মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমা"[১]--সেই তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে মাটি আরমাটির খুব কাছের মানুষের বৈচিত্র্যময় সমারোহ পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে তারাশঙ্কর নানা নেশার, বিভিন্ন পেশার মানুষের অজস্র বর্ণাঢ্য ছবি এঁকেছেন। কখনো সে মানুষ জমিদার, কখনো ব্যবসায়ী, কখনো সমাজসেবী, কখনো রাজনৈতিক কর্মী, কিন্তু প্রতিটি চরিত্রই তার নিজস্ব বৃত্তে সমান দীপ্র ও আকর্ষণীয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি গোত্রবিচারে একটু স্বতন্ত্র কোটির কারণ আমরা এই প্রথম মুখোমুখি হই বিচিত্র এক উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর—যারা প্রবল প্রাণশক্তিতে ভরপুর, অথচ অন্ধ কুসংস্কার আর দৈবের মহিমায় প্রশ্নহীন আনুগত্য তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আশ্চর্য রকমের নিয়তিবাদী করে তুলেছে। শিল্পায়ন, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি নানা ঘটনা তাদের নিস্তরঙ্গ, দৈবায়ত্ত জীবনের তটভূমিতে আঘাত করে অবশ্যই, কিন্তু সামান্য মাত্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে, ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে তা ফিরে যায়, জেগে থাকে শুধু নভোবিহারী 'কালারুদ্র' ও বিষবৃক্ষসঞ্চারী 'কর্তাবাবার' অনিঃশেষ মহিমা। আর এই নিয়তির অবশ্যম্ভাবিতা, মানুষী শক্তিকে অক্লেশে পর্যুদস্ত করে অপ্রাকৃত শক্তির মহিমা অনুভব ও প্রচার করে চলে কাহার গোষ্ঠীর এক অশীতিনর বৃদ্ধা সুচাঁদ (বয়স চার কুড়ি)। প্রাচীন সংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের প্রতিভূরূপে সুচাঁদ অবিরত জেহাদ ঘোষণা করে যুক্তি আর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। সংস্কারের অচলায়তনকে অটুট রাখার প্রতিজ্ঞা নিয়েই যে নিয়ন্ত্রণ করে কাহার পাড়ার নিয়মনীতি, আচার আচরণ। তার কণ্ঠে আমরা যেন ঘোষণা শুনি প্রথম ভারতীয় নিয়তিবাদী মস্করী গোসালের, যিনি বলেছেন—

"প্রয়াস, প্রযত্ন, শ্রম বা কর্মশক্তি বা মানুষের ক্ষমতা বলে কিছুই নেই ; সবকিছু অপরিবর্তনীয় রূপে পূর্ব হতেই স্থিরীকৃত।"

(উবাসগদসাও ১।৯৭।১১৫)

সময়ের হিসেব তার নেই, বিধাতার যদি বয়সের আদ্যন্ত না থাকে, তবে মাটির পৃথিবীতেও সেই নিয়মই প্রচলিত থাকা উচিত বলে তার ধারণা। গোটা কাহার পাড়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যখন সে চুলের উকুন মারতে মারতে বলে "কত বছর হল কে জানে। মাথার চুলের সংখ্যে হয়—তার আর সংখ্যে নাই।" অমোঘ নিয়তির প্রতীকরূপে সুচাঁদ উপন্যাসে রূপায়িত।

উপন্যাসে সুচাঁদ উপকথার কথক। আবার উপন্যাসের নামের মধ্যেও 'উপকথা' শব্দটিব ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং 'উপকথা' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা অপেক্ষিত। কথা যদি কাহিনীর বাচক হয় তবে সংক্ষিপ্ত কথা উপকথা বা কথার সদৃশ উপকথা—এই জাতীয় ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'উপকথা' শব্দটি নিষ্পন্ন হতে পারে। প্রথম অর্থটি এ ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়, কারণ এই উপন্যাসের কাহিনী অংশ বিশাল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের অর্থটি স্পষ্ট নয়। সাধারণত কল্পিত আখ্যান, উপন্যাস গল্প অর্থেই 'উপকথা' শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বঙ্কিমের রচনায় কল্পিত বা অতীতের কাহিনী অর্থে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যথা একটি উপকথা বলি শুন' (বঙ্কিম প্রবন্ধ ২৮) অথবা 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে 'ব্রহ্ম ঠাকুরাণী···বিবাহ প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শুনাইলেন।" ইংরেজি **'Folk Tale'**-এর ভাষান্তর উপকথা হতে পারে, তবে **'folk tale'**-এ ব্যবহৃত পুরাণ কল্প বা **myth**-এর মধ্যে মানবেতর জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সম্ভবত, তথাকথিত 'ভদ্র' মানুষের জীবন অর্থে 'কথা' এবং ভদ্রেতর মানুষের কাহিনী 'উপকথা'—এই অর্থ সঙ্গততর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সমালোচক দীপেন্দু চক্রবর্তী তাঁর 'তারাশঙ্করের সমাজ চেতনা ও তার সাফল্য' প্রবন্ধে[২] উপন্যাসের দু'টি পঙ্‌ক্তি "উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গিয়েছে।" "চন্দনপুরের এই কারখানার মধ্যেই কাহারেরা আবার তৈরী করবে—নতুন এক উপকথা।" উদ্ধৃত করে শব্দটির প্রকৃত অর্থ বা ঔপন্যাসিক-অভীষ্ট তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, প্রথম দৃষ্টান্তটিতে 'উপকথা' শব্দের উপাখ্যান অর্থ নিলে ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যাবার প্রশ্ন অবান্তর কারণ কাহারদের জীবন ইতিহাস বহির্ভূত নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্প সভ্যতা অর্থে 'উপকথা' শব্দটির প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না, কারণ কাহার জীবনে কারখানার অনুপ্রবেশের আগেই, নীলকুঠির সাহেবদের মাধ্যমে পরোক্ষে বৈদেশিক শিল্প সভ্যতার সঙ্গে কাহারদের পরিচয় ঘটেছিল। এই দুটি ব্যাখ্যার কোনটির সঙ্গেই আমরা একমত নই, কারণ প্রথম দৃষ্টান্তটিতে কাহারদের

কুসংস্কারাকীর্ণ বদ্ধ জীবনকে ছোট নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং ইতিহাসের বড় নদী বলতে প্রচলিত ইতিহাস নয়, বরং বিজ্ঞানের আলোকদীপ্ত বৃহত্তর জীবনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মনে হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নীলকররা কাহারদের নব্যসংস্কৃতির মুখোমুখি করলেও তাদের জীবনযাত্রার সর্বতোমুখী পরিবর্তন বা অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণ ঘটাতে পারেনি। পক্ষান্তরে চন্দনপুরের কারখানা-সংস্কৃতি ও বিশ্বযুদ্ধ কাহারদের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

আরো একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আলো—আঁধারিতে ঘেরা এক আশ্চর্য অপ্রাকৃত জগৎ অথবা অদেখা, অচেনা সুদূর অতীতের বিস্ময়কর নানা কাহিনী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর সরাসরি বর্ণনা করেননি, বরং এই জাতীয় কাহিনীর কথকরূপে সুচাঁদ চরিত্রের অবতারণা করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যে অতীত কাহিনীর কথক রূপে সূত, মাগধ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তারাশঙ্কর অতীত বাচনের এই প্রাচীন ভঙ্গীটিকেই কি এখানে নবায়িত করতে চেয়েছেন নিজ প্রয়োজনে ? স্মরণ করা যেতে পারে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চন মূল্য' উপন্যাসেও অশীতিপর বৃদ্ধ স্বরূপের মুখে আমরা তার কৈশোরের কাহিনী বা জীবননীতির ধারাভাষ্য শুনি, কিন্তু সুদূর অতীত বা অপ্রাকৃত লোক সেখানে স্থান পায়নি। তবে উপন্যাসের মধ্যে 'উপকথা' শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার—

"হাঁসুলী বাঁকের উপকথার একটা টুকরো গল্প, গোটা পাঁচালির মধ্যের কয়েকটা ছড়া" অথবা "উপকথায় অনেক কাহিনী আছে"—থেকে মনে হয়, একটি কল্পিত সামগ্রিক কাহিনী যেখানে ধর্ম, সংস্কার, লৌকিক ও অলৌকিক মিলে মিশে একাকার হয়েছে, 'উপকথা' শব্দের এইটি ছিল ঔপন্যাসিক—অভীষ্ট অর্থ। 'উপকথা' শব্দটিকে '**Legend**' শব্দের ভাষান্তর রূপে স্বীকার করলে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়, কারণ "**legend**' শব্দের অভিধানিক অর্থ "**a narrative supposedly based on fact a with on intermixture of traditional materials, told about a person, place or incident.**"

মিথ কেন্দ্রিক উপন্যাস বা **Ethnic** উপন্যাসে যেহেতু একটি সংখ্যালঘু, বিলীয়-মান সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ও তাদের বাসভূমির প্রসঙ্গ থাকে, সেখানে ঔপন্যাসিক প্রায়শই শিক্ষিত, সমশ্রেণীর বর্তমানকে ঐ বিলীয়মান সময়—ব্যক্তি পরম্পরার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে প্রবৃত্ত হন, উদ্দেশ্য ওই মানুষ। জীবনকে যথার্থ স্বরূপে উপস্থিত করা। মেক্সিকান-আমেরিকান জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসে এর ভালো উদাহরণ আছে। **Raymond Barrio**-র **The Plum, Plum Pickers (1972), Rudolfo A.**

Anaya-র Bless Me, Ultima (1972) বা Edmund Villasenor-এর Macho (1973), Thomas Sanchez-এর Rabbit Boss (1973) এবং Richard Vasquez-এর Chicano (1979) উপন্যাস এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। মার্কেজের 'শতবর্ষের নিঃসঙ্গতা'-তেও আমরা দেখব উপকথার নিপুণ চয়ন। তারাশঙ্কর যেহেতু অন্তেবাসী, বিলীয়মান সম্প্রদায়ের জীবনকথাকে বারংবার তুলে ধরতে চান তাই তাঁকে সেই যুগ ও সংস্কৃতির 'মিলিউ'কে ধরার জন্য উপকথার আশ্রয় করতে হয়। এখন এই উপকথাকে শিল্পরীতিব কোন ন্যায়ে ঔপন্যাসিক উপস্থিত করবেন। উপন্যাস পড়তে গিয়ে আমরা দেখি ঔপন্যাসিক কখনও নিজ বর্ণনায় উপকথাকে উপস্থিত করছেন। কখনও চরিত্র ও নিজের মধ্যে উপস্থাপনাকে ভাগাভাগি করে নেন। তবে চরিত্রের মুখে বিশেষতঃ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে উপকথা বলার মধ্য দিয়ে একটু বাড়তি সুবিধা আসে। সংলাপন মিথ-কাহিনীকে করে তোলে জীবন্ত ও গতিময়। এই চরিত্র উচ্চারণে দুই বিশ্বাসের দ্বন্দ্বও তুলে ধরা যায়। লেখক—উচ্চারণে নাটকীয়তা সঞ্চারের সুযোগটাও তুলনায় কিঞ্চিৎ কম। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এ বিষয়ে বিশিষ্ট উদাহরণ, যদিও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এমনকি 'আরোগ্য নিকেতন'-এর কথা এ প্রসঙ্গে আমরা আনতে পারি।

উপকথার কথক সুচাঁদ তারাশঙ্করের এক বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে ঘেরা আলোআঁধারির মধ্যে ডুবে থাকে যে বাঁশবাদি গ্রাম, সেইখানে তার বাস। বয়সে জরতী সুচাঁদ 'আদ্যিকালের বুড়ী', কাহার গোষ্ঠীর আপাত—নিস্তরঙ্গ জীবনে তার স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক পুরনো ব্রতকথার প্রসঙ্গ এনেছেন ঃ গাঁয়ে ছিল এক নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত আর ধর্মকর্ম করে তার দিন কাটত। লোকের সুখে সুখী আর দুঃখে দুঃখী—এইটি ছিল তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। সে আপন মনে বলত কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আশ্বি মিটছে, মহাবনে হাতী মরেছে ; তার গলা ধরে কেঁদে আসি। অর্থাৎ কারণে অকারণে কাঁদা তার স্বভাব। প্রহ্লাদের কথায় সুচাঁদের স্বভাবটি চমৎকার ফুটেছে—"পিসী হল 'অরুণ্য' অর্থাৎ অরণ্যের মত, অরণ্যে যেমন জল পড়লে ঢোঁক হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, অরণ্য যেমন মাতলে ঝড় ওঠে, কাঁদলে বর্ষা নামে, তেমনি পিসী তিলকে করে তাল, উইঢিপিকে করে পাহাড়, কাঁদলে গগণ ফাটিয়ে চেঁচায়, হা-হা করে হেসে ধেই ধেই করে নাচে।" অধিকাংশ সময়ে তার ঊর্ধাঙ্গ প্রায়—অনাবৃত থাকে ; বার্ধক্যের প্রকোপে শ্রবণশক্তিও অনেকটাই ক্ষীণ ; ব্যাঙের মত নিরীহ প্রাণীকেও অসম্ভব ভয় পায় সে। প্রবলভাবে কলহপরায়ণা এই নারী তার অনভিপ্রেত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নির্বিচারে গালিগালাজ ও

অভিশাপ বর্ষণ করে।

অথচ কাহারদের গোষ্ঠীজীবনে এই সুচাঁদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধ সংস্কার এবং দৈবী শক্তির প্রতি বিচারহীন আনুগত্যের বন্ধনে সারা কাহার গোষ্ঠীকে বেঁধে রেখেছে এই বৃদ্ধা। যে কোন উপলক্ষে সে অতীতের কাহিনী বলে, যে কাহিনীর মূল অধিকাংশ সময়ে অপ্রাকৃত শক্তির প্রতি নির্বিচার আস্থার মধ্যে নিহিত, সেই সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে যায় তার নিজস্ব ধ্যানধারণা আর বিশ্বাস। উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে নানা ভৌতিক, আধিভৌতিক কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে সে পরিবেশ সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বাঁশবাদি গাঁয়ের দক্ষিণের বাঁশবন থেকে যে বিস্ময়কর শিসের ডাক আসছে তা কাহার পাড়ার সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু সুচাঁদ যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে বলে "ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়" তখন দেবতার অজ্ঞাত রোষের আশঙ্কায় সারা মজলিস স্তব্ধ হয়ে যায়। ভীতিবিমিশ্র আশঙ্কার সুরে সমবেত সকলের মন ও পরিবেশকে বেঁধে দিয়ে সুচাঁদ হাঁসুলী বাঁকের সৃষ্টি তথা সমৃদ্ধির পিছনে কর্তাবাবার দয়ার কাহিনী বলতে শুরু করে। কোপাইয়ের প্রলয়ঙ্কর বাণে নীলকর সাহেব, দেশী জমিদার সবাই যখন বিপন্ন তখন 'বাবার থান' থেকে কর্তাবাবার আবির্ভাব। সুচাঁদের ভাষায় "এই ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ্, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরণে লাল কাপড় পায়ে খড়ম···।" কর্তার নিষেধ না শুনে সাহেব তলিয়ে গেল কোপাইয়ের দহে আর কর্তার আশীর্বাদে চৌধুরীদের সমৃদ্ধির সূচনা। সেই কর্তার প্রতি অশ্রদ্ধা "কর্তার থানে থুঁতো, কুকুরে ধরা এঁটো পাঁঠার পুজো" কাহারদের জীবনে সর্বনাশের অশনিসংকেত—সুচাঁদের মুখে এই নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সারা কাহারপাড়া অনির্ণেয় আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পৌরাণিক ঘটনার প্রভাব যে সাম্প্রতিকালেও অব্যাহত বা নিরবচ্ছিন্ন—এই অন্ধ বিশ্বাস কাহার-মানসের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুস্যূত করে দেওয়ার পিছনে মূল ভূমিকা এই বৃদ্ধার। এই ভয়ঙ্করীকে সবাই ভয় পায়, আশু বিপদের প্রতিবিধান চায়, সমাজপতি বনওয়ারীও তার কথা সাধারণভাবে মান্য করে এবং কিছুটা ভয়ও করে (বনওয়ারী করালীর প্রথম সংঘর্ষের সময় পাখী সুচাঁদকে ডাকতে যায় কারণ এ সময়ে এক সুচাঁদ পারে বনওয়ারীর সামনে দাঁড়াতে)। একমাত্র তার কাছে মাথা নোয়ায় না নব্য যুবক চন্দনপুরের কারখানায় কর্মরত করালী যে সুচাঁদের কল্প কাহিনীকে অক্লেশে উপহাস করে তার কঠোর তিরস্কারে জর্জরিত হয়। কর্তাবাবার পুজোর চাঁদা আদায় করে সুচাঁদ, তারই নির্বন্ধে পুজোর ভোগে আরো একটি পাঁঠা যুক্ত হয়। কাহারদের প্রাত্যহিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নিয়ন্ত্রীর ভূমিকা

পালন করে। যে অদৃশ্য ও অনির্ণেয় দৈবলীলা অন্তরীক্ষ থেকে কাহারদের জীবন নিয়মিত করে চলেছে, সুচাঁদ যেন তারই প্রতীক।

অন্ধ বিশ্বাস আর অলৌকিক মহিমার প্রতি আনুগত্যের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য কাহারেরা করালীর নেতৃত্বে যে মুহূর্তে মাথা তোলে, সেই মুহূর্তে মূর্তিমতী নিষেধের মত এসে দাঁড়ায় সুচাঁদ। দৈবশক্তির অনুভব ও ব্যাখ্যা যেন জন্মান্তরীণ সংস্কারের মতই তার সঙ্গী। বাঁশবনে শিসের উৎস বিশাল সাপটিকে করালী যখন পুড়িয়ে মারে, তখন সারা কাহার পাড়া উল্লসিত, কোথাও কোন শঙ্কার ছায়ামাত্র নেই, ঠিক সেই সময়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে সুচাঁদ তাদের মনে নতুন করে আশঙ্কার বীজ অনুপ্রবিষ্ট করে। ঘটনাগত বাস্তবকে মানতে চায় না সে, অন্ধ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বলে যায় "ও যে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে! ওর মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে 'ভোমন' করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে।" অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগের দাবী সত্ত্বেও তার অনুশাসনের অমোঘতা যারা অস্বীকার করে তাদের দমিত করার প্রয়োজনে সে বিনা দ্বিধায় বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে। পুরোনো যত কলঙ্ক, অতীতের যত ক্লেদাক্ত ইতিবৃত্ত—সবেরই কথক এই সুচাঁদ। তাই অবাধ্য পাখীকে শাসনের প্রয়োজনে সে পাখীর মা বসনের (সুচাঁদের নিজের মেয়ে) অনাচারের কাহিনী থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পাখীর যত কলঙ্ক-তারস্বরে প্রচার করে। তবে আনন্দের আসরে যথা কত্তাবাবার পুজা-পরবর্তী নাচ গানের উল্লাসে অথবা পাখির বিয়ের আসরে সুচাঁদ সক্রিয় অংশ নিয়েছে, প্রচুর মদ্যপান করেছে, "সুচাঁদ নাচছে কখনও গান গাইছে কখনও কখনও, বলছে সেকালের রোমাঞ্চকর গল্প।" অতীতের বন্যার পটভূমিতে প্রণয়ের সরস গল্প বলতে বলতেও সুচাঁদ অন্তিম ভাগে দেবতার অলৌকিক মহিমা সংযুক্ত করে দিয়েছে। প্রবল বন্যায় বিপন্ন কাহারপাড়ার মানুষেরা প্রাণ বাঁচাতে গাছের উপরে আশ্রয় নিয়েছে, চারদিকে তীব্র জলস্রোত। এই বিপদের মধ্যেও কাহারদের মনে রঙের খেলা, "সেই সময়ে কিনা ওই নিমতেলে পানুর ঠাকুরদাদার বাবার তৃতীয় পক্ষের পরিবার রং লাগালে আটপৌরেদের পরমের কত্তাবাবার সঙ্গে। ...চোখে চোখে কি খেল হ'ল, কখন হ'ল দুজনার কে জানে।" বন্যার প্রকোপ যখন কমল, তখন চারদিকে মৃত্যু আর ধ্বংসের হাহাকার, অতীতে বন্যার সময় সাহেব মনিবেরা খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে কাহারদের সাহায্য করত। কিন্তু এবার তারাও সমূলে উৎসাদিত। ফলে "সায়েবরা গেল, কাহারদেরও কপাল ভাঙল।" জমির মালিক চৌধুরীরা কাহারদের উপর নারাজ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মহানবমীর সন্ধ্যায় তিনি 'ভিটে' ফিরিয়ে দিলেন কাহারদের, তবে সেখানেও দৈবী শক্তির মহিমা

দেখেছে সুচাঁদ। "সেও তোমার ওই কত্তামশায়ের দয়া। চৌধুরীকে তিনি স্বপন দিয়ে দিয়েছিলেন অষ্টমির 'আতে', মানুষকে ভিটে ছাড়া করতে নেই, কাহারদিগে তুলে দিলে আমার 'ওষ' হ'বে তোর উপর। তাতেই নউমির দিন সকালে উঠে চৌধুরী ভিটে ছেড়ে দিলে।" অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানে দেবতার রোষ ও প্রসাদের প্রতিটি দৃষ্টান্ত সুচাঁদের স্মৃতিতে ও বাস্তবে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় সযত্নে রক্ষিত। দেবতার রোষসম্পাতের সামান্যতম সম্ভাবনাতেই সে সন্ত্রাসে চিৎকার করে, সতর্ক করে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে, আবার দেবতার প্রসাদলব্ধ সমৃদ্ধির সুখপ্রদ বর্ণনাতেও সে অক্লান্ত। সুচাঁদের কথায় যেন শোনা যায় মৎস্য পুরানের প্রতিধ্বনি, যেখানে কাল বা নিয়তিকে যাবতীয় দুঃখের কারণ রূপে নির্দেশ করা হয়েছে—"সব দুর্যোগ ও আপাতিক বিপদকে নিয়ন্ত্রণ করেন কাল; কাল প্রতিকূল ও ক্রুদ্ধ হলে কেমন করে এসব এড়ানো যাবে?" (২১০।৫-৭)। সুচাঁদ তাই উপকথার কথকমাত্র নয়, কাহারদের অবশ্যম্ভাবী নিয়তির পূর্বাভাস।

যে দেবতার রোষ অথবা প্রসাদের সঙ্কেত উপলব্ধির বিশেষ শক্তি তার করায়ত্ত বলে সুচাঁদ দাবী করে, সেই দেবতার দোহাই দিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনেয় বেদনা, বঞ্চনার বিরুদ্ধেও সে প্রত্যাঘাত করে শাণিত ও মর্মান্তিক অভিশাপতীক্ষ্ন তিরস্কারে। শুধু 'কত্তাবাবার বাহন' সাপটিকে মারার অপরাধেই করালী তার বিরাগাভাজন নয়, বরং সে যে ব্যাঙ্ দিয়েছে তার গায়ে—এই অপরাধের জন্যই তার মাথায় বাবার অভিশাপ নেমে আসা উচিত—অর্থাৎ এখানে সাধারণের ক্ষতিকারক করালী আর সুচাদের শান্তিনাশক করালীর মধ্যে কোন ভেদ নেই—দুটি অপরাধই সমান দণ্ডনীয় —"যে হাতে তুমি আমাকে ব্যাঙ্ দিয়েছ, যে হাতে তুমি বাঁশবনে আগুন লাগিয়ে মা-মনসার বিটীকে পুড়িয়ে মেরেছ, সেই হাতদুটি তোমার পড়ে যাবে। কাঠের মত শুকিয়ে যাবে।"

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বেও আমরা দেখছি সুচাঁদের উপস্থিতি, তার কান্না, তিরস্কার পরিবেশ পরিবর্তিত বা নিয়ন্ত্রিত করছে। যে করালী তার চক্ষুশূল তার বিয়েতেই সুচাঁদ আনন্দে মেতেছে, আকণ্ঠ মদ খেয়ে অসম্বৃত বসনে নাচছে, অথচ তার অব্যবহিত পরেই সেই আনন্দের আসরে সে করালীর সাপ মারার বৃত্তান্ত স্মরণ করে সকলের মতিচ্ছন্নতার দোষ দিয়ে 'বাহন মারার পিতিবিধেন' চেয়ে তারস্বরে কাঁদছে। মুহূর্তে সমবেত আনন্দ কলরোল স্তব্ধ হয়ে গেছে—"বাবার বাহন! সেই চন্দ্রবোড়া সাপটি! বসন থরথর করে কেঁপে উঠল। পাখী চমকে উঠল।" বেপথু বনওয়ারী আকুল প্রার্থনা জানায় বাবার কাছে, "হে বাবা! হে কত্তাঠাকুর! হে কাহারদের মা-

বাপ। মাজ্জর্না কর বাবা মাজ্জর্না কর। অবোধ মুখ্যু করালীকে মাজ্জর্না কর। বনওয়ারীকে মাজ্জর্না কর। পুজো দোব বাবা, আবার পুজো দোব।" অর্থাৎ আনন্দে অথবা নিরানন্দে যেখানেই অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাথা তুলেছে, অথবা দেবতার অলৌকিক মহিমার কাছে বিনম্র নতিস্বীকারের ব্যতিক্রম ঘটেছে, সুচাঁদ সেখানেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সমাজ রক্ষার স্বয়ংস্বীকৃত দায়। অদৃশ্য শক্তির দুর্বোধ্য অভিপ্রায় ব্যাখ্যার দায়িত্ব একমাত্র তার উপরই যেন ন্যস্ত।

হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাদির কাহারপাড়ায় শিল্পায়ন তথা যন্ত্রসভ্যতার ঢেউ এসে লেগেছে। চন্দনপুরের কারখানায় করালী কাজ করতে গেছে, প্রচুর উপার্জন করেছে। শহুরে ঢঙের জীবনযাত্রা সে গ্রামেও প্রবর্তন করতে চায়। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের প্রকোপে জিনিসের দাম চড়ছে, জমির মালিক ধান দিতে নারাজ, কাহার পাড়ায় অনটন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নব্যযুবকেরা কারখানায় যেতে চায়। অথচ সুচাঁদ আর বনওয়ারী নতুনের পদসঞ্চারকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর। ক্ষয়িষ্ণু, যুগজীর্ণ মূল্যবোধের প্রতীক সুচাঁদ শুধু অতীতচারিতা দিয়ে পরিবর্তনের প্লাবনকে রুখতে চায়। নীলকর সাহেবদের মহিমা কীর্তন করে সে কেঁদে ভাসায় "সায়েব লোক, রাঙা রাঙা মুখ, কটা কটা চোখ, গিরিমাটির মত চুল, পায়ে অ্যাই বুট জুতো —খটখট করে বেড়াত, পিঠে প্যাটে জুতো শুদ্ধ লাথি বসিয়ে দিত···।" যে যুগ অতীত, যে ক্ষমতা অস্তমিত তার জন্য বিলাপ করে সে, কারণ "সুচাঁদ সেই উপকথার শেষের যুগের মানুষ যে।" আবার অন্যের ক্ষেত্রে নানা নিয়মনীতির বিধান দিলেও তার নিজের নীতিজ্ঞানের মান আদৌ উঁচু নয়, পাখীকে অনৈতিক জীবনযাপনে প্ররোচনা দিতে তার দ্বিধা নেই। "···নামের মরদ নামে থাকুক, পাখির এখন উঠতি বয়স, কিছু ওজগার টোজগার করে লে।" অথচ বনওয়ারীর সামান্যতম চারিত্রিক স্খলন—নয়ানের মার সঙ্গে তার একদা ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে সে বনওয়ারীকে আক্রমণ করে, কিন্তু মাতব্বর বনওয়ারীর রাগ দেখে সে রণে ভঙ্গ দেয়।

উপন্যাসের তৃতীয় পর্বের শুরুতে সুচাঁদকে একটু অন্য ভূমিকায় দেখি আমরা। সে অন্নচিন্তায় ব্যাকুল, 'কন্যের ভাত' খাবে না সে, আবার বনওয়ারী তাকে এক দিনের বেশী কাজ করতে দেয় নি। কাহারদের মরা কুকুর বিড়াল ফেলা বা নর্দমা পরিস্কারের মধ্যে সে কোন অন্যায় দেখতে পায় না কারণ "এসব তো পিতিপুরুষে করত।" যুগের পরিবর্তনে মানুষের রুচি, মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটেছে, এইটি বুঝতে সে অক্ষম। আবার করালীর সঙ্গে এত মতানৈক্য সত্ত্বেও সে করালীর বিয়েতে "বোতল বোতল পাকী মদ" পায়নি বলে আক্ষেপ করেছে, করালীর অনুনয়ে তার বাড়ী চলে গেছে।

ঝড়ে করালীর ঘরের চাল পড়ে যাওয়ায় সে তারস্বরে কেঁদেছে, করালীর কাছে অন্নের সংস্থান হয় বলে সে করালীর সৌভাগ্য খুশী হয়েছে। অথচ কাহারগোষ্ঠীতে এতাবৎ অপ্রচলিত কোঠাবাড়ী তৈরীর কাজে যেই করালী হাত দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সুচাঁদ প্রতিবাদ করেছে, কারণ "যা পিতিপুরুষে করে না, তা করতে নাই। সয় না। সহ্য হয় না। মানুষ মরে যায়।" অ সলে সংস্কার আর দৈব বিশ্বাসে যখন আঘাত লেগেছে, তখনি সুচাঁদ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে, যদিও আদিম জনগোষ্ঠীর সহজাত এক ধরনের বন্য সাবল্য তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ পর্বে করালীর কোঠাবাড়ী তৈরীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পরিণতিতে সুচাঁদ করালীর বাড়ী থেকে বিতাড়িত, তবে অভিসম্পাতের পরিবর্তে করালী-পাখীর সুমতি ফিরিয়ে দেবার জন্য সে ঠাকুরের কাছে আহ্বান জানিয়েছে—"মতি ফিরিয়ে দাও, সুমতি দাও।" একালের মানুষের ধর্মের প্রতি অনাস্থায় সে মর্মাহত "মানুষের সে বেক্কম নাই-ভক্তি নাই—বাবাও নিজের মহিমা গুটিয়ে নিয়েছেন।" অথচ ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষতে সুচাঁদের অটল বিশ্বাস তাকে অসংখ্য গল্পের প্রেরণা জোগায়; নয়ানের এক পূর্বপুরুষ অপঘাতে মরে ভূত হয়ে কি অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটাত, তার রোমহর্ষক বিবরণ কাহারদের মুগ্ধ করে রাখে। মানুষ মরে ভূত হয়, অন্যের ঘাড় মটকায়—এ বিষয়ে সুচাঁদের সন্দেহ নেই, মৃতা কালোশশীর আত্মা যে বনওয়ারী আর তার স্ত্রীর ঘাড় মটকাবে তা সে তারস্বরে চেঁচিয়ে, লাফিয়ে, নেচে ঘোষণা করেছে। তবে সময়ের পরিবর্তনে ভূত প্রেতের মাহাত্ম্যও যেন ক্রম-ক্ষীয়মান। সুচাঁদ নিজেই আক্ষেপ করে বলে "তাঁদের কি গরজ? কেন তাঁরা এই সব ঝামেলায় থাকবেন?" ফলে অনেক দূরে হাঁসুলীর মাঠে সরে গেছেন তাঁরা। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সংস্কারের লোপ ঘটছে—সুচাঁদের কথায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি।

তবু যুগসঞ্চিত সংস্কারের নাগপাশ থেকে সহজে মুক্তি আসে না। সাপের কামড়ে মানুষ মরার ঘটনা হাঁসুলী বাঁকে আদৌ বিরল নয়, তবু চন্দ্রবোড়া সাপের দংশনে পানুর ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় সুচাঁদ আবার সেই ভয়ঙ্কর দৈবী রোষের প্রসঙ্গ তুলে কাহারদের ভয়ে স্তব্ধ করে রাখে। ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরোহিত সম্প্রদায় যেমন দেবতা ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সেতু ছিল, দেবতার বার্তা যেমন এদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পেঁছিত, তেমনি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় সুচাঁদ সেই মহাশক্তিসম্পন্ন অমোঘ দৈব কথকরূপে অবতীর্ণ বলা যায়। সে অবিরত গল্প বলে, বাবার মহিমার গল্প, বাবার আদেশ অমান্যের পরিণতিতে সর্বনাশের গল্প। বাবার আদেশে কাহাররা জাতব্যবসা চুরি

ছেড়ে চাষ ধরেছে। অথচ আটপৌরেরা বাবার আদেশ অগ্রাহ্য করে ডাকাতি করতে লাগল—"দহের ধারে শিমুলগাছের পাশে তালগাছের মাথায় বাজ ফেলে বাবা সাবধান করে দিলেন, তবু মানলে না, না মেনে যেই যাওয়া অমুনি পিতিফল হাতে হাতে। তিনজন আটপৌরে ধরা পড়ে গেল।" ভূস্বামী চৌধুরীদের বাবা সাবধান করেছিলেন—"চৌধুরীরা শোনে নাই -ছ মাসের মধ্যে নীলাম হয়ে গেল সব।" সুচাঁদ মনে করে, দেবতা থেকে প্রেত—সকলেরই ক্ষমতা আছে মানুষের ইষ্ট অথবা অনিষ্ট করার, অতএব তাদের বিধান মেনে চলাই শ্রেয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। সুচাঁদের গল্প যতই আজগুবি বা অবিশ্বাস্য হোক, তার প্রভাব কিন্তু কাহার পাড়ার প্রতিটি মানুষের উপর প্রসারিত। এমন কি বনওয়ারীর মত বিচক্ষণ লোকও সুচাঁদের রূপকথার গল্পকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। সুচাঁদ বলে—গল্পে আছে, রাজকন্যের নাক থেকে সুতোর মত সাপ বেরিয়ে অজগর হত, তারপর স্বামীকে কামড়াত। বনওয়ারী অবিশ্বাসিনী, নিদ্রিতা স্ত্রী সুবাসীর নাকের কাছে হাত দিয়ে সাপের অস্তিত্ব বুঝতে চেষ্টা করে। সুচাঁদের প্রভাব কাহারজীবনে সর্বতোব্যাপ্ত।

তবে সংস্কারে বিশ্বাস যে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু, সময়ের পরিবর্তনে মূল্যবোধ তথা জীবন বোধের পরিবর্তন যে কাহার পাড়ার আপাত-শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে নতুন তরঙ্গোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করছে—সুচাঁদ তা অবচেতনে অনুভব করে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। তার মৃত্যুর সঙ্গেই যে যাবতীয় সংস্কারের শেষ, এই সত্য উপলব্ধি করে সে কাঁদে "আঃ, আমি মরলে আর কাহারপাড়ার এ নিয়ম কেউ মানবে না। কালে কালে 'দ্যাশঘাট' বদলে গেল, তার সঙ্গে গেল মানুষও অনাচারী, অধর্মপরায়ণ হয়ে।" তারপরই সুর করে বিলাপ করে—"হায় হায় রে!"

উপন্যাসের শেষপর্বে আমরা দেখি, পৃথিবীর বৃহত্তর জীবনস্রোতের তীব্র আকর্ষণে বাঁশবাদির বন্ধ কাহার জীবনের নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে এসেছে প্লাবন। ঐতিহ্য ও দৈবভীতি—চালিত কাহার জীবনে শিল্পায়ন এনেছে ভাঙন, যুদ্ধ আর তার সাথী অনটন জীবিকান্বেষণে এনেছে অবশ্যম্ভাবী শিল্পমুখিনতা আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক অবলুপ্তি। 'উপকথার দিন' অর্থাৎ কাল্পনিক ভয় আর সংস্কারে আবৃত দিনের অবসান ঘটছে। ফলে উপকথার যুগের প্রতীক সুচাঁদ তার স্বভাববৈশিষ্ট্য—অতীতমুখিনতা ও শৈল্পিক নবায়নের প্রতি বিদ্বেষ সত্ত্বেও চন্দনপুরের আধুনিক হাসপাতালে তার ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করাতে বাধ্য হয়েছে, কত্তাবাবার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে বসে থাকেনি। চন্দনপুরের ভদ্রলোকদের

বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে বলে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—যা কামনায় রাঙা, সংস্কারে অন্ধ আর দৈবশক্তির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যে অবিচল। এই কাহিনী তার 'হিয়ের জিনিষ', এর অবহেলায় সে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। তবে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে গভীর বেদনায় সে বলে ওঠে "আমার সাথে সাথেই এ উপকথার শেষ।···হাঁসুলী বাঁকও শেষ, আমিও শেষ, কথাও শেষ।" করালী নতুন করে কাহার পাড়ায় ঘর তুলবে জেনে সে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, "আবার নতুন বাঁশের বেড়া উঠবে।"

অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতে, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' একটি লৌকিক সমাজের আমূল বিস্তার ও বিপর্যয়ের বৃহৎ ছবি।[৩] এর এক মেরুতে রয়েছে করালী, যে নব্যজীবনতন্ত্র ও শিল্পায়নের প্রতিভূ, অন্য মেরুতে রয়েছে মাতব্বর বনওয়ারী, যে তার ঐতিহ্যলালিত নীতিবোধ ও সংস্কারান্ধতা নিয়ে কাহার সমাজকে আধুনিকতার প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। এই দুই চরিত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে রয়েছে সুচাঁদ—যে অজস্র কল্পিত কাহিনীর মধ্য দিয়ে অতীতের ছাঁচে বর্তমানকে বিন্যস্ত করতে চেয়েছে, দৈবী শক্তির অপ্রতিহত মাহাত্ম্য ঘোষণা করে প্রাত্যহিক জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও দেবতার অনুগ্রহ বা রোষের পরিণতিরূপে ব্যাখ্যা করেছে। সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে সমস্ত রকম নবায়নের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও শেষ পর্যন্ত তার পরাভব ঘটেছে। উপকথার কথক সুচাঁদ যন্ত্রদানবের রথের ঘর্ঘর মন্ত্র থেকে হাঁসুলী বাঁকের জীবনকে রক্ষা করতে পারে নি। যুদ্ধের নির্মম প্রয়োজনে সুচাঁদের পরম শ্রদ্ধার কালারুদ্র ও কর্তাবাবার দেবস্থান মারণাস্ত্রের গুদামে পরিণত হয়েছে, দৈবতাড়িত কাহারজীবন ও তার প্রতিভূ সুচাঁদ-বনওয়ারী সমূলে উৎসাদিত হয়ে গেছে। তবে নির্জিত হলেও সুচাঁদ সম্পূর্ণ গৌরব হারায় নি, বিলীয়মান অতীতের জন্য যে গোপন দীর্ঘশ্বাস তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তার স্পর্শে মূলহারা অমানিতা সুচাঁদ পাঠকের কিছুটা সহানুভূতি আদায় করে নেয়। যে মূল্যবোধে সে বিশ্বাস করে, তাকে অনাহত বা অটুট রাখার জন্য তার প্রবল সংগ্রাম সাধুবাদ দাবী করতে পারে অবশ্যই।

উদ্ধৃতিসূত্র ঃ

১। কালি ও কলম ; অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

২। দীপেন্দু চক্রবর্তী, "তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও তার সাফল্য", উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত 'তারাশঙ্কর, দেশ-কাল সাহিত্য', কলিকাতা ; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১৩৮৪ ; পৃঃ১২

৩। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার "তারাশঙ্কর দেশ-কাল", প্রাগুক্ত ; পৃ ২৮৬

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কাহার রমণীরা

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি রচনার সময় নিশ্চয় তারাশঙ্কর আগে থাকতেই কতকগুলো চরিত্রের কথা ভেবেছিলেন। কারণ তারাশঙ্করের স্বীকারোক্তিতেই আমরা জানতে পারি যে, অন্যান্য উপন্যাসের মত তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। উপন্যাসের পটভূমিকে ব্যবহারে, চরিত্র নির্মাণে তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতা যে কাজ করেছে বেশি, তা বোঝা যায়। সে কথা তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থের ১ম পর্ব থেকেও জানা যায়। "হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি।" [পৃঃ ২৮] আবার একজায়গায় লিখেছেন, "পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে, নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে—হেই মাগো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে? ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে?......" (পৃঃ ২৮) আর এক জায়গায় লিখেছেন (কবি উপন্যাসের বসন চরিত্রও হতে পারে) "বসনের সঙ্গে দেখা হত, আজও বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে দেখা হয়, তারা পথেই ঘটি নামিয়ে প্রণাম করে, প্রশ্ন করে—কবে এলেন?" এদের সম্বন্ধেই তারাশঙ্কর মন্তব্য করেছেন—"এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে।......আমি ওদের জানি—ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয়, ভালবাসার জন।.... ." (পৃঃ ২৯)

উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ধরবার জন্য যে পটভূমিকে তিনি ব্যবহার করেছেন তা কাল্পনিক নয়—"হাঁসুলী বাঁকের উপকথার অঞ্চল একটি আছে, নদীর বাঁক সেখানে হাঁসুলীর মতই বটে। তাতে বাঁশবেড়েরও অস্তিত্ব ছিল। একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠিও আছে, পতিত রুক্ষ-প্রান্তর এবং বেনো জলাভূমিরও সমাবেশ সেখানে আজও রয়েছে।......হাঁসুলী বাঁকে কাহাররা আছে, তাদের জীবনযাত্রায় বা সামাজিক বাস্তবতায় আমি অতিরঞ্জন করিনি।...কাহার বলে কোন নির্দিষ্ট জাতি বাংলাদেশে নাই। হরিজন যাদের বলে থাকি আমরা এদের মধ্যে যারা পাল্কী বয়ে থাকে তারাই বাংলাদেশে কাহার। ধরা যাক বাগ্দী সম্প্রদায়। বাগ্দীদের মধ্যে যারা পাল্কী বয়

তারা বাগ্দী কাহার। যারা বয় না তারা শুধুই বাগ্দী।[১] আর অলৌকিক ও অপ্রাকৃত সংস্কার ও সংস্কার বিরোধিতাকে নিয়েই হাঁসুলী বাঁক। কোপাই নদী ও নদীতীরবর্তী বাসিন্দা কাহার সম্প্রদায় তাই চরিত্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এই উপন্যাসে। জোর করে তারা উপন্যাসে ঢুকে পড়েনি।

হাঁসুলী বাঁকের নারী চরিত্রগুলির আলোচনায় আসতে গেলে কোপাই নদীর রূপটিকেও একটু তুলে ধরা দরকার, এই নদী সম্বন্ধে তারাশঙ্কর বলেছেন "আষাঢ় থেকেই মা মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে, যৌবনে ভরে যায় তার শরীর, তারপর হঠাৎ যেমন এক একএকদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়াপড়শিকে শাপ-শাপান্ত করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট-পাটকেল-পাথর, দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলে, কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ঐ ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী।" তাই কাহিনীর পরিকল্পনায় হাঁসুলী বাঁকের (বাঁশবেড়ে / বাঁশবাঁদী) একদিকে গভীর বাঁশবন আর একদিকে মুক্ত প্রান্তর বাকি দুদিক ঘিরে কোপাই নদী। পাহাড়ী কোপাই ঠিক এইখানটায় এসে হঠাৎ সামান্য বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকের তিন পুরুষের উপকথা, উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। তিনপুরুষের উপকথায় হাজির হয়েছে হাঁসুলী বাঁকের কাহার পল্লীর "মাটি, মানুষ তাদের অপভ্রংশ ভাষা, প্রাণের ভ্রমরা-ভ্রমরী কালো রং ও গুঞ্জন।"[২]

তারাশঙ্কর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্র শেষ হয়নি, কিন্তু যাই যাই করছিল। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে তখন তেমন ভাবে শুরু হয়নি। কিন্তু সমাজে অস্থিরতা ক্রমসঞ্চরমান ছিল। সমাজে দুটো শ্রেণীর বিকাশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে চাইছিল। দুধরনের জীবনযাত্রা প্রতীয়মান হচ্ছিল, উচ্চ-বর্ণের আভিজাত্য গর্বে গর্বিত যাকে বলা যেতে পারে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি, আর একদিকে অবক্ষীয়মান শোষিত শ্রেণী। অভিজাত সম্প্রদারের জীবন ধারণের প্যাটার্ন মোটামুটি এক ধরনের কিন্তু শোষিত বা ব্রাত্য শ্রেণীর মধ্যে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত বিভাজনে জীবন প্রতিপালনের প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র। তারাশঙ্কর নিজে পতনোন্মুখ সামন্তশ্রেণীর মানুষ হয়েও রাঢ়ের গ্রামীণ সামাজিক মানসিকতায় পুষ্ট, গ্রামীণ সমাজ পরিবেশেরই মানুষ। রাঢ় বঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলগুলি প্রধানত আদিবাসী প্রধান, তাই সেখানে ছিল আদিম সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। এই বিচিত্র সংস্কৃতির ধারক বাহকেরা ছিল রাঢ় অঞ্চলের বাউরী, ডোম, বেদে, কাহার সম্প্রদায়ের জনমানুষ। তারাশঙ্কর এই

পরিবেশে জীবনযাপন করে, এই নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-আচার-অনুষ্ঠান এবং পুরুষ ও নারীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে জেনেছেন। ফলে এদের প্রেম ও প্রকৃতির প্রশ্নে প্রাথমিক নীতিহীন যুক্তি বিমুখ দেহসর্বস্ব প্রবল হৃদয়াবেগ—এককথায় প্রাকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষাকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। সামন্ত ব্যবস্থার প্রতিনিধি হওয়ায় তিনি তাঁর সমাজের সম্ভোগ প্রবৃত্তির, মোহমাৎসর্যের বিষয়গুলিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এইসব দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা বুঝতে পারি নরনারীর জীবনধর্মে প্রেমের দৈহিক সম্পর্কটাই বিশেষভাবে তাঁর কাছে বাস্তব বলে মনে হয়েছিল। তাই (তারাশঙ্করের সাহিত্যে নর-নারীর জীবনধর্ম প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনধর্মের রূপ নিয়েছে। তারাশঙ্কর মনে করতেন সৌন্দর্যবোধ নয়, নীতির অনুশাসন নয়, ব্যবহারিক জীবনটাই জীবনের ছন্দ, জীবনের প্রত্যক্ষতা জীবনের রসতীর্থে বিচিত্র রসলীলায় তাঁব উপলব্ধি—ভালোমন্দের ঊর্ধ্বে, সংস্কার-কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে, মানুষ মহৎ হলেও প্রবৃত্তি তার জীবন প্রতিপালনের বিশেষ ধর্ম, একে উপেক্ষা করে জীবনের গতি-প্রবাহিত হয়না, কারণ প্রবৃত্তির কাছে মানুষের সমস্ত প্রেয়বোধ বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। এই লাইফ ফোর্সকে তিনি সত্য বলে জানতেন তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে। সুতরাং যুক্তিতর্ক, নীতি, স্নেহ, প্রেম, মমতা, সামাজিক ও অপ্রাকৃত সংস্কার কোন কিছুই অপরিহার্য নয় তার প্রেমধর্মে। তারাশঙ্করের প্রেমধর্মের মূল সত্য হল আদিম প্রবৃত্তির তাড়না।) এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের প্রেমচিন্তাকে বুদ্ধদেব বসুর ব্যাখ্যায় আমরা দেখি, "Another respect I find Tarasankar lacking in is what our Sanskrit aestheticians called the adirasa or the primary feeling (though 'feeling' is not quite the word, rasa being untranslatable) : I mean the mutual attraction of the two sexes, capable of infinite poems, but invariable in substance, the Subject the totally or partly of so large, overwhelmingly large a body of the world's literature." (প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্করের উপন্যাসে অভিজাত অনভিজাত পুরুষ ও নারীচরিত্রের প্রেম-প্রবৃত্তির সম্পর্ক নির্ণয়ে "mutual attraction of the two sexes" অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে! ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন নয় বরং বাৎস্যায়ন আদর্শায়িত হিউম্যান ন্যাচার্যালিজমকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন নরনারীর জৈবিক জীবনের কামনা-বাসনার চিত্রায়নে।

হাঁসুলী বাঁকের উপন্যাসে জাঙাল গ্রামের অন্তর্গত ঐ বাঁশবাদী গ্রাম, তার মধ্যে

দ্ুটি পাড়া বেহারা পাড়া ও আটপৌরে পাড়া যেখানে কাহার সম্প্রদায়ের বাস। দ্ুয়ে মিলে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর বসতি। এই দ্ু'পাড়ার মান্ুষজন এবং জাঙাল গ্রামের জনাকয়েক কুমার, সদগোপ, চাষী সদগোপ, গন্ধবনিকের দল ছাড়াও নাপিত-ফুলের দ্ু-একঘর ; তন্তুবায় সম্প্রদায়ের এক আধজনকে নিয়ে উপন্যাসের চরিত্র পরিকল্পনা। কিন্তু এ উপন্যাসের বিশেষত্ব হল, "ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয় নাই, ব্যক্তি এখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেও গৌণ ; সমাজের পারিপার্শ্বিক চাপ প্রত্যেকের উপর গভীর রেখায় মুদ্রিত। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হিন্দুধর্মের নিম্নবর্গীয় সমাজ…ইহার মানুষ অধিবাসীগ্ুলি উহাদের ব্যক্তিগত প্রীতি-দ্বেষ-ঈর্ষা-লালসা-কামনার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে আকাশ বাতাসকে ক্ষ্ুব্ধ করিলেও আসলে এক মহত্তর শক্তির হাতে ক্রীড়নক। উহার বনওয়ারী-স্ুচাঁদ-পাখী-নস্ুবালা-কালোবৌ-পরম প্রভৃতি আপন আপন জীবন কক্ষাবর্তনের পথে চলিতে চলিতে পরস্পরের মধ্যে নানা দ্ুশ্ছেদ্য জটিলতা-জাল সৃষ্টি করিলেও এক দ্ুর্নিরীক্ষ্য, অথচ তাহাদের নিকট অতি প্রত্যক্ষ, স্ুস্পষ্ট দৈব রহস্যের অঙ্গ্ুলি-সংকেতে পরিচালিত অক্ষগ্ুটিকা মাত্র।"[8] তাই দেখা যায় এই উপন্যাসের সবকটি চরিত্রের ভাগ্য 'দৈবশক্তি অধ্যুষিত' হাঁস্ুলী বাঁকের 'গগন-বিহারী কালারুদ্দ' ও 'বিল্ববৃক্ষ সঞ্চারী' কত্তাবাবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সব চরিত্রই নিমিত্তমাত্র এখানে। দৈব শক্তিই অমোঘ, কাহার পল্লী-নামক এক বিশ্বের অলঙ্ঘনীয় বিধান। সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ম্ূল্যায়নকে অবশ্য অনেক সমালোচক মানতে চাননি। ডঃ কার্তিক লাহিড়ী মনে করেন এই কারণে, "তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে চরিত্রগ্ুলি অতিশয়িত এবং কাহিনী নাটকীয়তায় ভরা।" তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ "তারাশঙ্কর আঞ্চলিকতার বাহ্যর্ূপটিকে দার্ুণ নিখ্ুঁতভাবে ধরতে পেরেছেন। সেজন্য সময় সময় মনে হয় আঞ্চলিকতার মর্মটি বোধ হয় বিদ্ধ করেছেন অবলীলায়, কারণ ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য তাঁর কাহিনী চরিত্রে এত ওতোপ্রোত জড়ানো যে তখন চরিত্র-কাহিনীর আতিশয্য, চরমতা খ্ুব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, যেন এই পরিবেশেই একমাত্র এমন আখ্যান-চরিত্র অনিবার্যভাবে সম্ভব। একদিকে উত্তপ্ত র্ুক্ষতা, হাহা করা প্রান্তর অন্যদিকে বন্যা, কিন্তু পলিমাটি আর এদের অন্ুসরণ করেই এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে নিষ্ঠ্ুর, উন্মাদ মমতাহীন বা স্নেহ লালসার উগ্রম্ূর্তি। এসব চিত্র, চরিত্র তার উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু এসবই মান্ুষকে পরিবেশের অধীন বা প্ুতুল ভাবার স্ুন্দর উদাহরণ।……" এই প্রসঙ্গেই সমালোচক তাই সিদ্ধান্ত টানেন মান্ুষ, প্রকৃতি ও অঞ্চলের কোন ক্রীতদাস নয়, সে তাকে

নিয়ন্ত্রিত করে, বদলায়, তাই সভ্যতার যত প্রাথমিক স্তরে মানুষ থাকুক না কেন, এমন কি আবহমানতার যেখানে আধিপত্য, সেখানেও নাটকীয়তা, অতিনাটকীয়তা জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বা যথোপযুক্ত প্রকাশ করতে পারে না।[৫] হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় নারীপুরুষ উভয় প্রকার চরিত্রে নাটকীয়তা এমনকি অতিনাটকীয়তার উপাদান বেশি মাত্রায় থাকায় চরিত্রগুলি সম্পূর্ণতা পায় নি। একমাত্র করালী ছাড়া বাকি প্রতিটি চরিত্রই উদ্যমহীন, আশাহীন, ভবিতব্যের উপর সমর্পিত ও বিপর্যস্ত। অনেক ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ঈর্ষা, লোভ, স্বার্থপরতা, প্রবৃত্তির গর্ভে একান্ত ভাবেই আত্মসমর্পিত। অবশ্য তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের নারী পুরুষ উভয় চরিত্রগুলিতেই এমন একটা জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছেন যার প্রভাবে এদের জীবন পরিক্রমার প্রতিটি ছন্দ একটা অদ্ভূত জীবনরসে পরিপূর্ণ। নারী চরিত্র অপেক্ষাকৃত জটিল হয় কিন্তু এরা কেউ জটিল নয়। তাই উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। বাস্তবের খাঁটি মানুষ এরা। উদর পূর্তি আর জৈবিক প্রবৃত্তির পরিবেশনই এই নারী চরিত্রগুলির স্বধর্ম। চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে স্পষ্ট করতে তিনি কোনো প্রকার সংস্কার, আদর্শবোধ বা পূর্বপরিকল্পিত ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হন নি।

তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে উপন্যাসের নারী চরিত্র অঙ্কন বৈশিষ্ট্যে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে মিথষ্ক্রিয়ার কথা।) অনেকেই মনে করেন সামাজিক অবক্ষয়ের ফলেই ভারতবর্ষে পুরাণ সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল আর্যসংস্কৃতির সেই পুরাতন বলিষ্ঠ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে আবার মানুষের মনে ফিরিয়ে আনার জন্য। আপামর জনজীবনকে উপলব্ধি করার জন্য অতিলৌকিকতা, আতিশয্য, উদ্ভটত্ব (grotesque) প্রভৃতি হয়েছিল পুরাণের আকরণ। এক্ষেত্রে পুরাণকে আমরা মূলের অনুসারীই বলব।

(তারাশঙ্করের নারীরা সেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী পুরাণপ্রতিমা। গতানুগতিকতা, আতিশয্য, উদ্ভটত্ব, অতিলৌকিকতা যার স্মারক চিহ্ন যেন।

হাঁসুলী বাঁকের নারীচরিত্রের প্রকৃতি বোঝাতে কোপাই নদীকে তারাশঙ্কর বার বার এনেছেন। "কাহার পাড়ার কন্যেরা, বউয়েরা ক্ষেপলে অবশ্য বানভাসা কোপাই, কিন্তু সহজে তারা ক্ষেপে না। এমনিতে তারা নীলবাঁধের জল, শান্ত, স্থির।" বনওয়ারীর রঙের মানুষ 'কালো বৌ-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে কোপাই উপমান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। "কালো বউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে। উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক কিছু বুঝতে পারা

যায় না।" নারী সম্পর্কে অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহ্যের অনুসরণমাত্র, এতে কোন নতুন তাৎপর্য আরোপিত হয়নি, যেমন হয়নি কালিন্দী উপন্যাসে কালিন্দী নদীর তাৎপর্য।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার নারী চরিত্রগুলির প্রতি সন্ধানী আলো ফেললে প্রথমেই সুচাঁদ চরিত্রটির প্রসঙ্গ আসে। উপকথার নায়িকা নয় সে। উপকথার narrator—নাগিনী কন্যার কাহিনীর narrator—শিবনাথের মত। উপকথার ব্যাখ্যা করে সে। অশীতিপর এই বৃদ্ধা "পৌরাণিক কল্পনা, অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ও আখ্যান, সদ্য অতীতের ঘটনা প্রতিফলিত জীবন-দর্শনের প্রতীক হিসেবে যেন এক দৈবশক্তির অনুভবকারিণী শক্তি।"[৬] অলৌকিক দৈব-শক্তিকে সুচাঁদ অনুভব করে। এর ব্যাখ্যা করে তার পরবর্তী বংশধরদের আশ্চর্য করে দেয় প্রতিনিয়ত। "কাহার পাড়ার কতো যে আচার, আর কতো যে বিধানের মালিক সে" (তারাশঙ্কর / হরপ্রসাদ মিত্র)। সুচাঁদ কাহারনী হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাদী গ্রামের সকলেরই পিসী। উপন্যাসের নায়ক বনওয়ারীর বাবার বাবার বাবা আর সুচাঁদের বাবার বাবা এক লোক। সুচাঁদের মেয়ে বসন, নাতনী পাখী। চারকুড়ি বয়সের অভিজ্ঞতায় সে হাঁসুলী বাঁকের তিনপুরুষের কাহিনী—এককথায় হাঁসুলী বাঁকের গোটা সংস্কৃতির কথক, যে সংস্কৃতি উপন্যাসের frame of reference. সুচাঁদের মুখ-নিঃসৃত কাহিনী ধরেই সভ্যতার আলোকবর্জিত, আপন জীবন পিপাসায় উদভ্রান্ত এবং প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যে অসহায় মানুষগুলির বাঁচামরার জীবন ইতিহাস আমরা জানতে পারি। তাদের আচার আচরণে ও ধর্মীয় জীবনাচরণে সুচাঁদের ভূমিকা যেন অলঙ্ঘ নিয়তির মত। বাবা 'কালারুদ্দুর' তার বাহন চন্দ্রবোড়া সাপ—কাহার সমাজের উপাস্য এবং সকল শক্তির নিয়ন্ত্রক সুচাঁদের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বর্ণনায় সকলের বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে—"ন্যাড়া মাথা ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষি, এই পৈতে পরণে লাল কাপড় পায়ে খড়ম।" উপকথার ঢং-এ বৃদ্ধা সুচাঁদের মুখ দিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির যে মুখ্য উপাদান ধর্মীয় আচার আচরণ ও ব্রত পালন যার প্রতি ঔপন্যাসিকের গভীর আস্থা, তা বলানো হয়েছে। সেই অর্থে সুচাঁদ "কাহার সমাজের, ঐতিহ্য রক্ষক ও আধিদৈবিক বিপদের সংকেত বাহী" অর্থাৎ কাহার সমাজের অস্তিত্বরক্ষার সদাজাগ্রত প্রহরী। তার জন্য সে বার বার অতীত রোমন্থন করে ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। লৌকিক ও অপ্রাকৃত সংস্কার গোটা কাহার সমাজে বদ্ধমূল বিশ্বাস উৎপাদন করে। করালীর কৌশলে করালীর বাড়ির উঠোনে পড়ে থাকা মৃত বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপটিকে দেখে সুচাঁদ

যখন কেঁদে কেঁদে বলে—"ও যে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে। ওরই মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে 'ভোমন' করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে। দহের মাথায় বাবাঠাকুরের শিমুল গাছের কোটরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পরশু দেখেছি রে।" তখন আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না এই অশিক্ষিত, অজ্ঞ, অলৌকিকতায় বিশ্বাসী মানুষগুলোর।

সুচাঁদ কাহার সমাজের যেমন ঐতিহ্যরক্ষক তেমনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও। তার ধারণা পূর্বপুরুষের জীবন পালনে ধর্মের বিরুদ্ধতা করা আর গ্রাম্যদেবতা কত্তা-ঠাকুরের প্রতি অবহেলার পাপ সামগ্রিকভাবে গ্রাম সমাজের ওপর প্রতিফলিত হবে। তাই সে কত্তাঠাকুরকে তুষ্ট করতে, দশের মঙ্গল প্রার্থনায় মানসিক করতে জোড়া পাঁঠা দেওয়া না হলে "সব্বোনাশ হবে রে। সব্বোনাশ হবে। ও গাঁয়ের পিতুল নাই। আঃ আঃ হায়-হায়রে", বলে কাঁদতে থাকে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সে এই কাহার সম্প্রদায়ের **prophet** বা অধ্যাত্মলোকের সহিত যোগাযোগ রক্ষার সেতু। তাহার অতীত স্মৃতিপুষ্ট, তীক্ষ্ন অনুভূতির বেতার যন্ত্রে দেবলোকের নিগূঢ় অভিপ্রায়, আগামী বিপদের ছায়া, বর্তমান ঘটনার তাৎপর্য সমস্তই অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ ও বোধগম্য হয়। এ উপন্যাসে সুচাঁদের মৃত্যু নেই। মৃত্যু হয়েছে গোপালীবালার, বনওয়ারীর, নয়ানের, কালোবউ-এর, পাখির, নয়ানের মা'র। পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে চন্নুনপুর হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসায় সে সেরে ওঠে। লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। আর হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শোনায়—বাঁশবনে ঘেরা তন্দ্রামাখা স্বপ্নসুলভ ছায়াচ্ছন্ন হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। বনওয়ারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে ভেবেছিল হাঁসুলী বাঁকের উপকথার শেষ হলো বুঝি। কিন্তু না শেষ কি করে হবে? শেষ হয় না। তারাশঙ্কর দেখান একটা অন্ত্যজ শ্রেণীর আমূল বিপর্যয়ের পরও বাঁশবাদী গ্রামের ঐতিহ্য রক্ষয়িত্রী সুচাঁদ "আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে। ভাবে শেষ কি হয়? কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে? চন্দ সূর্য্য যতকাল, তার পরেও তো শেষ নাই; তার পরে যে আছেন মহাকাল। বাবা কালারুদ্দের চড়কপাটার ঘোরা। সে ঘোরার শেষ নাই। আলো নাই, অন্ধকার নাই, তবু পাটা ঘোরার শেষ নাই। সেই ঘোরাতেই তো কখনও প্রলয়, কখনও সৃষ্টি। আঁধারে সৃষ্টি ডোবে, আবার আলোতে ওঠে। তবে, শেষ কবে হবে?" তার সুদৃঢ় বিশ্বাসের জগত 'বিধির বিধান' দিয়ে তৈরী। তাই নসুবালা যখন বলে—"বাঁশবাঁদির বাঁধের বালি ঠেলে (প্রবল বন্যা হয়ে যাবার পর) বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। আর কি কচি কচি ঘাস। আর দেখে এলাম সেই "ডাকাবুক্যেকে।"

ডাকাবুকো করালী তাকে বলেছে—নতুন কাহারপাড়া হবে। বন্যা রোধে নতুন বাঁধ দেবে—সে সব কথা শুনে সুচাঁদ দুহাত তুলে আনন্দে বলে ওঠে—"আবার নতুন বাঁশের বেড়া উঠবে।"

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কাহার সমাজের মাতব্বর বনওয়ারীর বিপর্যয় ও শোচনীয় পরিণাম ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে যাবার পর করালীর বাঁশবাদীতে ফিরে আসা সুচাঁদের আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ়ই করে। তার দুহাত তুলে আনন্দ প্রকাশের মধ্যে সেই ব্যঞ্জনাই ফুটে ওঠে। অতিপ্রাকৃতের ঘনকুহেলিকা মণ্ডিত জীবনচর্যার উপকথার মধ্যে সুচাঁদ হয়তো যোগ করবে এবার শিল্প সভ্যতার নতুন হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে। তার জন্যই কি বেঁচে থাকে prophet সুচাঁদ! উপন্যাসের শেষেও তাই সুচাঁদকে বাঁচিয়ে রাখেন ঔপন্যাসিক। সুচাঁদ হয়ে ওঠে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার এক ক্লাসিক চরিত্র।

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তাঁর (তারাশঙ্কর) প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ নায়ক চরিত্র সৃজন করতে পারেন নি। প্রচলিত অর্থে নায়িকা চরিত্র সৃজন করতে পারেননি। প্রচলিত অর্থে নায়ক নায়িকা যুগলের সৃজনে তারাশঙ্কর এই পর্যায়ে একেবারেই ব্যর্থ। বরঞ্চ বলা যায় মধ্যবিত্ত পরিসরের বাইরে যেখানে দাঁড়াতে চেয়েছেন সেখানে তাঁর সাফল্য অনেক বেশিমাত্রায় করতলগত হয়েছে। 'কবি' এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৯]" 'কবি' উপন্যাসে যদিওবা নিতাই ঠাকুরঝি বসনের জীবনবৃত্তে প্রাকৃত-অপ্রাকৃতে জীবন বেগকে ঔপন্যাসিক বেঁধেছেন এক তারে, সে তুলনায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথার নায়ক পদবাচ্য বনওয়ারী বা করালীর বিপরীতে কালো বউ, পাখি বা গোপালীবালার চরিত্র পরিকল্পনায় নায়িকাসুলভ কোনো ব্যক্তিত্বই আরোপ করতে পারেননি তারাশঙ্কর। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা যদিও শেষ পর্যন্ত বনওয়ারী কাহারের গল্প হয়ে উঠেছে এবং করালী অনেকটা ঔপন্যাসিকের দোটানায় পরোক্ষ হয়ে গেছে তাই এই দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র ঘিরে যে নারীরা এসেছে তারাও শেষ পর্যন্ত জৈব প্রবৃত্তির দায় মেটাতে মেটাতেই অবসৃত হয়েছে। এমন কি তাদের পতন ও মৃত্যু কোন ট্র্যাজেডীরস সৃষ্টি করে না।

প্রথমেই পাখীর প্রসঙ্গে আসি। সুচাঁদের মুখে তার একটা জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া গেছে। সুচাঁদের কন্যা বসন্তের মেয়ে এই পাখি। দিদিমা সুচাঁদের রঙ ফর্সা। মেয়ে বসন্ত খুব ফর্সা নয়। কিন্তু 'পাখি তো একেবারে হলুদমণি 'পাখি', চৌধুরী

বাড়ীর কর্তার ছেলে অকালে মারা গেল মদ খেয়ে। নইলে যুবতী পাখির এখনকার মুখের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল দেখা যেত। তেমনই বড় বড় চোখ, তেমনই সুডৌল নাক, চুলের সামনেটা পর্যন্ত তেমনই ঢেউ খেলানো।' এই পাখি—বসন্তের মেয়ে পাখি বাঁশবাদী গ্রামের হেঁপো রুগী নয়ানের বিয়ে করা বউ। কিন্তু সে ডাকাবুকো করালীর প্রেমিকা। তার রঙের (অঙ) মানুষ। পাখীর কথা—"যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপনজন। ইয়ের আবার রাসনই বা কি মাতব্বরিই বা কি ? ওই হেঁপো রুগীর ঘরে আমি থাকব না, পালিয়ে এসেছি আজ ছ'মাস। এখন একজনের সাথে আমার মনে অঙ্ ধরল। আমি, তার ঘরে এলাম। একি নতুন নাকি কাহারদের ঘরে ?" নসুদিদি যখন বলে "ক্ষ্যামতা থাকলে চুলের মুঠোতে ধরে নিয়ে যাবে মরদের কিলে বাবা ভুলে যায়, তা অঙের নোক।" পাখি প্রতিবাদ করে—"না হে না। অঙ যান পাকা হয়, অঙের নোকই পৃথিবীর মধ্যে ছেণ্ট।" করালীর প্রতি পাখির প্রেমের এই একনিষ্ঠতায় কোন খাদ নেই। নেই কোন কৃত্রিমতা। তাই সমাজ শাসনের ভয় সে না করেই হেঁপোরুগী নয়ানকে ছেড়ে করালীর সঙ্গে চন্ননপুরে শ্রমিক বস্তিতে অনায়াসে চলে যেতে পারে। অবশ্য কাহার পাড়াতে এ ঘটনা মহা অনিষ্টর ব্যাপার কিন্তু অঙের কারবারী বনওয়ারীর অবচেতন মনে করালী পাখির এই প্রাকৃত প্রেম প্রশ্রয় পায়। সে করালীকে ডেকে বলে—"ছুটি হলে বাড়ি যাস পাখিকে নিয়ে, এখানে থাকার মতলব ভাল নয়। উ-সব ছাড়্, বাড়ি যাস সাঙার ব্যবস্থা করে দেব।" এর পর ঘটা করে বাঁশবাদী গ্রামে নয়ানকে কাটান দিয়ে করালী পাখির সাঙা হয়। এই ভাবেই পাখির প্রেমের এক পরিপূর্ণতা আসে। পাখির মধ্যে জৈবিক তাড়না যেমন আছে, করালীর প্রতি তেমনি আছে নিবিড় ভালোবাসা, মোহ নয়, গভীর অনুরাগ। এই অনুরাগের সঙ্গে আছে জীবনী-শক্তির প্রাবল্য। যে প্রাবল্যে সে স্বামী ছাড়তে পারে, ঘর ছাড়তে পারে, করালীকে শাসন করতে পারে চুলের মুঠো ধরে। আবার করালীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতেও পিছপা হয় না। কাটারি দিয়ে করালীর মাথায় আঘাত করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। শেষে আত্মহত্যায় অভিমানিনী জীবন বিসর্জন দিয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পাখি একেবারেই ব্যতিক্রমী চরিত্র। "কাহার কন্যা ক্ষেপে উঠলে দুকূল ভাঙা কোপাই-এর মত ভয়ঙ্করী" হয়ে যায়। কিংবা "কাহার পাড়ায় স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা আর নোয়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকেগাল দিতে দিতে চলে যায়—অন্য কোন কাহার মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার মেয়ে করে না।" পাখি কিন্তু কাহার কন্যাদের মত অন্য

মরদের ঘরে ওঠেনি। প্রবৃত্তির উর্ধ্বে ছিল তার স্বামী প্রেম। তাই সুবাসীকে বিয়ে করবার পর গোপালীবালা বনওয়ারীর ঘর কিছুদিন করেছিল, কিন্তু সুবাসীকে বনওয়ারীর ঘর থেকে করালী তুলে আনায় পাখির আত্মসম্বিতে ঘা লেগেছিল। নিজের মাথায় কাটারির ঘা না দিয়ে করালীর মাথায় বসিয়ে দিল কাটারির ঘা। যদিও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল করালী। কিন্তু 'বিধির বিধানে' কত্তাবাবার বাহনকে পুড়িয়ে মারার অভিশাপে করালী পাখির উন্মত্ত প্রণয় লীলার পরিণাম নয়ানের মার অভিশাপে এই রকমই অবধারিত সত্য হয়ে যায়। তাই পাখির মৃত্যু বিধি নির্দিষ্ট বলেই তা ট্রাজিকরস বহন করে আনেনা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "এই অবৈধ প্রেমের অনিবার্য বিস্ফোরক শক্তির মাধ্যমে মানবের দৈব নিরপেক্ষ স্বাধীন ইচ্ছার স্ফুরণ হইয়াছে।" কিন্তু পাঠকের মনে "দৈব বিধানের প্রতি এরূপ ভীতিমিশ্র, অথচ ন্যায়ানুমোদিত স্বীকৃতি জাগায় নাই। করালী ও পাখির প্রণয়-সঞ্চার ও উহার ভয়াবহ পরিসমাপ্তি ঐ একই সত্যের পরিপোষক।" শরৎচন্দ্র বর্ণিত প্রেমের সান্ত্বনা খুঁজতে, বলেছিলেন—"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরে ও ঠেলিয়া ফেলে।" তারাশঙ্কর এ সান্ত্বনায় আস্থা পান নি। বঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতা তাঁর শিল্পী মনকে ক্ষত বিক্ষত করেছিল। অথচ তিনি একই সঙ্গে দেখলেন নরনারীর রোমাণ্টিক সম্পর্কের গভীরতা আর বিপরীত দিক থেকে তারই বিকৃতরূপ। নারী হৃদয়ের আত্মোৎসর্গ যেমন দেখলেন তেমনি দেখলেন প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষের আদিম জৈবিক পিপাসা। পাখি এর সার্থক উদাহরণ। দুটি সত্তাই তার জীবন যৌবনে মুখ্য বিষয়। এমন চরিত্র তারাশঙ্করের অধিকাংশ উপন্যাসেই সুদুর্লভ। ঔপন্যাসিকের তাই সদর্থক মন্তব্য, "পাখিকে ভুলবার পথ রাখে নাই পাখি।"

আর এক স্বৈরিনী নারী কালোশশী—আটপৌরে পাড়ার ডাকাত পরম কাহারের বিয়ে করা বউ। আটপৌরেদের গোরাচাঁদের বেটীর বেটী। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার এক নজরকাড়া চরিত্র। এই উপন্যাসের দুটি নেমেসিস একটি কত্তাবাবার বাহন বিষধর চন্দ্রবোড়াকে পুড়িয়ে মারা আর একটি মুহূর্তের উন্মাদনায় কাহার পাড়ার মাতব্বর বনোয়ারীর কালোশশীর সঙ্গে কত্তাবাবার ঠাঁই এর কাছে যৌন মিলন। যে পাপকর্মে কাহারপাড়ার বিপর্যয় ও বিনাশ, বনওয়ারীর অবচেতন মনের কাঁটা তাই। এবং সেই পাপেই কলোশশীর দেবরোষের বাহন শ্বেত গোখরো সাপের দংশনে মৃত্যু। কালোশশীকে নেমেসিস বলছি এই কারণে, মাতব্বর বনওয়ারী সকল সতর্কতা ও সচেতনতা রক্ষা করেও বার বার কালোশশীর অমোঘ আকর্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তার মাতব্বরী জীবনের পবিত্রতাকে কালোশশীর উন্মত্ত

আবেগ মুহুর্মুহু দোলাচালিত করেছে। বাঁশবাঁদি গ্রামের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত বিপর্যয়ে কর্তাবাবার বিরূপতা বিমুখতায় কালোশশী ও তার অবৈধ সম্পর্ক মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় বনোয়ারীর কাছে কখনও বা। তার মাতব্বরী জীবনের একটা evil omen জেনেও সে এর হাত থেকে মুক্তি পায় না। কালোশশী পরমকাহারের বিয়ে করা বউ। পরমের ডাকাতির দায়ে জেল জীবনে সে এক চরিত্রহীনা নারী। "সে চন্ননপুরের বড়বাবুদের দারোয়ান ভূপসিং মহাশয়ের সঙ্গে লোক জানাজানি করেই ভালবাসা করেছিল। তার অনুগৃহীতা। তা সত্ত্বেও বনওয়ারী কাহার তার অঙের মানুষ।" বনওয়ারীর সঙ্গে তার মনে রঙ্ ছুঁই ছুঁই অবস্থা।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সবচেয়ে সজীব অংশ চেতনে অবচেতনে বনওয়ারী কালোশশীর প্রেমের দৃশ্য বর্ণনা। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে সুপ্ত অবদমিত, দেহজ কামনা-বাসনার এমন মদির আর্তির প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে কদাচিৎ আঁকা হয়েছে। অন্তত দুটো দৃশ্য তো অসাধারণ। প্রথমটি চেতনে—

"বনওয়ারী টলতে টলতে কালো বউকে নিয়ে কোপাইয়ের গর্ভে এসে নামল। আকাশে সবে চাঁদ উঠেছে। একপাশ খাওয়া লাল বরণ খণ্ড চাঁদ।······বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে গলা ডুবিয়ে বসল।··· ··কালো বসেছে নদীর বালিতে পা ছড়িয়ে। দেখতে দেখতে চাঁদের আলো দুধবরণ হয়ে গাছপালা বাঁশবন ঝলমল ক'রে নদীর বুকে নামল। কোপাই-এর জলে গলানো রূপোর ছটা জেগে উঠল। কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন খিল খিল ক'রে হেসে ঢ'লে গড়িয়ে পড়েছে। ওই ছটায় কালো বউকে বড় সুন্দর লাগছে। তার উপর মনে ধরছে রঙ, সে রঙের ছটাও গিয়ে পড়েছে কালোশশীর মুখে, বনওয়ারী বললে—মিহিসুরে এক পদ গায়েন কর কেন ?

হাসলে কালো বউ। কালো বউয়ের দাঁতগুলি ঝিকমিক করে উঠল, সে বলল গায়েন ?

—হ্যাঁ। বেশ অঙের গায়েন।

—আজ যে দেখি নেশা খুব।

হাসলে বনওয়ারী। কালো বউ গান ধরলে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গান !······

আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না

পদ্ম পাতায় কাঁদিলাম হে—

সে জল পাতা নিলে না—

অপূর্ণ প্রেমের মদিরা দুই প্রৌঢ়া-প্রৌঢ়র জীবন পাত্রের কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল সেদিন কালো বউ-এর জীবনান্তের অশুভ মুহূর্তে। কত্তাবাবার বাহন শ্বেত গোখরোর দংশনে কালোশশীর দেহ 'কত্তার দহে' আছড়ে পড়ল। রেখে গেল অচরিতার্থ, অপূর্ণ প্রেমের মাধুরী বনওয়ারীর জীবনে।

তাই অবচেতনে কালো বউ-এর প্রেতযোনিও তাকে তাড়াকরে ফেরে। "কালো বউয়ের কথা সে ভাবছে। আটপৌরে পাড়ার বটগাছটার তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ডালে দোল দিচ্ছে, হয়তো দোল খাচ্ছে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নার মধ্যে সে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে—বনওয়ারীর ঘরের দিকে। বাঁশবাঁদির বাঁশবন এবং গাছ পালার ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার সাদা গুলছাপ গায়ে মেখে ঝরাপাতার উপর পা ফেলে শব্দ তুলে এসে দাঁড়াবে তার ঘরের পিছনে। টুপটাপ করে ঢেলা ফেলে দেবে ইশারা। আরও গভীর রাত্রে বনওয়ারী উঠছে না দেখে গুনগুন করে গান গাইবে। তারপর ভোরের আকাশে শুকতারা উঠলে সে ফিরে যাবে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কোপাইয়ের ধারে ধারে—কত্তার দহে গিয়ে নামবে; সেখান থেকে উঠে আবার আসবে বটতলায়। বটতলা দিয়ে বনওয়ারী গেলে বটফল ছুঁড়ে মারবে কৌতুক ভরে, কোপাই-এর ধারে গেলে নদীর জল অথবা বালি ছিটিয়ে দেবে গায়ে। কোনোদিন হয়তো দেখা দেবে মনোহারিনী সাজে সেজে, কোপাই-এর ধারের শিরীষ কাঞ্চন তুলে খোঁপায় পরে, অথবা দহের জলে ভেজা চিকন চুলগুলি এলিয়ে, তাতে অজস্র জোনাকি পোকা প'রে কালো মুখে সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিকিয়ে হাসবে। কোনদিন হয়তো বা দেখা দেবে ভয়ঙ্করী রূপে, মাথা ঠেকবে শিমুল গাছের মাথায়, চোখ দুটো জ্বলবে আগুনের আঙরের মত, লম্বা হাতখানি বাড়িয়ে দেবে—হিমের মত ঠাণ্ডা হাত, বনওয়ারীর ঘরের দিকে। রুদ্ধ রোষে বাঁশবাঁদির অন্ধকার চেরা চীৎকার করবে অথবা অতৃপ্ত বাসনায় কাঁদবে, অন্ধকার উঠবে গুমরে।"

বস্তুত উপন্যাসে মাতব্বরী জীবনের বাইরে বনওয়ারীর যে একটা আন্তর জীবন আছে, যে আন্তর জীবনে কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তির অমোঘ আকর্ষণ থাকে, যেখানে থাকে স্বপ্ন, রোমাঞ্চ, জীবনকে উথাল পাতাল করে দেখা সেখানেই বনওয়ারীর জীবনে কালোশশীর অবস্থান। গ্রাম্য রোমান্স সব সময়েই মোটা দাগের হয়। কিন্তু কালো বৌ-এর 'ভাগ্য বিড়ম্বিত' রোমান্স তার হৃদয়ের একূল-ওকূল দুকূল ভাসানো, যা হাঁসুলী বাঁকের উপকথার পাঠকের বাড়তি পাওনা। তার মৃত্যু (অপঘাত)

'বিধির বিধান' হলেও হয়তো ট্র্যাজিক নয়। কালোবৌ-এর মদির লালসাময় মোহবিহ্বলতা'র—এমন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা উপন্যাসিকের কঠোর অনুশাসন ব্রতের ফল হয়তো বা। পাপের বেতন মৃত্যু—ঔপন্যাসিক এই ভাবাদর্শেই কালোবৌ-এর জীবনের উপসংহার টানলেন। উপন্যাসে কালোবৌ হয় উঠল এক **extreme character** যার চরিত্রের মর্মমূলে ছিল এক **elemental passion.**

বনওয়ারীর জীবনবৃত্ত থেকে কালোবৌকে যেমন কেড়ে নিয়েছিল 'বাবা কালারুদ্দু' তেমনি আবার সুবাসীকে 'কত্তাবাবাই' মোহিনী যুবতী বেশে কালোশশী রূপেই ফিরিয়ে দিল—এই রকম একটা অভিপ্রায় নিয়েই যেন ঔপন্যাসিক সুবাসী চরিত্রের কল্পনা করেছেন। উপন্যাসের দ্বন্দ্ব তো একাল-সেকালের, প্রাচীন-নবীনে। তাই সুবাসী রমনের স্ত্রীর বোনঝি, কালো বৌ-এর বোনঝি, কাহার পাড়ার মাতব্বর বংশ লুপ্ত হওয়ার থেকে বাঁচাতে বনওয়ারীর ঘরণী হয়ে এলেও এই দ্বন্দ্বের দীপ-শিখাটিকে উস্‌কে দিতেই যেন তার আবির্ভাব। জৈবিক প্রবৃত্তি ধর্মে পাখি, কালো বৌ থেকে পৃথক কিছু নয় সে, বরং একটু বেশি মাত্রায় প্রগলভা, তার ঠাঠ ঠমক, চলন-বলন সবই রোমাণ্টিক ; যেন 'কোপাই-এর মাতন', যে মাতন নেশা ধরায়। বনওয়ারীর বুকে 'নতুন বছরের বান' যেন। এমন এক যৌবনকে প্রৌঢ় বনওয়ারী শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবে কি করে ? করালীর প্রতি সুবাসীর আকর্ষণে দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আসলে "এই আকর্ষণও পুরাতনের অবসান সূচনা করে উপন্যাসে এবং আধুনিককে অভ্যর্থনা জানায়"[১০]। তাই সুবাসী কাহার পাড়ার উপকথার ধারা অনুযায়ী সঠিক্ কাজ করে। হাসতে হাসতে কালো বৌ-এর মত রঙ্গ করে চলে যায় করালীর সঙ্গে। এই চলে যাওয়া শেষ পর্যন্ত সুবাসীর জীবনান্ত না জীবনায়ন সে ভাবনার ভার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দেন ঔপন্যাসিক।

এই উপন্যাসে নারী চরিত্রের বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজনেই হয়তো বা বাসিনী বৌ (নয়ানের মা) চরিত্রের পরিকল্পনা। এই নারীর প্রতি বাঁশবাদী গ্রামের কাহার পল্লীর কোনো সহানুভূতিই ছিল না বলে তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন—"নয়ানের মা এককালে ছিল মাতব্বরের পরিবার, ঘর ভাঙানো ঘরের গিন্নি, তার অহঙ্কার ছিল বেশী, সে অহঙ্কার ভেঙে গেল যখন তখন থেকে সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। তাই তার প্রতি কারু সহানুভূতি নাই।" ঔপন্যাসিকেরই কি ছিল ? না হলে এই বিশাল মহাকাব্যিক উপন্যাসে বাঁশবাদী গ্রামের কাহারঅধ্যুষিত অঞ্চলের যে 'কলহসংস্কৃতির' ধারা প্রবাহিত সে প্রসঙ্গ যতবারই এসেছে বাসিনী বৌ-(নয়ানের মা-ই) তার কেন্দ্র-বিন্দু হয়েছে। এবং তাকে আমরা দেখি শুধুই সে অভিশাপ দিয়ে চলেছে

করালীকে, পাখিকে, মাতব্বর বনওয়ারীকে। নয়ানের বিয়ে করা বৌ পাখিকে সাঙা করার অনুমতি দেওয়ায় সে মাতব্বর বনওয়ারীর ওপর ক্রুদ্ধ। ক্রোধের আরও একটা কারণ মাতব্বর বনওয়ারীরও সে প্রাক্তন প্রণয়িনী। তার স্বামী কুঞ্জর ভালোবাসা সে পায়নি। চৌধুরী কর্তার কাছে কাহার পাড়ার মেয়েদের যোগান দিতে দিতে এবং তাদের উচ্ছিষ্টের আস্বাদ নিতে নিতে তার স্বামী কবে ফুরিয়ে গেছে। রেখে গেছে সমর্থ বিধবা বাসিনী আর তার কুড়ি বছরের ছেলে হেঁপোরুগী নয়ানকে। কিন্তু বাসিনীর মনে তখনও তো জ্বলছিল কামনার আগুন, সেই আগুনের ঘি তো বনওয়ারী স্বয়ং। সুচাঁদ কথায় কথায় বনওয়ারীকে স্মরণ করায় "নয়ানের মায়ের সঙ্গে তার গুজগুজ আর কেউ না জানুক আমি জানি। নদীর ধারে একদিন উয়োর পায়ে ধরেছিলি, আমি দেখেছিলাম।"

নয়ানের মাও সে কথা স্মরণ করায় বনওয়ারীকে।

"মনে আছে? পায়ে ধরেছিলে লদীর ধারে সুচাঁদ পিসী বলে গেল।

—লয়ান রয়েছে ঘরে, বাসিনী বউ।

—সে ঘুমিয়েছে। জান, তখনও মাতব্বরি ঘরভাঙাদের। আমি তখন ঘর-ভাঙাদের বউ।

—বাসিনী বউ, আমি তোমার অসম্মান করি নাই ভাই।

বাসিনী বউ তার হাত চেপে ধরেছে। চোখ জ্বলছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। বাসিনীবউ ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে।"

উপন্যাসে আর একবার নয়ানের মার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক—"নয়ান যেদিন করালীর হাতে মার খেয়ে হাঁফাচ্ছিল, সেদিনও সে বনওয়ারীর হাত ধরে টেনেছিল বাঁশবনের আঁধার রাজ্যের দিকে।" আসলে অপরিপূর্ণ এবং অচরিতার্থ কামনাই নয়ানের মাকে এত **Sadist** করে তুলেছে। আর ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক সত্তার আরোপে মানুষটিকেও অমানবিক করে তুলেছেন। লেখকের সহানুভূতির স্পর্শ যে আগাগোড়া পেল না তাঁর মৃত্যুও তাই কদর্যভাবে বর্ণিত হয়েছে—'নয়নের মা মরেছে। সে মরণ তার ভীষণ। অন্তত নসু তাই বললে— নবান্নের দিন, অগ্রহায়ণের শেষ মাসে গিয়েছে নবান্ন। নয়ানের মা জাঙালে সদগোপ মহাশয়দের চার বাড়িতে আকণ্ঠ এঁটো কাঁটার প্রসাদ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করে মারা গিয়েছে।' হিংসাপরায়ণা, কটু ভাষিণী বসিনীবউ চরিত্রটি বিবর্তনধর্মী নয়। যদিও আধিদৈবিক, আধিভৌতিক সংস্কারে সে বেশী আস্থাশীল, কিন্তু তার

ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণ হিসেবে সে কিন্তু 'কপাল নেকন'কেই মেনে নিয়েছে। কালরুদ্রের শাস্তি বিধান বলে মনে করেনি।'

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য করেছেন—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় আঞ্চলিকসত্তা ও মানবসত্তা একাত্ম ঠিকই, তবে মাঝে মাঝে আঞ্চলিক সত্তার দীর্ঘ ছায়া তার ভেতরকার মানুষগুলিকে লুকিয়ে ফেলে।" হাঁসুলী বাঁকের উপকথার নয়নের মার প্রসঙ্গে কি একথা প্রযোজ্য হবে? গালিগালাজ, শাপ-শাপান্ত যেহেতু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক উপন্যাসের এটাও একটা ছাঁচ, সেই ছাঁচে এই নিষ্ঠুর চরিত্রটি সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গেছে। উপন্যাসে অনেকগুলি নারী চরিত্রেব ভিড়ে নয়ানেব মা হারিয়ে যায় নি। নয়ানের মার চরিত্রে যদি কোনো দ্বন্দ্ব থেকে থাকে তবে তাও বনওয়ারীকে ঘিরে হৃদয়াবেগ ঘটিত রং-এর খেলার কারণেই। এই দ্বন্দ্বকে আড়াল করতেই তাব শাপ-শাপান্ত, গালি-গালাজ কটুভাষণ। করালী-পাখির ধ্বংসের চেয়েও বনওয়ারীর বিপর্যয়ই তার সব চেয়ে বেশি প্রার্থিত ছিল। মানবচরিত্র তো সাধারণত দোষে গুণে মিলিয়ে হয়, কিন্তু নয়ানের মা বাসিনীবৌ-এর কোনো গুণের পরিচয় নেই এ উপন্যাসে। এ একেবারেই এক **typical character.**

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার নারীরা অধিকাংশই 'প্রবৃত্তিপ্রধান দুরন্ত হৃদয়াবেগের' আধার, ব্যতিক্রম শুধু বসন্ত আর গোপালীবালা। দু'টি চরিত্র খুবই নিষ্ক্রিয় এ উপন্যাসে। তার মধ্যে বসন বা বসন্তকে অন্যভাবে এঁকেছেন তারাশঙ্কর। ঔপন্যাসিকের নিজস্ব এক শ্রদ্ধা এই চরিত্রটির ওপর বর্তেছে। উপন্যাসের একজায়গায় তারাশঙ্করের একটি মন্তব্য ছিল 'হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাদির কাহার পাড়ায় মানুষদের প্রকৃতি আছে, চরিত্র নাই'। বসনের ক্ষেত্রে এই মত গ্রাহ্য নয়? শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তো মন্তব্য করেছেন—'একমাত্র বসনের প্রেম শান্ত একনিষ্ঠতার গৌরব-মণ্ডিত হইয়া প্রবৃত্তিপ্রধান দুরন্ত হৃদয়াবেগের বিপরীত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে'।[১২] বসন্ত অবশ্যই সতী নয়। কাহার কন্যারা সতী হয় না। 'কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা?' চৌধুরীবাবুর মাতাল ছেলের সঙ্গে তার প্রেমের কথা সবাই জানে। তথাপি "কাহার পাড়ার বিচিত্র মেয়ে বসন্ত। ওই চৌধুরীর ছেলেকে সে যে ভালবেসেছিল, তারপর সে আর কারও দিকে ফিরে তাকায় নাই। কাহার পাড়ার নীল বাঁধের শালুকের বনের মধ্যে পদ্মকলি যেমন উদয়াস্ত সূর্যের দিকেই চেয়ে থাকে, তেমনি ওই একজনের দিকেই ছিল মন প্রাণ চোখ সব। চৌধুরীদের ছেলের মৃত্যুর পর সে থাকত সৎজাতের গৃহস্থ ঘরের বিধবার মত। শান্ত মৃদুভাষী বসন্ত।" প্রবৃত্তিবেগের দাহ তার মধ্যে ছিল। আর

সেই কারণেই কৌমার্যে তার অবৈধ সন্তান পাখি। চৌধুরীদের মেজছেলের ঔরসজাত সন্তান। তাকে বৈধ করার জন্য এক জরাজীর্ণ খোঁড়া কাহার ছেলেকে ঘুষ দিয়ে নিয়ে এসেছিল বসনের মা সুচাঁদ। পিতৃত্বের দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে বসন্ত এবং পাখিকে রক্ষা করেছিল। বসন্ত তার প্রেমের ঔজ্জ্বল্যেই ভ্রূণ হত্যা করতে দেয় নি। তাই পাখির আত্মহত্যার পর "বসনও কাঁদলে। সে কাঁদলে শুধু মৃতস্বামীর জন্য নয়, জাঙলের চৌধুরী বাড়ির ছেলের জন্যে কাঁদলে। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন।" হৃদয়ের গভীর প্রেমই তাকে শান্ত সুশীলা করেছে, প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠিয়েছে। কাহার-নারীদের মধ্যেও সে খাপছাড়া তাই। এবং সেই কারণেই বাঁশবাদী গ্রামে সে এক নিঃসপত্ন নারী। সমাজশাসনে তার শ্রদ্ধা, আধিদৈবিকতায় সে বিশ্বাসী আবার প্রবল সন্তান স্নেহ-পরায়ণা জননী। করালী ও পাখির মঙ্গলের জন্য সে হাঁস বলির মানত করে। সমাজশাসনকে উপেক্ষা করে করালীর কোঠাঘর বানানোর পরিকল্পনায় শঙ্কিত হয়। তার অমেয় বাৎসল্যরসের ধারাটিকে পাখি কি গভীর ভাবে উপলব্ধি করে—'মা তো তার শুধু মা নয় তার পরাণের সখী। এমন মা কারও নাই। পাখি অকপটে বলে সকল কথা তার মাকে। বসন কখনও তার মেয়েকে তিরস্কার করে না। সে তার চুল বেঁধে মুখ মুছিয়ে দেয়। ঠাট্টা করে বলে—ভাল হয়েছে কিনা করালীকে শুধাস।' বসন চরিত্রে একাধারে প্রেমিকা, জননী এবং সুঅভিভাবিকার ত্রয়ী সম্মেলন দেখতে পাই।

মাতব্বর বনওয়ারীর ঘরণী কি কাহার রমনী নয়? উপন্যাসে সুচাঁদের মুখ দিয়ে বার বার বলানো হয়েছে, 'কাহারদের তরুণী মেয়ে বানভাসা কোপাইয়ের মত ক্ষেপে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ায়।' সেদিক থেকে পাখি, কালো বৌ, সুবাসী, সিধু, নয়ানের মা, বসনের পাশে গোপালীবালার হৃদয়ের প্রবৃত্তি বেগের বহিঃপ্রকাশ নেই বললেই চলে। শুধু একবার সুবাসীকে সাঙা করার সময়ে পাগল পিরীতির ছোট্ট একটুকু ছোঁয়ায় গোপালীবালার মনে রঙ্ ধরানোর চেষ্টার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা দেখাতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক,কিন্তু তাকে গভীরতা দিতে পারেননি। আসলে বনওয়ারী মাতব্বরের জৈবিক প্রবৃত্তিপরায়ণ জীবনে বিবাহিতা ঘরণী গোপালীবালার চরিত্র তাৎপর্যহীন হয়ে যেতে বাধ্য। আগাগোড়াই সে নিরীহ, সুশীলা, ভালোমানুষ। বনওয়ারীর 'মুখে ময়দা নেপা পরিবার' সে। সন্তান ধারণে অক্ষম বলেই সংসারে সে অবাঞ্ছিত। বনওয়ারীর অনুভবে 'গোপালীবালার মধ্যে কোপাইয়ের ঢেউ নাই, মনে সে দোলা লাগাতে পারে না, সে হল নীলের বাঁধের জল, না আছে সাড়া, না আছে ধারা, চুপচাপ ঠাণ্ডা শীতল; বুক ডুবিয়ে বসে

থাকলে নড়বে না, জড়িয়ে ঘিরে নিথর হয়ে থাকবে।' তবে নীলবাঁধের মতই বনওয়ারী তাকে ভালোবাসে। তবে কোপাইয়ের মত্ততা না থাকায় বনওয়ারীর গোপালীবালার ওপর নেশা কখনও জমেনি। **All women are jealous** এই আপ্ত বাক্য অনুযায়ী গোপালীবালার ঈর্ষা আছে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া নেই বলে মাত্র কুড়ি টাকার বিনিময়ে সে সুবাসীকে সতীন হিসেবে মেনে নেয়। আঁজলা ভরা ঝকঝকে টাকা দেখে সে কান্না ভুলে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসে, আবদার করে সোনার কানফুল গড়িয়ে দিতে। গোপালীবালা বোকা-সোকা মানুষ, কিন্তু বোধবুদ্ধিহীন নয়। কালোশশী তাকে দেখে মুখ টিপে যে হাসত তার অর্থ সে বুঝত, সুবাসীকে ঘরে আনার অর্থ যে কালোশশীকেই নতুন করে পাওয়া সে কথা বনওয়ারীকে জানিয়ে দিতে ভোলে না গোপালীবালা। তথাপি ঔপন্যাসিক গোপালীবালা চরিত্রটি কাহাররমণী সুলভ বৈশিষ্ট্যে মার্জ্জিত করলেন না কেন তা বোঝা দুষ্কর। চরিত্রে দ্বন্দ্ব না থাকলে চরিত্র সজীব হয় না। গোপালীবালা চরিত্রে দ্বন্দ্ব নেই কেন এটাই পাঠকের বিস্মিত ঔৎসুক্য।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার চরিত্র সৃষ্টিতে তারাশঙ্কর কোনো জটিলতা আনতে চাননি। সে পুরুষ কি নারী উভয় ক্ষেত্রেই। বাস্তবের খাঁটি মানুষ এরা। জৈবিক প্রবৃত্তির কাছে তারা লগ্ন হয়ে থাকে। শিক্ষা সংস্কৃতি, পরিশীলিত জীবনবোধ মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে অসংকোচে তিনি চারিত্রিক রহস্য সমূহকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। জটিল মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেন নি। বৈচিত্র্যসন্ধানী তারাশঙ্কর বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে জৈবিক প্রবৃত্তিকে উপপাদ্য করে হৃদয়গত চিত্ত-বৃত্তির বল্গাহীন প্রবাহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেখানে তিনি সংস্কার, আদর্শবোধ, ভাবালুতা বা এজাতীয় কোনো **pre-conceived idea**কে প্রশ্রয় দেন নি।

সূত্র নির্দেশ:

১. আমার কথা, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৭১

২. কবিশেখর কালিদাস রায়কে লেখা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের উৎসর্গ পত্র

৩. **An Acre of Green Grass, Buddhadev Bose, First Edition, Pg. 84**

৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৫৫৪

৫. বাস্তব বোধ, আঞ্চলিকতা ও বাংলা উপন্যাস, সৃজনের সমুদ্রমন্থন, কার্ত্তিক লাহিড়ী, পৃ. ১১১-১১৩
৬. তারাশঙ্করের শিল্পী মানস, ডঃ নিতাই বসু
৭. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৫৫৫
৮. ঐ
৯. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ. ৩১৪
১০. তারাশঙ্কর ঃ দ্বন্দ্বের শিল্পী, দ্বন্দ্বের শিকার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অশ্রুকুমার সিকদার, পৃ. ১৪২
১১. পটভূমি আঞ্চলিকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ, উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পৃ. ৬৪
১২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৫৫৬।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ঃ বিন্যাস বৈশিষ্ট্য

উদয়কুমার চক্রবর্তী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' লিখলেন তখন তাঁর মধ্যে কাজ করছিলো কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা। যে প্রবণতার নিরিখে বলা যায় আঞ্চলিকতাধর্ম তাঁর এই উপন্যাসে চলে এসেছে। দ্বিতীয় যে দিকটি চোখে পড়ে তা বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ মানুষজনদের ইতিবৃত্ত রচনার প্রবণতা। আর তাই অনিবার্যভাবে 'উপকথা' শব্দটি গ্রন্থনামের মধ্যে চলে আসে।

উৎসর্গ পত্রে তিনি জানান এই উপন্যাসের মাটি, মানুষ আর তাদের অপভ্রংশ কথা কেমন করে জড়িয়ে আছে এই কাহিনীতে। উপন্যাসের বিন্যাসে এই তিনটি দিকই তাই প্রাধান্য পায়। তার সঙ্গে প্রাধান্য পায় গল্প বলার দিকটি।

কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নদী প্রবাহের ধারাটিই এখানে লক্ষ্য করা যায়। 'কোপাই' নদীর তীরবর্তী মানুষজন এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। লেখক জানান—

"কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক —অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত।"

নদী এখানে চরিত্র হয়ে ওঠে। আর তাই উপন্যাসের শুরুতে এই কোপাই নদীর বর্ণনা চলে আসে। নদীর উপমায় তিনি দেখেন নদীকে। বলেন,

'শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী'

এরপর নদী তীরবর্তী মানুষজনদের কথা। কিন্তু তার আগে আবাদী জমি, বাঁশবন এবং তার পর দুটি পুকুর এবং পতিত জমি। এখানে যারা বাস করে তাদের মধ্যে কাহার সম্প্রদায় হল প্রধান।

তিরিশ ঘর কাহার	বাঁশবাদি গ্রাম	[আড়াইশো বিঘার এলাকা। দুটি পুকুরের চার পাড়ে তাদের বাসস্থান। ছোট গ্রাম।
কুমোর—সদগোপ চাষী—সদগোপ	জাঙল গ্রাম জাঙল গ্রাম	[তিন হাজার বিঘা হাঁসিল জমি বিশাল পতিত জমি। নীলকুঠির

গন্ধবণিক	জাঙল গ্রাম	সাহেবদেরই প্রায় তিনশো বিঘা
একঘর নাপিত	জাঙল গ্রাম	পতিত জমি।
দু'ঘর তন্তুবায়	জাঙল গ্রাম	

এখানকার জীবনযাত্রা নদীকেন্দ্রিক সে কথা বিশ্লেষণ করে দেখান লেখক। এখানে নদীর ভাবনা চার মাসের। পূর্ববঙ্গের দারোগাবাবুদের দেশে বারো মাসের ভাবনা। এখানে 'আষাঢ় থেকে আশ্বিন'। এ নদীর তিনটি পর্যায় ঠিক যেন কাহারদের মেয়ে।

ক. মা হারা কচি মেয়ে, খ. যুবতী, গ. ডাকিনী

তখন বন্যায় সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শুরু হয় বন্যার দুর্ভোগ। যাকে বলে 'হড়পা বান'। বাঘ, বুনো শুয়োর, কুমীর এবং বিষাক্ত সাপ চলে আসে মাঝে মাঝে।

এই হলো প্রতিবেশগত পরিচয়। এই প্রতিবেশ থেকেই চলে আসা যায় মূল কাহিনীতে। যা এই বর্ণনায় মাঝে মাঝেই চলে এসেছে—'সুচালো বাঁশীর মতো শিসের শব্দ' যা এই অঞ্চলের লোকের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সেখান থেকেই দেবতার পুজো আচ্চার প্রসঙ্গ চলে আসে।

লেখক এ উপন্যাসে কাহিনী বোনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বেশ কিছু অনুষঙ্গ এবং ঘটনা। যে অনুষঙ্গ ও ঘটনা একটা থেকে আরেকটায় চলে যায়। সুচাঁদের মুখ দিয়ে দেবতাই যেন কথা বলান,

"ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।" কিম্বা সে যখন আবার বলে, "ও যে হারামজাদা বজ্জাত—ওই ওর পাপের পেরাশ্চিত্তি করতে হবে সবাইকে ;"

এখানে পানুর দেওয়া 'খুঁতো পাঁঠার' বলি দেবার পাপ আর চন্দনপুরে রেল কারখানায় কাজ করা—গ্রামের কাউকে না মানা করালী এক হয়ে যায়।

উপন্যাসে এর পরই ঘটে একটি ঘটনা যা অজ্ঞাত এক শঙ্কাকে টেনে নিয়ে আসে আমাদের কাছে। করালীর কুকুর কালুয়া মারা যায়। গ্রামের লোক ভাবে এ কর্তার কোপ। করালী তা অগ্রাহ্য করলে বনওয়ারী রেগে ওঠে।

এভাবে কাহিনীর প্রধান সমস্যার ভেতরে লেখক প্রবেশ করেছেন। নদী থেকে প্রান্তবর্তী কাহারদের সমাজ এবং সেখান থেকে ভদ্রলোকদের কথা মাঝে মাঝে। গ্রামের সংস্কার রীতিনীতিকে আঘাত করতে থাকা চরিত্র 'করালী' গ্রাম জীবনে যুক্ত হয়। ফলে প্রথম থেকেই একটা টানাপোড়েন এবং দ্বন্দ্ব উপন্যাসে নাটকীয় হয়ে উঠেছে।

কত্তার থানে আগুন দিয়ে শিসের রহস্য সে উন্মোচিত করে। বিশাল চন্দ্রবোড়া মেরে ফেলে বনওয়ারীকে বলে, "মুরুব্বি, কত্তার পুজোটা সব আমাকে দিয়ো গো" সুচাঁদ কিন্তু এর মাঝেই গ্রামের অমঙ্গল দেখে। গ্রামের উপকথার সেই বুড়ি যে গ্রামের সুখ দুঃখ দেখত—ব্রতকথার সেই বুড়িই যেন সুচাঁদ। এখানে চরিত্র উপকথা আর ব্রতকথার চরিত্র হয়ে যায়। তাই সর্বনাশা সাপ তার কথায় ব্যবার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এরপর, বাবাঠাকুর পুজো। এই পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্বে আছে—হাঁসুলী বাঁকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কাহিনী। বনওয়ারীর জমি কেনার ইচ্ছা, পাখী করালীর রঙ, বনওয়ারী পাখী আর করালীর সাঙার কথা ভাবে। কালোশশীর চোখে দেখা যায় 'কোপাই নদীর দহ'।

এভাবে লেখক গ্রামজীবনের কেন্দ্রে পৌঁছে যান। হাঁসুলী বাঁকের সমাজজীবন কথা স্পষ্ট হয়,

ছেলেছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্র মাসে ভাদু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা দশভুজার পুজোয় গায় পাঁচালী, কার্ত্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত—তখন গানবাজনার আসর আসে ঢিমিয়ে, ধান কাটা ফসল তোলার সময়। চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের, বোলানের গানের পালা।"

হাঁসুলী বাঁকের এই বারমাস্যার মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা প্রবাহিত হয়ে চলে। করালী বাবুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। বনওয়ারীকে তেরপল এনে দেয়। পাখীর আগেকার স্বামী নয়ান পাখীর নাক কামড়ালে তাকে মারধোর করে। তবু বনওয়ারীর মনের মধ্যে একটা ভয়, পাপবোধ জেগেই থাকে। চড়কের পাটায় শুয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে কাটোয়ায় যাবে গঙ্গাস্নান করতে। এই পর্বে নটি অধ্যায়।

তৃতীয় পর্বে আছে মোট পাঁচটি অধ্যায়। বনওয়ারীর পাটায় শোয়া, নয়ানের মার অভিশাপ, কালোশশীকে দহের জলে ডুবতে দেখে বনওয়ারী আর দেখে গোখরো সাপ। পরমের আক্রোশ মেটে। সে ছুটে পালায় জঙ্গলে।

চতুর্থ পর্বে, পাগল বনওয়ারীকে কালীদহর ধার থেকে টেনে আনে। পরের দিন কালোশশীর দেহ ভেসে ওঠে। লেখক জানান,

"হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় পাপ আছে—পুণ্য আছে।
পাপপুণ্যের চেয়ে বিষয়বুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি বলাই ভালো।"

করালী আগা সাহেবকে ধমকায়। বাতাসের ঘূর্ণি দেখে বনওয়ারীর মনে হয়

কালোশশী নিমগাছে বাসা নিয়েছে। সে কালীর মাদুলি ধারণ করে। এ পর্বে দুটি মাত্র অধ্যায়।

পঞ্চম পর্বে, গাজনের ঢাক বাজা দিয়ে শুরু। করালী ঘর তুলতে গেলে বনওয়ারী বাধা দিলে থানায় নালিশ করে করালী ঘর তোলার অনুমতি পায়। বনওয়ারী এবারও চড়কপাটার শোয়। ঊনপঞ্চাশ সালের ঝড়বৃষ্টি এলো। সাপের কামড়ে মারা যায় পানার ছেলে। মনে হয়, এ বাবাঠাকুরের দণ্ড। মাথলার ছেলেও মরে সাপের কামড়ে। বাবুদের বিরুদ্ধে নালিশ করে করালী কাহারদের কেরোসিনের কার্ড জোগাড় করে। সুবাসীর সঙ্গে করালীর রঙ শুরু হয়। আর তাই নিয়ে বনওয়ারীর সঙ্গে করালীর মারামারি। করালী জিতে যায়। বনওয়ারী চায় করালীর ঘরে আগুন দিতে। পথে কথা শুনতে পেয়ে করালীও সুবাসীর মাথা পাথর দিয়ে ছেঁচে দিতে চায়। কিন্তু ওরা হুঁমহুমে পাখি। বনওয়ারীর মনে হয় ওরা কালো-শশী আর গোপালীবালা। ভয়ে হিম হয়ে যায়। জ্ঞান হারায়। এ পর্বে আটটি অধ্যায়।

শেষ পর্বে কোন অধ্যায় বিভাগ নেই। ষাট দিন বাদে রোগশয্যা থেকে বনওয়ারী উঠে বসে। তার বোধহয় না বাঁচলেই ভালো ছিলো। কারণ,

"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তার বেঁচে লাভ কি?"

কালারুদ্রের মন্দিরে বসেছে যুদ্ধের অফিস। তামাম বাঁশ যুদ্ধের বাজারে ঠিকেদাররা কিনে নিয়েছে। যুদ্ধ লেগেছে চারপাশের পৃথিবীতে। করালী এই বাঁশের সন্ধান দিয়েছে। সবাই অবাক হয়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় সব আছে কিন্তু যুদ্ধের কথা নতুন।

বাবাঠাকুরের থান নেই। বেলগাছ নেই, তালগাছের বেড় নেই। চন্দনপুর থেকে হাঁসুলী বাঁক পর্যন্ত পাকা রাস্তা করেছে। অনেক দুঃখে পাগল গান ধরে,

> হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায়?
> কোপাই নদীর জলে—কথা ভেসে যায়।
> বন্যা আসে।

'উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল' কিন্তু করালী বালিতে গাঁইতি চালায়। নতুন করে কাহার পাড়া গড়বে।

> "উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে
> দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।"

এখানে উপন্যাসের শেষে উপকথার সঙ্গে ইতিহাসের মিলন সূত্রটি লেখক গাঁথতে

চেয়েছেন। আজ তাই সে উপন্যাস শুরু হয়েছিলো উপকথার আবহ সৃষ্টি করে তা শেষ হয় ইতিহাসের ঘটনায়।

ঊনপঞ্চাশের ঝড়-বৃষ্টি প্রসঙ্গ, যুদ্ধের উড়োজাহাজ প্রসঙ্গ, যুদ্ধের সময়ের কেরাসিন প্রসঙ্গ, যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, ঠিকাদারদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া ও অরণ্য সম্পদ নষ্ট করা, বাঁশের খটাখট শব্দ ও যুদ্ধের চিত্ররূপ। দেবতার মন্দিরকে যুদ্ধের আপিস করা। পাকা রাস্তা তৈরি।মোটর গাড়ি গ্রামে ঢুকে পড়ে। বন্যা।

এসব ছাড়াও লেখক ইতিহাসের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন এখানে। "বন্যার কথা উপকথা নয়, ইতিহাসের কথা। ১৩৫০ ইংরিজি ১৯৪৩ সালের বন্যা। তেরশো পঞ্চাশের যে বন্যায় রেল লাইন ভেসে গেল, সেই বন্যা। ইতিহাসে আছে তার কথা।"

ফলে উপন্যাসে বক্তব্যের দিক দিয়ে বলা যায়, এ কাহিনী যেমন উপকথা তার আদিম সংস্কার দিয়ে শুরু তেমনি শেষের দিকে এসেছে বর্তমানের সঙ্গে তার বিরোধের চরমতম সত্যরূপ—ইতিহাসের ঘটনা যার চিহ্ন ধরে রেখেছে। কিন্তু বর্তমানের প্রতিভূ করালী সব উপকথা শেষ হলেও নতুন কাহিনীর সূত্রপাত ঘটাতে চায়।
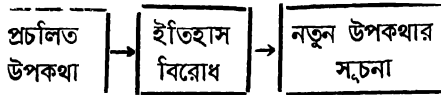
সংযোজন ঃ অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে কাহিনী এগিয়ে চলে। আর সেই কাহিনীর ধারায় অজস্র চরিত্র আসে আর যায়। তবুও বনোয়ারীর মত কেউ কেউ অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সুঁচাদের মতো বৃদ্ধা চোখ বিস্ফারিত করে সে কাহিনী বলে যায়।

আর এভাবেই চলে জীবনধারা। যা প্রকৃত ইতিহাস হয়ে যায়। এক অর্থে উপকথাও ইতিহাস। উপকথা আঞ্চলিক বৃত্তে আবদ্ধ ইতিহাস। আর তা ব্যাপ্ত হলে সার্বিক ইতিহাস হয়ে ওঠে। পরিণতির দিক থেকে এই কাহিনী প্রথমে আটকে ছিলো আঞ্চলিকতা ধর্মের বৃত্তে। পরে তা বৃহত্তর বৃত্তে প্রবাহিত হয়।
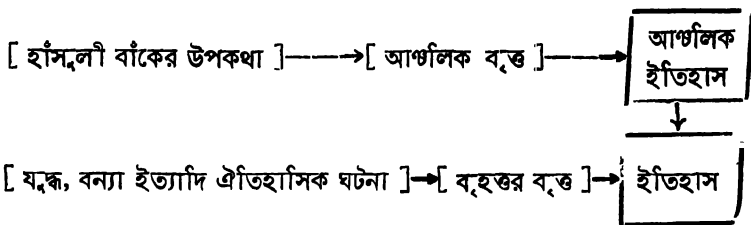
এখানে আঞ্চলিক বৃত্ত বৃহত্তর বৃত্তে বিলীন হয়েছে। সেকথা লেখকই নিজে বারবার বলেছেন। হাঁসুলী বাঁক ইতিহাসের গঙ্গায় মিশেছে এই কথা বলে। উপন্যাস শেষও হয়েছে সেই প্রসঙ্গ দিয়ে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : প্রবীণ নবীনের দ্বন্দ্ব

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' যখন লেখা হয় এবং প্রকাশিত হয় তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। অর্থাৎ স্বজাতির শাসন তখনও শুরু হয়নি। বিদেশী শাসনের কাল। উপন্যাসের পটভূমি যে কাল সীমা ধরে আছে সে কাল ভাবগত দিক দিয়ে আধুনিক স্বাজাত্যবোধ থেকে অনেক দূরে আবার বিদেশী ভাবধারার ধারে কাছেও নয়। সে-কাল পুরনো হিন্দু সমাজের সংস্কার-ধর্মবিশ্বাস-লৌকিক-অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের সামাজিক সম্পর্ক—আদিম বিশ্বাস-অবিশ্বাস সহজ যৌন সম্পর্ক—সরল জীবনরসে ভরপুর। এ-কাল স্বাধীনতার পরেও ছিল, এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন বড় শেকড়ের টানে বাঁধা। এবং এখনও।

তারাশঙ্কর কাল-সচেতন ঔপন্যাসিক। বিশেষতঃ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৪৬, গ্রন্থাকারে প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৪ (১৯৪৭)। উপন্যাসটির কায়া গড়ে উঠেছে দুকালের দ্বন্দ্বে—সেকাল ও একাল। সেকাল মানে অনেক পুরনো কাল; স্বাধীনতার অনেক পূর্বেকার কাল। ইংরেজ আমলেও এই 'সেকাল' বড় জীবন্ত ছিল। আধুনিক কালেও এই 'সেকাল' বিশেষ পরিচিত। একাল মানে ইংরেজ-প্রবর্তিত আধুনিক কাল। পুরনো সমাজ ভাঙার কাল, যন্ত্র-সভ্যতার সূচনাকাল। এদেশে একালের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হলেও যথার্থ বিকাশ এই শতাব্দীর (ঊনবিংশ শতাব্দীর) মধ্যভাগে। সেকাল ছিল গ্রাম্য হাঁটা পথে, একাল এল রেলপথে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় এই কাল-দ্বন্দ্ব চরিত্র ও কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছে। যে কাল প্রাচীন সে বড় আদিম—'হাঁসুলী বাঁকে বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকার বাসা বেঁধে থাকে। সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ধেয়ে ঘনিয়ে আসে সে, অন্ধকার বাঁশবন থেকে বসতির মধ্যে।' তারাশঙ্কর উপন্যাসটির কয়েক জায়গায় এই 'আদিম কালের অন্ধকারের' কথা বলেছেন। এই একটা কাল যেটা প্রবীণ। এই কালের বৃত্তে কাহারদের জীবন কেটেছে স্বাভাবিক ভাবে। এই জীবন চলে পায়ে হাঁটা পথে। 'হাঁসুলী বাঁকের এই জীবনই স্বাভাবিক জীবন। মন্থর গতিতে পায়ে হাঁটা আলপথে পদাতিকের জীবন তাদের।'

আর একটা কাল এল রেলপথ ধরে। সে-কাল নবীন। সে-কাল প্রবীণেরা দেখেছে কিন্তু গ্রহণ করেনি। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এই আল-পথ রেলপথের দ্বন্দ্ব। 'তখন ঐ রেল লাইন তৈরী হচ্ছে, দেশ দেশান্তর থেকে লোক এসে লাইন বসাচ্ছে, কোপাইয়ের উপরে পুল তৈরী করছে, সে যেন এক মস্ত ব্যাপার করে তুলেছে। হাঁসুলী বাঁকের মেয়েরা খাটতে যেত চন্ননপুরের বাবুদের বাড়িঘর তৈরির কাজে। রেল-লাইনের ঐ মস্ত ব্যাপারে যাওয়া ছিল তাদের বারণ। ওখানে গেলে জাত যায়—ধর্ম থাকে না। চাষ করে খায় যারা, তারা ওই কারখানার বাতাস গায়ে লাগাল তাদের মঙ্গল হয় না।' 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় এই নবীন প্রবীণ কালের মূলে আঘাত হেনেছে। সেই নিয়েই হানাহানি। প্রবীণ কাল দাঁড়িয়ে থাকে বিশ্বাসের ওপর। নবীন কাল গড়ে ওঠে অবিশ্বাসে ভর করে। উপন্যাসে কালচিত্রের সঙ্গে জীবনের চালচিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কাল যেন মহাকালের মতো। প্রবীণে তার সৃষ্টি, নবীনে তার ধ্বংসলীলা।

কালের মতো প্রকৃতিও জীবনসাক্ষী। শুধু সাক্ষী নয়, সে জীবন সংবদ্ধ। জীবনের ওপর তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া; জীবনের সঙ্গে তার সংগ্রামও। প্রবীণ মানুষ প্রকৃতি সংবদ্ধ। প্রকৃতির আদিমতা, কালের আদিমতার সঙ্গে জীবনের আদিমতার অচ্ছেদ্য মিল। তারাশঙ্কর উপন্যাসে এই সত্যটিকে অকৃত্রিমভাবে তুলে ধরেছেন। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় বাঁশবনের অন্ধকার রাজ্যময় ভিতরে বাইরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে—বাঁশবনের গোড়ায়, আদিমকাল থেকে ঝ'রে-পড়া পচা বাঁশ পাতার নীচে ঝোপঝাড়ের ঘন আবরণের মধ্যে বট গাছের কাণ্ডের গহ্বরে, কাহারপাড়া আটপৌরে পাড়ার ঘরের কোণ-কানাচে থেকে মানুষগুলির ঘরের কোণে পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।' বাঁশবাদি পাড়া এই বাঁশবন নিয়ে। কাহারদের জীবন যেন বাঁশগাছেরই মতো। এক জায়গায় অনেকের বাস। পুরনো বাঁশ দাঁড়িয়ে আছে, নবীন বাঁশের জন্ম হচ্ছে ঐ একই ভিত থেকে। পুরণো বাঁশের পাতা ঝরে পড়ছে, আবার নতুন পাতা গজাচ্ছে। এ যেন কাহারদের জীবনের বংশ রূপ।

কাল-বিরোধিতার মতো প্রকৃতি বিরোধিতাও যেন নবীনের ধর্ম। বাঁশবাদি গ্রাম প্রবীণে শ্যামল-কালো, নবীনে ধূসর। নবীন কাল এসে প্রকৃতিকে পাল্টে দিচ্ছে মানুষেরই মতো। উপন্যাসটির শেষদিকে বর্ণিত প্রকৃতি-চিত্র লক্ষ্য করি। 'হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাদির বাঁশবন নির্মূল হয়ে গিয়েছে। শুধু বাঁশবন নয়, বড় বড় বটগাছ অশ্বত্থ গাছ পর্যন্ত নাই।...আকাশের কোলে এতটুকু সবুজ নাই। এখানে ওখানে

রয়েছে শুধু দুটো চারটে শীর্ণাকার পল্লবহীন শিরিষ শ্যাওড়া বেলগাছ।' প্রকৃতির প্রবীণত্ব নবীনত্বের থেকে সুন্দর। অন্তত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়।

এই কাল ও প্রকৃতিকে ঘিরে যে মানুষগুলি তাদের জীবনকথাই হোল উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। এই কথা রূপকথা নয়, উপকথা। এই উপকথায় নরনারীদের দুটি দল—একদল প্রবীণ, অন্যদল নবীন। প্রবীণ পুরুষদের মাতব্বর বনওয়ারী, নবীনের নেতা করালী। প্রবীণদের জগদ্দল পাথর সুচাঁদ, নবীনদের মুক্ত বিহঙ্গ পাখী ও সুবাসী। তারাশঙ্কর চরিত্রগুলিকে সুচিন্তিতভাবে ভাগ করে নিয়েছেন। নাটকীয় পদ্ধতিতে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে উপন্যাসের কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন। লেখকের অভিজ্ঞতা অকৃত্রিম, চরিত্রগুলিও তাই অকৃত্রিম হয়েছে। চরিত্রগুলির ধাত ও রীত একটু আলাদা। চরিত্রগুলির টান মাটির দিকে, জমির দিকে। নদীর দিকে নয়। তাই একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক প্রতিবেশ চরিত্রগুলির চারদিক ঘিরে আছে। সে-ভূগোল রাঢ়ভূমি। 'হাঁসুলী বাঁকের দেশ আলাদা। (হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ) এ দেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি।' এই মাটিকেন্দ্রিক মানুষের প্রতিনিধি বনওয়ারী। সে প্রবীণের প্রতীক। সে মাটি আঁকড়ে বাঁচতে চায়। সে মাটির রুক্ষতায়-সজীবতায় জীবন গড়েছে। মাটি তার প্রাণ ও টান। বাঁশবাদি ও বনওয়ারী তাই অচ্ছেদ্য। গ্রামের সুখ-দুঃখের মাঝেই সে সজীব, সতেজ। দারিদ্র্য তাকে মাটি-বিমুখ করেনি। তার জোর এই মাটির সম্পর্কে। তাই অর্থনৈতিক উন্নতির হাতছানিতে সে সাড়া দিতে চায় না। তার জীবনবোধের বিচার অর্থনৈতিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। সে গোঁড়া গ্রাম্য মানুষ হতে পারে কিন্তু তার জীবন বড় শক্ত সত্য মূলে বাঁধা। অর্থনৈতিক লোভ এই সত্যকে টলাতে পারেনি। তাই সে বলিষ্ঠভাবে বলতে পেরেছে—'চন্নপুরের লাইনে যে যে খাটতে যাবে, তার ঠাঁই কাহারপাড়ায় হবে না। পিতিপুরুষে যা করে নাই, তা করতে নাই। ছত্রিশ জাতের কাণ্ড। পয়সা বেশির দিকে তাকালে হবে না। সে পয়সা থাকবে না। স্বভাব মন্দ হবে। এত বড় হাঁসুলীর মাঠে যার পেট ভরবে না, তার পেট অভর। পৃথিবীর কোথাও সে পেট ভরবে না। এই মাঠে বুক দিয়ে খাট, দুহাতে খাও।' এই ডাক নবীনের প্রতি প্রবীণের ডাক। এই ডাক গভীর সত্যমূল থেকে উদ্‌গত। উদ্বাস্তু জীবনের গভীরে এই সত্য নেই। সে জীবন সুযোগ-সন্ধানী, অশান্ত ; দৃঢ় সত্য সাধনায় সংযত নয়। জীবন সম্পর্কে বনওয়ারী মৌলবাদী। এখানেই চরিত্রটির শক্তি ও সৌন্দর্য।

অপর পক্ষে করালী নবীনের প্রতীক। যা কিছু পুরণো তাকে ভাঙো, জীবন

তৈরি করো নতুন যুগের হাওয়ায়। এই বিশ্বাস করালী চরিত্রের নিহিতার্থ সে ধর্ম মানে না, আচার মানে না, তার মাটির টান নেই। সে দুর্দাম, সে অস্থির। সে আনন্দ উচ্ছ্বাসে সর্বদা ভরতে চায়। সে চিন্তা করে না, বাধা মানে না। প্রবীণের বিরুদ্ধে তার তীব্র সংগ্রাম। রেলপথ ধরে যে নতুন জীবন আসছে করালী সে জীবনের প্রতি আকৃষ্ট। রেল লাইন ধরে যে নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসছে করালী তা উপলব্ধি করে। অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্য দিয়ে জীবনের আর একটা অর্থ খুঁজে পায় সে। সে লাইন ভালোবাসে, মাটি নয়। বাঁশবাদি তার কাছে একটা বদ্ধ স্থাবর জড়বস্তু। মাটির টানের থেকে নারীর দেহের টান তার কাছে বড়। করালী ভাগ্যবাদী নয়, জীবনবাদী। সে-জীবন পাপ-পুণ্যের বিচারে চলে না। চলে যুক্তির টানে, বাস্তব টানে। করালী অতীতের চেয়ে বর্তমানকে গুরুত্ব দেয়। তার জমির টান নেই। মাটির গন্ধ তাকে আপ্লুত করে না। সে ভিন্ন প্রকৃতির। কাহারপাড়ায় করালী যেন ভিনদেশী মানুষ। জাত এক হলে কি হয়, রীতিকরণ আলাদা বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে।' করালী নতুন কালের ইশারা অনুভব করেছে। সে অন্যান্য কাহারদের তুলনায় স্বতন্ত্র জীবন গড়তে চেয়েছে। কাহারপাড়ায় সেই প্রথম তুলল কোঠাঘর। এ ঘর তুলল বসবাসের জন্যে নয়। প্রবীণদের ঠোক্কর দেবার জন্যে। 'ঘর করাটা তো তার জেদ। কাহারপাড়ায় কোঠাঘর তোলা হ'ল, চিরকালের নিয়ম আচারে লাথি মারা হ'ল, হয়ে গেল কাজ। সে বাস করছে চন্নপুরের সেই পাকা খুপরি কোয়ার্টারে।' এই হচ্ছে করালীর জীবন-দর্শন। সে ভাঙতে যত ভালোবাসে, গড়তে তত নয়। আর কিছু গড়লেও স্থিত হতে তার মন চায় না সেখানে। সে বেগবান, আবেগের মাধুর্য তার কাছে গৌণ। তার লড়াই বনওয়ারীর সঙ্গে। সে মাতব্বরী মানে না। বিনত হওয়া তার ধর্মে নেই। সে নবীন মাতব্বর। এই প্রবীণ নবীনের দ্বন্দ্বে দুটি চরিত্রই অত্যন্ত সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু লড়াই বাঁধলেই আমাদের ফলাফল জানার আগ্রহ জন্মায়। কে জয়ী হোল? প্রবীণ বনওয়ারী না নবীন করালী? বাস্তব ঘটনাটুকু আগে দেখা যাক, তারপর মর্মকথা। 'কয়েক মুহূর্ত দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনের দিকে চেয়ে। বনওয়ারী যন্ত্রণায় কাতর। করালীরও অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা সামলে নিচ্ছে দুজনে। তারপর পরস্পরের দিকে ছুটে এলো বুনো শুয়োরের মত। প্রথমে ছুটল বনওয়ারী, সঙ্গে সঙ্গে করালী। দুই বীর হনুমানের মত পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রমণে জড়িয়ে ধ'রে পড়ল মাটিতে, ডুবে গেল গাছতলার সেই অন্ধকারের মধ্যে…হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের ছায়ায় একদিন যুদ্ধটা শুরু হয়েও

শেষ হয় নাই। আজ শেষ না করে ছাড়বে না বনওয়ারী ;' যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। বনওয়ারী মারা গেল এই যুদ্ধেরই ফলে। জয়ী হোল করালী, প্রবীণ গেল, নবীন এল। হাঁসুলী বাঁক তার সত্তা হারাল নবীন সভ্যতার বালুরাশিতে। বাঁশ বন নিশ্চিহ্ন হোল। মানুষগুলোও হোল উৎখাত। করালী কোথায় ? 'হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে।' করালীর এই মাটি খোঁজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। করালী মাটি খুঁজছে কেন ? তার মাটির কী প্রয়োজন ? সে তো কোনদিন মাটির টানে ছিল না। ছিল মাতব্বর বনওয়ারী। সে প্রবীণকে তো করালী শেষ করেছে। মাটি ও বনওয়ারীকে যদি সমধর্মী ভাবি তাহলে বালি ও করালীকে সমধর্মা ভাবা যায়। মাটির গুণ ও বালির গুণ এক নয়। বালি কাটলে বালির ধস নামে, মাটি কাটলে নয়। বালি কাটতে কাটতে করালীর জীবনেও যেন ধস নেমেছে। আগের উদ্যত স্বভাব যেন মাটির টানে নম্র হয়েছে। সে মাটি কাটছে না, খুঁজছে। এই একটি ক্রিয়াপদ করালীর চরিত্রের গভীর দিক উদ্ঘাটিত করছে। করালী হাঁসুলী বাঁকের মাটি ও মানুষ খুঁজছে। তাদের স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বালি সরিয়ে করালী বোধ হয় বনওয়ারীকে খুঁজছে—যে মাটিতে মিশে গেছে। প্রবীণের কাছে নবীনের এ এক আত্মসমর্পণ, কিছুটা তর্পণ ও বটে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের শেষাংশকে ঠিক মানতে পারেননি (দ্রঃ, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৭ম সং ১৯৮৪)। তিনি বলেছেন, 'শেষের দিকে করালীর মনে যে অতর্কিত অতীত-প্রীতির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা চরিত্র সঙ্গতি ও ঘটনা পরিণতির দিক দিয়া আকস্মিকতা-দুষ্ট মনে হয়। বনোয়ারির জীবনাদর্শের সঙ্গে তাহার যে দুস্তর ব্যবধান তাহা এরূপ সুলভ ভাবপরিবর্তনের দ্বারা সেতুবন্ধ হইবার নহে। মনে হয় এখানে লেখকের পক্ষপাত-মূলক ভাববিলাস তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও মানব-চরিত্র জ্ঞানকে অভিভূত করিয়াছে।' এই সমালোচনা দুজনের উদ্দেশে—এক, করালী, দুই, লেখক তারাশঙ্কর। আমরা একটু বিচার করি। এটা ঠিক, উপন্যাসের বৃহৎ অংশে বনওয়ারীর জীবনদর্শনের সঙ্গে করালীর জীবনদর্শনের মিল নেই। ছিল না বলেই সংঘাত। কিন্তু একটা জীবন যেখানে নেই ; যে জীবনকে করালী ধ্বংস করেছে, তার অনুপস্থিতিতে করালী কি কোনো শিক্ষা পেতে পারে না ? তার কি জীবনদর্শন কিছুটা পাল্টে যেতে পারে না চাপা দুঃখ-বেদনা—অভাববোধে ? মানুষের কি এমন হয় না ? দুর্দাম প্রকৃতির মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী আমাদের অজানা নয়। কি মধ্যযুগে, কি

আধুনিক যুগে। আসলে চরিত্রকে দেখতে হবে তার ঘটনার সামনে। করালীর চোখের সামনে একে একে হাঁসুলী বাঁকের সবকিছু নিশ্চিহ্ন হোল। তার বাল্য যৌবনের স্মৃতি মুছে যেতে লাগল। বাঁশবাদির বাঁশ এক এক করে কেটে ফেলা হোল। গ্রাম গেল, প্রকৃতি গেল, তাজা মানুষ বনওয়ারী গেল। রইল কী! বালি, এ বালি করালীকে গ্রাসাচ্ছাদন দেবে, অন্তরে আনন্দ দেবে কি? সে আনন্দকে করালী নিজেই মেরেছে। তাই স্মৃতিভারাক্রান্ত করালী সেই মৃত আনন্দকে খুঁজছে যে মাটিতে লগ্ন। এই বেদনাবোধের ইঙ্গিত চরিত্রটিকে পূর্ণতা দান করেছে—এ 'আকস্মিকতা দুষ্ট' নয়, চরিত্রের পূর্বাপর পরিণতি। সব হারালেই মানুষ বুঝতে পারে তার অতীতের মূল্য। এ মূল্য সর্বদা নবীন জীবন থেকে পাওয়া যায় না।

এই সূত্র ধরেই তারাশঙ্করকে বিচার করতে হবে। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তারাশঙ্করের শ্রদ্ধা তথা কিছুটা টান শুধু এই উপন্যাসে নয়, অন্যত্রও দেখেছি। তা বলে নতুন যুগকে তিনি উপেক্ষা করেননি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় দুটি সমাজ সামনে এসেছে। একটি পুরনো হিন্দু সমাজ, যাকে বলছি প্রবীণ, আর একটি আধুনিক হিন্দু সমাজ, যাকে বলছি নবীন। পুরনো সমাজ সমাজ ছিল ধর্মের বন্ধনে, খানিকটা কুসংস্কারের গণ্ডিতে, বিশ্বাসের ভিত্তিতে, আচার-অনুষ্ঠানের প্রাত্যহিকতা, লৌকিক-অলৌকিকতার মেল বন্ধনে। সে-সমাজে দেবতার ভয় ছিল বিশ্বাসের গোঁড়ামি ছিল, শাপ-শাপান্ত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, এবং সকলের সুখেদুঃখে ভাগী হওয়া। এই ভালো-মন্দ মিশিয়ে এক প্রবীণ সমাজ বাঁশবাদির গ্রামে কাহারপাড়ায় দেখছি। এই সমাজ সংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু জীবনবিমুখ নয়। এই সমাজে অপদেবতার ভয় আছে, আবার দেশ ও মানুষের প্রতি তীব্র টান আছে। এ সমাজ শিক্ষাদীক্ষাহীন, কিন্তু অ-জ্ঞানী নয়। তীব্র দারিদ্র্য আছে, আবার নাচগানও আছে। জীবন সর্বদা গদ্যময় নয়। প্রেম নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলা আছে, কিন্তু প্রেমের জন্যে ত্যাগও আছে। চুরি আছে, আবার পবিত্র সততা আছে। জাতপাতের বিচার আছে, আবার উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আছে। বিদ্বেষ ও ঘৃণা সমাজকে তেমন কলুষিত করেনি। উচ্চবর্ণের মানুষরাও অভাব অনটনে নিম্নবর্ণের মানুষদের দেখত। নিম্ন-বর্ণের যুবতীরা প্রেমের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের বাবুদের সাহচর্য লাভ করত। এ নিয়ে নিম্নবর্ণের সমাজ তেমন কিছু মনে করত না। প্রাচীনারা হয়ত একটু রঙ্গব্যঙ্গ করত এইমাত্র। সমাজ অচল ছিল। জীবন সচল ছিল। তাজা জীবন।

নতুন সমাজ এল কাহারদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে নয়। করালীর বলিষ্ঠ

উপলব্ধিতে। সে প্রায়শ অবিশ্বাসী, তাই বিশ্বাসীদের কাছে নতুন। সে পুরনো সমাজকে আঘাত করতে লাগল। অলৌকিকতাকে অস্বীকার করতে লাগল। এক নবীন সমাজ গড়ে উঠল নতুন যুগের হাওয়ায়। সে হাওয়ায় পতাকা উড়ল করালীর। হাঁসুলী বাঁকে এই প্রবীণ-নবীন সমাজের দ্বন্দ্ব। নতুন পরিবর্তন হাঁসুলী বাঁকের ভূগোল দিল পাল্টে। মানুষের মনও কিছুটা—বিশেষত করালীর। কিন্তু করালী কি পুরনো কাহার সমাজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পেরেছে। কাহার সমাজে নেতা বদল হোল। নতুন রঙ হয়ত পুরণোকে একটু চাপা দিয়ে দিল। কিন্তু বালির নীচে আবার সেই বাঁশ জাগছে। নসুর উক্তিতে তারাশঙ্কর সেই সত্যকে জাগিয়ে তুললেন, 'আমি কি দেখে এলাম জান। দেখে এলাম, বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া (অর্থঃ নতুন বাঁশ) বেরিয়েছে।' এই বাঁশ নবীন কিন্তু প্রবীণও। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, শিশু যেমন নবীন তেমনি প্রবীণ। এই বাঁশের কোঁড়াও তাই। আধুনিকতা অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে পারে না। অতীত ঐতিহ্যপ্রীতি এক ধরনের নবীনত্ব। এটা বাস্তব সত্য। একে 'লেখকের পক্ষপাতমূলক ভাববিলাস' বলা যায় না। লেখকের লোকচরিত্রজ্ঞানের এ এক দুর্লভ স্বাক্ষর। প্রবীণ সমাজ ও বনওয়ারীর প্রতি লেখকের যে সামান্য আকর্ষণ তাকে পক্ষপাতিত্ব বলা যায় না। এটাই উপন্যাসের স্বাভাবিক পরিণতি। করালী জীবন দেখেছে, নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছে, কিন্তু মাটি পায়নি। বনওয়ারী জীবন ও মাটি—দুই-ই পেয়েছিল। করালী তাই মাটি খুঁজছে, জীবন নয়। সে জীবনে স্থিত, মাটির আকাঙ্ক্ষায় অস্থির। বনওয়ারী এখানেই তাকে টানছে। করালী বোধ হয় সে-টান অনুভব করেছে। বাস্তব বালির স্তূপের নীচে তার স্বপ্নের মাটি। এই মাটির টান 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র আদি কথা ও শেষ কথা। এবং তারাশঙ্করেরও।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সঙ্গীত প্রয়োগ তাৎপর্য

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

নাটকে সঙ্গীত ব্যবহার সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠলেও উপন্যাসে সঙ্গীত ব্যবহার সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সঙ্গীত নাটকের অন্যতম উপাদান, একথা প্রমাণিত হয়ে যায় গ্রীক নাটকের রূপ থেকে। অবশ্য নাটকে ব্যক্তি রূপ পরিগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গীত গৌণ হয়ে পড়ে এবং সংলাপের প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেব উপযোগিতা প্রায় শূন্য হয়ে যায়। কেউ কেউ এমনও ভাবতে শুরু করেন যে, নাটকে সঙ্গীত থাকলেই তা মেলোড্রামা হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধারণা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণিত হয়ে যায় বিভিন্ন বাংলা নাটকে গানের ব্যবহারে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের নাটকে—বিশেষত রূপক সাংকেতিক নাটকে গানের ব্যবহারে। নাটকে সঙ্গীত ব্যবহাব সম্পর্কে তত্ত্ব গড়ে উঠলেও উপন্যাসে সঙ্গীত ব্যবহার করা উচিত না অনুচিত এ সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে সম্ভবত আমাদের সামনে উপস্থিত হয় নি। উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে লক্ষ্য করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, গানের ব্যবহার আছে। তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি উপন্যাসে গানের ব্যবহার আছে। অবশ্য 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে গান অনুল্লেখ্য উপাদান না হলেও 'আনন্দমঠে' গান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের গান মূলত দেবেন্দ্র-হীরা উপকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত এবং সে গানে তরলতা ও হাস্য যত বেশি ততখানি প্রবৃত্তির সুবৃত্তির আলোড়ন ও ট্র্যাজিক আর্তনাদ নেই। হীরার গানে স্বৈরিনীসুলভ চটুলতা আছে, যদিও তার কণ্ঠে গীত জয়দেবের দুটি পদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে প্রণয়বিহ্বল দিনগুলি স্মৃতি দীর্ণ করে একটি হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে গান শোনাতে চান নি। তার মনে একটা ভাবাবেগের, সুরঝংকারের উন্মাদনা আনতে চেয়েছেন। জাতীয় মন্ত্রে পাঠকের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করা বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল। গানের ব্যবহার সেদিক থেকে তাঁকে সাহায্য করেছে।"[১] 'মৃণালিনী' রচনার কাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র গানের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত সংযতচিত্ত নাট্যকারের ন্যায় উপন্যাসে সঙ্গীতের প্রয়োগ করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে গানের ব্যবহার একটা রীতিমত শিল্প-বৈশিষ্ট্য। অনেক বইয়ে তিনি গানকে কাজে লাগিয়েছেন

ভাবসঞ্চারণের একটি নতুন যোগসূত্ররূপে, পাঠক ও পাত্রপাত্রীর মধ্যে হৃদয়সংযোগের একটি অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে"।[২] উপন্যাসে সঙ্গীতের ব্যবহারে বা কবিতার ব্যবহারে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা কতটা তা আলোচনার বিষয়। নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারে নাট্যকারের যে স্বাধীনতা তা কী ঔপন্যাসিকের থাকবে, না থাকবে না ?

"উপন্যাসের সঙ্গে গদ্যভাষার হরগৌরী সম্পর্ক। উপন্যাসের সঙ্গে গদ্যভাষার যোগ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু উপন্যাস ও গদ্য পরস্পর একাত্ম হ'লেও উপন্যাসের গদ্যভাষায় কাব্যের আমেজ সৃষ্টি করা যায় না, অথবা যদিও করা যায় তা সর্বত্র নিন্দনীয় এমন উক্তি করা অনুচিত। উপন্যাসের গদ্য অবয়বে মাঝে মাঝে কাব্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে উপন্যাসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা চলে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'র নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন 'গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্য ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে।' অর্থাৎ উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার বক্তব্য বিষয়কে আরও মনোগ্রাহী ও প্রাঞ্জল করে তোলে। উপন্যাস তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শব্দরীতি গ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন এই রীতি গদ্যধর্মী না কাব্যধর্মী সম্ভবত এটা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মহৎ ঔপন্যাসিক বা মহৎ কবি যে কোনো মাধ্যমের দ্বারা বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। উপন্যাসের আবেগের বেগকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাব্যভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা'র আখ্যানবস্তুতে চরিত্রগত বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য কবিতার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কি তবে কবিতা ব্যবহারের দ্বারা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত গদ্য বক্তব্যের কাব্য-ভাষ্য রচনা করতে চেয়েছেন ? সম্ভবত উত্তর অস্ত্যর্থক। এছাড়াও রোমান্টিক তরুণ প্রাণের আবেগ প্রকাশের জন্য তিনি কবিতার ব্যবহার করেছেন।"[৩] কেননা, "শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশী প্রকাশ করে। এই বেশীটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি, শুনছি তার সঙ্গে অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই বলি রস। অর্থাৎ যে জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না।······আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে······এই জন্য বাক্য যখন আমাদের অনুভূতি লোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে

তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।"[৪]

উপন্যাসে কবিতা ও সঙ্গীত ব্যবহার আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণত ভিন্ন না হলেও গভীর ভাবে আলোচনায় দেখা যাবে যে, উভয়ের উদ্দেশ্য এক হলেও উপস্থাপনায় এরা ভিন্নতর। কেননা, সঙ্গীতে সুরের যে মুখ্য ভূমিকা আছে কবিতায় তা দুর্লভ। উপন্যাসে কবিতা ও সঙ্গীতের ব্যবহার চিত্রধর্মিতায় প্রায় সমস্তরের হলেও সুরগত বক্তব্যধর্মিতায় এক নয়। প্রসঙ্গত, নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারে নাট্যকারের স্বাধীনতা, প্রয়োগধর্মিতা, উপস্থাপনাগত কৌশল ইত্যাদি প্রসঙ্গও আলোচিত হওয়া উচিত। "নাটকের পাত্রপাত্রী গান গাইতে পারে। গানের ভাষা ও সুর পাঠকের মনে এবং তার সঙ্গে গাইবার রীতি দর্শকের মনে সাধারণ যে প্রতিক্রিয়া জাগায় সেটুকু নিয়েই নাট্যকারকে কাজ চালাতে হয়। আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় আলোক সম্পাত ঘটিত কিছু কলাকৌশলের দ্বারা গানের সময়ে অতিরিক্ত ফললাভের চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু ঔপন্যাসিককে নাট্যরীতির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এমন দাবী চলতে পারে না। কোনো ব্যক্তির মুখে গানের ভাষা না দিয়ে শুধু তার ব্যাখ্যা বা প্রাসঙ্গিক বর্ণনামূলক উপস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীর হৃদয়তন্ত্রীর অনুরণনটি ঔপন্যাসিক ধরে নিতে পারেন। নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। যেমন আধুনিক চলচ্চিত্র পরিচালক গানের 'চিত্র' রচনা করতে গিয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে গানের ভাব ও ভাবাসঙ্গ তথা মানসপ্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হন, গায়কের অবস্থানের সীমা ছাড়িয়ে যান, শ্রোতার মুখাবয়বের সংকেতরেখা ধরতে চান, অথবা প্রতীক দ্যোতনার সাহায্য নেন—ঔপন্যাসিকও তেমনি নিজস্ব শিল্পরীতিতে, অর্থাৎ ভাষায় বর্ণনায় ঘটনার বিবরণে গানের সুর ভাব-তাৎপর্যকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন।"[৫] উল্লিখিত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উপন্যাসে সঙ্গীত ত্যজ্য নয়; এবং তার যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা উপন্যাস নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হতে পারে। উপন্যাসে সঙ্গীত ব্যবহারে চরিত্র প্রকাশের যেমন অন্যতম বাহন, তেমনি আঞ্চলিক ও লৌকিক তথ্য সংবাহকের ভূমিকাও তার করায়ত্ত। ঘটনাসর্বস্বতা, বিবৃতিধর্মিতা সঙ্গীত ব্যবহারে নতুন মাত্রা পায়। উপন্যাসে সঙ্গীতের ভূমিকা অগৌণ না গৌণ তা নির্ভর করবে ঔপন্যাসিকের সঙ্গীত ব্যবহারের প্রবণতার উপর। চলচ্চিত্রের ভাষা রূপায়ণে সঙ্গীতের ভূমিকা যদিও আবশ্যিক নয়, সুরের মায়াজাল যদি বাণীর মাধ্যমে রূপায়ণ লাভ করে, পাঠককে আবিষ্ট ও মন্ত্রমুগ্ধ করে তবে কাহিনীকথনের জীবনাসক্তিকে রূপায়িত করার জন্য, উপন্যাসের গদ্যভাষার মনোধর্মিতাকে আরও ব্যঞ্জনাময় অথবা

স্পষ্ট করার জন্য উপন্যাসে সঙ্গীত ব্যবহার ত্যজ্য নয়, বরং উপস্থাপনার বা প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্ব বহন করে।

এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে সঙ্গীত প্রয়োগের সার্থকতা / ব্যর্থতা আলোচনা করা হবে। তবে তার আগে আমরা উপন্যাসের মূল বৃত্তে প্রবেশ করতে চাই। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী কাহার জীবনকে কেন্দ্র করে হলেও ঔপন্যাসিক এখানে কালের পরিবর্তনের এক ইতিহাসকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। সমালোচ্য উপন্যাসে নদীর বাঁকে বাঁশবাদী গ্রামের কাহারকুলের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে লেখক দেশ-কালে সমাজ ইতিহাসের বিবরণ তুলে ধরেছেন। কাহারকুলের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে যে লৌকিক সমাজ মানসের প্রকাশ বিশিষ্ট এই নরগোষ্ঠীর মানুষের জীবনে, কালক্রমে নতুন ভাবনা-চিন্তার দূতরূপে সেই কাহার-কুলেরই এক সন্তান করালী তাতে অবিশ্বাসের প্রথম প্রকাশ ঘটাল। লৌকিক বিশ্বাসে 'কর্তাবাবা' ও 'কালারুদ্দুরে'র প্রতি আত্মসমর্পণের যে আকাঙ্ক্ষা কাহার সমাজে লালিত হয় কাহার সমাজে, করালীর কাজের মধ্য দিয়ে সেই আবহমান কাল প্রচলিত বিশ্বাসকেন্দ্রিক জীবনধারায় আঘাত লাগলো। সমাজপতি বনওয়ারীর নির্দেশ উপেক্ষা, কত্তার থানের চিত্র-বিচিত্র চন্দ্রবোড়াকে বাঁশবনে আগুন দিয়ে হত্যা, পাখিকে নিয়ে করালীর পলায়ন, বিবাহ, বনওয়ারী করালীর সংঘর্ষ, পাখির আত্মঘাতিনী হওয়া—ইত্যাদি কাহিনী অংশের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কালোশশী বনওয়ারীর প্রেম, পরমের কাহিনী, অন্ত্যজশ্রেণীর পাশাপাশি বিত্তবান শ্রেণীর আবির্ভাব, সুচাঁদের ভূমিকা ইত্যাদি কাহিনীকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। কিন্তু ঘটনার অন্তরালে তারাশঙ্কর ইতিহাসের যে নির্মম সত্য, অমোঘ নিয়তিকে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তা হলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন, কাহারকুলের জীবনে নতুন যুগের নায়ক রূপে করালীর আবির্ভাব ও তাদের জীবনে পরিবর্তনের গতিসঞ্চার। বিচিত্র জীবনের পরিচিতির সঙ্গে এ উপন্যাসে আছে ব্যক্তিমানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি। ফলে চরিত্রের মুখে এসেছে গানের আবেগ। আলোচ্য উপন্যাসে লোকজ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত লৌকিক উপাদান সমূহ যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি আছে অতি প্রাকৃতের ঘনকুহেলিকামণ্ডিত আখ্যান এবং সমকালীন ইতিহাসবৃত্তের সম্পূরক অর্থনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রী ভূমিকাও এখানে অনুপস্থিত নয়। "হাঁসুলী বাঁকের বিশেষত্ব, এখানে তারাশঙ্করীয় সমস্ত বৈশিষ্ট্য

ও উপকরণের ব্যবহার হয়েছে। নিষ্ঠুর ও সুন্দর কাব্য, চরম, ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রকাশ, আঞ্চলিক ভাষা ও মানুষের নিখুঁত রূপায়ণ, চরিত্রচিত্রণ ও রসপরিবেশন, মধ্যে মধ্যে গ্রন্থিত ছড়া, ভাদুগান, ঘেটুগান, পাঁচালী, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি উজ্জ্বল করে তুলেছে বক্তব্য। আর ধৃত হয়েছে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও পর্ব দিন।"[৬] এই বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সঙ্গীত প্রয়োগ সার্থকতার আলোচনা করতে হবে। অবশ্য একথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ্য, "কাহিনীর মধ্যে কাহারদের ব্যবহৃত মৌখিক শব্দে ঘন ঘন উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার, প্রচুর ছড়া ও প্রবচনের উল্লেখ ও সমগ্রভাবে রচনাটির পেছনে একটি বিশিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস উপন্যাসটিতে কিছু পরিমাণে অস্বাচ্ছন্দ্য ও জড়তার সংক্রমণ ঘটিয়েছে।"[৭] উপন্যাসে সঙ্গীত প্রয়োগগত সার্থকতা সম্বন্ধেও এ অভিযোগ আনীত হতে পারে।

॥ ২ ॥

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে মোট ছটি পর্ব, তবে শেষ পর্বটিকে তারাশঙ্কর সংখ্যাক্রমে নির্দেশ না করে 'শেষ পর্ব' বলেছেন। প্রত্যেক পর্বে আবার কয়েকটি অধ্যায়, তাও সংখ্যাক্রমে চিহ্নিত। যেমন—প্রথম পর্বে পাঁচটি অধ্যায়/উপ-পর্ব; দ্বিতীয় পর্বে নটি অধ্যায়/উপপর্ব; তৃতীয় পর্বে পাঁচটি অধ্যায়/উপপর্ব; চতুর্থ পর্বে দুটি অধ্যায়/উপপর্ব; পঞ্চম পর্বে আটটি অধ্যায়/উপপর্ব; শেষ পর্বে কোনো উপপর্ব বিভাগ নেই। এ উপন্যাসে নানা জাতীয় গান আছে। কোনো গান স্বয়ংসম্পূর্ণ আবার কোথাও একটি গান ভেঙে ভেঙে গাওয়া হয়েছে। নসুবালা ও পাগল নানা ধরনের গান গেয়েছে ও ছড়া বলেছে। নসুবালার গানে মেয়েলিভাব বেশি। গানে নানা পৌরাণিক কাহিনীর প্রয়োপ আছে, গাজন, ঘেঁটুগান, নবান্ন, ভাদু, ভাঁজো পরব প্রভৃতি উৎসবের গানও আছে। কোনো কোনো গানে সমকালীন জীবনের চিত্রও আছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে প্রযুক্ত গানের একটি সারণী প্রস্তুত করা যেতে পারে—

॥ সারণী ক ॥

পর্ব	উপপর্ব	কোন পর্বে গান আছে		প্রযুক্ত সঙ্গীত / গান [প্রথম ছত্র]
১	১—৫	×		×
২	১—৯	উপপর্ব	৪	১. সায়েব লেগেছে লড়াই
				২. তাই ঘুনাঘুন—বাজলো নাগরী
		,,	৫	১. হায় কলিকালে, কতই দেখালে
		,,	৬	১. চোখের জলে নরম হল মাটি
৩	১—৫	,,	২	১. লষ্ট চাঁদের ভয় কি লো সই
				২. শ্যামকলঙ্কের বালাই লয়ে
				৩. পেমে পাগল হলাম আমি
		,,	৩	১. মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে
				২. ও সায়েব আপ্তা বাঁধালে
				৩. লালমুখো সাহেব এল
				৪, জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
		,,	৪	×
		,,	৫	১, সরাসরি ভাল পথে
				২, আমার মনের অঙের ছটা
৪	১—২	,,	১	×
		,,	২	১. হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী যাই বলিহারী
				২, অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে
৫	১—৮	,,	১	১, ভাইরে ! অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে
				২, হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী, যাই বলিহারি
				৩, সুবাসী লতার ফুল পরিবে কানে
				৪, ‘ল’—লাড়লাম—‘ল’ চাড়লাম
				৫, ও লবানের লতুন ধানের পিঠে
				৬, নতুন কাপড় খসখসিয়ে বউরা এসেছে
		,,	২	×

পর্ব	উপপর্ব	কোন পর্বে গান আছে	প্রযুক্ত সঙ্গীত / গান [প্রথম ছত্র]
		,, ৩	১. মন চাহে যাও হে তুমি
		,, ৪	×
		,, ৫	১. কোন ঘাটেতে লাগায়েছ
			২. ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
			৩. সে অঙ আমার ভেসে গেল
		,, ৬, ৭, ৮	×
৬	×	×	১. হাঁসুলী বাঁকেব কথা—বলব কারে হায়
			২. যে বাঁশেতে লাঠি হয়
			৩. বেলতলায় বাবাঠাকুর
			৪. জল ফেলিতে নাই চোখে
			৫. যে গড়ে সেই ভাঙে রে
			৬. তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী

সারণী ক-তে এত গানেব উল্লেখ দেখে মনে হতে পারে যে, ঔপন্যাসিক সমালোচ্য উপন্যাসে অনেক গান ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা যথাযথ নয়; কেননা, এখানে অনেকগুলি গানই ভেঙে ভেঙে ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি বাদ দিলে অধিকাংশ সঙ্গীতই পূর্ণাঙ্গ নয়।

সারণী খ-তে দেখা যাক্ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কোন্ কোন্ চরিত্র গান গেয়েছে, আর রচয়িতা কে / কাবা ?

॥ **সারণী খ** ॥

গান	প্রকৃতি	রচয়িতা	গায়ক
১. সাহেব লেগেছে লড়াই	১. ঘেঁটু	১. মুকুন্দ ময়রা	১. করালীর দল
২. তাই ঘুনাঘুন—বাজলো নাগরী	২. ঝুমুর	২. বনওয়ারী	২. কাহার পাড়ার দল
৩. হায় কলিকালে কতই দেখালে	৩. ঘেঁটু	৩. আটপৌরে পাড়া	৩. আটপৌরে পাড়ার দল
৪. চোখের জলে নরম হল মাটি	৪. ×	৪.	৩. নসুবালা
৫. লণ্টচাঁদের ভয় কি লো সই	৫. ঝুমুর	৫.	৫. ,,
৬. শ্যামকলঙ্কের বালাই লয়ে	৬. ,,	৬.	৬. পাগল

গান	প্রকৃতি	রচয়িতা	গায়ক
৭. পেমে লগল হলাম আমি	৭. ঝুমুর	৭.	৭. পাগল
৮. মন হারিয়ে গিয়েছিলাম	৮. ,,	৮.	৮. ,,
৯. ও সাহেব আস্তা বাঁধালে	৯. ঘেঁটু	৯. পাগল	৯. ,,
১০. লালমুখো সাহেব এল	১০. ,,	১০. ,,	১০. ,,
১১. জাতি যায় ধরম যায়	১১. ,,	১১.	১১. ,,
১২. সরাসরি ভাল পথে	১২. লোক সঙ্গীত	১২.	১২. ,,
১৩. আমার মনের অঙের ছটা	১৩. ,,	১৩. অজ্ঞাত	১৩. কালো বউ
১৪. হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী	১৪. ছড়া পাঁচালী	১৪. পাগল	১৪. পাগল
১৫. অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে	১৫. লোক সঙ্গীত (বাউলা ভাবনার)	১৫. ,,	১৫. পাগল
১৬. ভাইরে ! অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে	১৬. ,,	১৬.	১৬. পাগল
১৭. হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী	১৭. ছড়া পাঁচালী	১৭. পাগল	১৭. ,,
১৮. সুবাসী লতার ফুল পরিবে	১৮. ,,	১৮.	১৮. ,,
১৯. ল লাড়লাম—ল চাড়লাম	১৯. নবান্নের ছড়া	১৯.	১৯.
২০. ও লবানের লতুন ধানের পিঠে	২০. নবান্নের গান	২০.	২০. পাগল
২১. মন চাহে যাও হে তুমি	২১. পুরাতন গান	২১.	২১. ,,
২২. কোন ঘাটেতে লাগায়েছ	২২. ভাঁজো	২২.	২২. বুড়ো-ছোকরার দল
২৩. ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা	২৩. ,,	২৩.	২৩. সমবেত

গান	প্রকৃতি	রচয়িতা	গায়ক
২৪. সে অশু আমার ভেসে গেল	২৪. লোক সঙ্গীত	২৪.	২৪. পাগল
২৫. হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব	২৫. ছড়া পাঁচালী	২৫. পাগল	২৫. ,,
২৬. যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই	২৬. ,,	২৬. ,,	২৬. ,,
২৭. বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার কুলের পিতা	২৭. ,,	২৭. ,,	২৭. নসুবালা
২৮. জল ফেলিতে নাই চোখে	২৮. লোক সঙ্গীত	২৮. ,,	২৮. পাগল
২৯. যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে	২৯. ,,	২৯. ,,	২৯. ,,
৩০. তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী	৩০. ঝুমুর	৩০. বনওরারী	৩০. নসুবালা

সারণী 'খ' থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উপন্যাসের অধিকাংশ গানই ঘেঁটু, ছড়া-পাঁচালী, নবান্ন, ভাজো, ভাদু ইত্যাদি লোকগীতির প্যাটার্নে রচিত ও সুর গেয়। সম্ভবত অনেকগুলি গানই ঐ অঞ্চলের এবং তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানা। তিনি প্রয়োজন মতো এগুলিকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন চরিত্রের মনের কথা অথবা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য এবং 'সিচুয়েশন' সৃষ্টির জন্য অথবা বিবৃতিধর্মিতায় নাটকীয়তা আনার জন্য। আর একটা বিষয়ও লক্ষ্যগোচর; আর তা হলো 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বেশির ভাগ গানই গেয়েছে পাগল। "পাগলের উদাসীন সংসার নির্লিপ্ততা ও স্বতঃস্ফূর্ত কবিমনের বিকাশ যেন একই গভীরস্তরশায়ী জীবনরস প্রবাহের উপর বিভিন্ন রং-এর বুদ্‌বুদ্‌ লীলা।"[৮]

॥ ৩ ॥

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র প্রথম গান যুদ্ধকেন্দ্রিক গান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যে অশনি সংকেত তাবৎ পৃথিবী জুড়ে পরিবর্তমানতার ইঙ্গিত এনেছিল তার ইঙ্গিত এখানে আছে। তবে মহাযুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের যে লাভ হয় না, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় এমন চিন্তাই আলোচ্য গানে প্রকাশিত। উপন্যাসের বিদ্রোহী নায়ক করালী যে চন্দনপুরে থাকে, সেখানে যুদ্ধের খবর আসে। সেই যুদ্ধে গ্রামের সাধারণ মানুষের যে সর্বনাশ নেমে আসছে এই কথাই ব্যক্ত হয় প্রথম সঙ্গীতটিতে—ঔপন্যাসিক

যেকথা গদ্য ভাষায় বর্ণনা করেন—"আজব কাণ্ড এই যুদ্ধে ! অবাক রে বাবা ! কোথা কোন্ 'দ্যাশে' সাত সমুদ্দুর তেরো 'লদী' পারে কে করছে কার সঙ্গে যুদ্ধ, এখানে চড়বে ধানের দর, চালের দর, আলু, গুড়, কলাই-তরিতরকারীর দর।··কাপড়ের দর চড়বে।" [পৃঃ ১৪] তবে কাহারপাড়ায় যারা বাস করে তারা হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের ছায়ায় ঘেরা জগতে বাস করে বলে তারা এর কোনো খোঁজ রাখে না বা রাখতে চায় না। এই নতুন ভাবনার গানকে কাহারদের প্রধান বনওয়ারী মানতে চায় না বলে সে তাদের পুরাতন গানকেই যথাযথ মনে করে—'তাই ঘুনাঘুন-বাজলো নাগরী'—ঘেঁটু গানের পালায় ঝুমুর দলের মেয়েরা এই গান গাইতো। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনোদ্যতা রাধার কণ্ঠনিঃসৃত এই গান—'ননদিনীর শাসনে—চরণের নূপুর থামিতে চায় না / ঘরে থাকিতে মনো চায় না।' তৃতীয় সঙ্গীতে আটপৌরেদের ঘেঁটু গানের লহর ছুটেছে। এখানে করালী ও বনওয়ারীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। গানের প্রথমাংশে কত্তাবাবার বাহনকে পুড়িয়ে মারার জন্য করালীর উপর অভিশাপ নেমে আসার কথা বলা হয়েছে—'হায় কলিকালে, কতই দেখালে / দেবতার বাহন পুড়ে মল অকালে, তাও মারলে রাখালে / ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর / অতি বড় বাড়িল যারা তাদের ভেঙে পড়ো।" দ্বিতীয়াংশে বনওয়ারীর সঙ্গে কালোশশীর অবৈধ সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কালোশশীর মদির লালসা-ময় মোহবিহ্বলতা ও বনওয়ারীর ক্ষণিক অসংযম এই গানে ধিকৃত হয়েছে। কালো-শশীর নেশার ঘোর কাটাতে পারেনি বলে কাহারপাড়ার মাতব্বরের হাত-পা এই গান শুনে অসাড় হয়ে যায়। করালী আর পাখির প্রেম চতুর্থ সঙ্গীতের কেন্দ্রে বিরাজিত। পাখি নির্জীব নয়ানকে ছেড়ে দিয়ে করালীর আহ্বানে সাড়া দিলে নসুবালা গেয়ে উঠেছে—'চোখের জলে নরম হল মাটি / সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিত।' [অবশ্য এটি প্রবাদ প্রবচনও হতে পারে এবং সেটি গানের রীতিতে পরিবেশিত হয়েছে।] পাখি সুচাঁদকে শনের নুড়ির মত চুল কেটে ফেলতে বললে সুচাঁদ প্রতিবাদ করে। তখন পাখি তাকে হাতে আয়না নিয়ে দেখতে বলে। সুচাঁদ হাতে আয়না নিলে কলঙ্ক হবে জানায় ; বুড়ো বয়সে কলঙ্কের কথা শুনে মেয়েরা হেসে ভেঙে পড়লে নসুবালা গান ধরে—'লষ্টচাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে।' [লষ্টচাঁদ অর্থাৎ নষ্টচন্দ্র] নসুবালার গান শেষ হলে পাগলের গলায় গান ওঠে—'শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে ঝাপ দিব সই কালীদহে।' এটি ঝুমুর শ্রেণীর গান। রাধার জবানীতে পাগল গেয়েছে। শ্যামকলঙ্কের বালাই নিয়ে রাধা কালীদহে ঝাঁপ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'পেমে পাগল হলাম আমি' গানটিও

পাগলের গাওয়া ; এটিও ঝুমুর জাতীয় গান। এখানে লক্ষ্য হলো পাখির প্রতি করালীর প্রেম যা এখনো পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নি। করালীর মানসিকতা এই গানে প্রকাশিত, সে পাখির প্রতি প্রেমে পাগল অথচ তা পূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পাচ্ছে না। ঝিঙে ফুল ফোটা হলো প্রেমিক-প্রেমিকার বিয়ের উপযুক্ত লগ্ন সৃষ্টি হওয়া। 'সনজে' অর্থাৎ সন্ধ্যে হলো কিন্তু ঝিঙে ফুল ফুটে প্রেমকে পূর্ণতা প্রদান করছে না। পাগলের এ গানে করালীর মনের আক্ষেপজনিত বেদনার্তি প্রকাশিত। এর পরে পাগল মজলিসে গেয়েছে—'মন হারিয়ে গিয়েছিলাম বোপাই নদীর তীরে হে'। এটি ঝুমুর শ্রেণীর গান। কিন্তু এ গানে কেউ পাগলকে বাহবা দেয়নি। কেননা, এর আগে হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকারে প্রদীপ নিভে যাওয়া তমসায় মদের নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারী আর কালোশশী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়, পাগল বনওয়ারীর সেই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে আলোচ্য গানের মধ্য দিয়ে। বনওয়ারীর পক্ষে কাহারদের মাতব্বর হয়ে কালোশশীর সঙ্গে এই মেলামেশা ক্ষমাহীন অপরাধ অথচ বনওয়ারী তার বউকে পর্যন্ত কালোশশীর মত ভালবাসে না—এই যে অনিবার্যতার মাঝখানে উপন্যাসে নিয়তির এক ভয়ংকর শ্বাসরোধকারী পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা থেকে, সেই ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে নিজে বাঁচবার জন্য ও পাঠকদের বাঁচাবার জন্য বনওয়ারী পাগলকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পাগলের বাঁধা রেললাইনের সেই ঘেঁটু গান গাইতে বলে—'ও সায়েব আস্তা বাঁধালে।' [রাস্তা>আস্তা]। চন্দনপুরে প্রথম রেললাইন বসার সময় পাগল এই ঘেঁটু গান বেঁধেছিল এবং এ গান গেয়ে তার বেশ নামও হয়েছিল। ঘোষ মশায়ের বাংলা কুঠিতে চাল ছাইবার সময় পাগল একই গান গেয়েছে—'লাল-মুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ।' এখানে সাহেবদের দৈহিক বর্ণনার সাথে সাথে রেলপথ বসিয়ে কাহারকুলের যে অন্ন ঘুচিয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিতে করা হয়েছে। কেননা, আগে দূর-দূরান্তে লোকে পাল্কি করে যাতায়াত করতো ; কিন্তু রেললাইন হওয়ার ফলে লোকে, এখন 'পাল্কি ছেড়ে র‍্যালে [রেলে] চড়ে।' ঘেঁটু গানের মাধ্যমে সমাজসচেতনতার যে প্রকাশ ঘটে আলোচ্য সঙ্গীতটি তার অন্যতম প্রমাণ।

চন্দনপুরে লোহার লাইন পাতায়, কলের গাড়ি আসায় পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ে কাহারপল্লীতে। দলে দলে মেয়েরা সেখানে কাজ করতে চায়। করালীর হাত দিয়ে কাহারপাড়ার যুবকরা নতুন যুগের খবর পায় ; তারা রুজিরোজগারের আশায় চন্দনপুর যেতে চায়। কিন্তু কাহারপাড়ার বনওয়ারীর তা কাঙ্ক্ষিত নয় ; নতুন যুগের পত্তনকে আদিম যূথবদ্ধ জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে বরণ করতে চায় না।

তাই বনওয়ারীর আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, যুবকদের না যেতে দেওয়ার জন্য, মেয়েদের ও পথে পা না বাড়াবার জন্য [কেননা করালীর মা গেছে, পাখির দশা বনওয়ারীর জানা নেই] পাগলের গানের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে—'জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা'—অর্থাৎ ম্লেচ্ছ অর্থাৎ সাহেবদের কারখানায় কাজ করতে গেলে জাতি-ধর্ম চলে যাবে ; মেয়েরা আর ঘরে ফিরবে না ; অলক্ষ্মীর কারখানা লক্ষ্মীকে চঞ্চল করে তোলে। নতুন যুগের নায়ক করালী সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তনে কাহারকুলে যে গতিসঞ্চার করে বনওয়ারী তারই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে কাহারকুলকে একই ব্যবস্থায় আবদ্ধ রাখতে চায়। তাই পাগলের গাওয়া এই জাতীয় গানে তার সমর্থন বেশি।

'পাল্কীর গান' বাংলাদেশের কর্ম সঙ্গীত ; কর্ম সঙ্গীত লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত। কাহারদের কাজের সঙ্গে সঙ্গীত জড়িত থাকে। পাল্কীর গানের একটি সুন্দর ও সজীব বর্ণনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নিম্নস্তরের জাতের মধ্যে লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাবের রূপ প্রকাশ করেছেন। "আট ক্রোশ পথ মাতিয়ে, পথের ধুলো উড়িয়ে চলে এসেছে। চার চার জনে কাঁধ দিয়ে চলেছে এক এক পাল্কীতে, বাকি চার চার জন ছুটে এসেছে সঙ্গে। সে প্রায় চৌঘুড়ির মত জোরে জোরে এসেছে, বর যাবে আগে, কি কনে যাবে আগে ? কত্তা আগে, না গিন্নী আগে ? 'নক্ষ্মী' আগে না 'লারায়ণ' আগে ? প্লো—হেঁ—প্লো—হিঁ—প্লো—হিঁ—প্লো—হিঁ ! বনওয়ারীর পাল্কীতে বনওয়ারী আছে আর আছে সেই পাগল কাহার, পাল্কীর আগের ডাণ্ডার প্রথমেই আছে পাগল। সে হাঁসুলীর বাঁকের কাহারপাড়ার আদ্যিকালের গান গাইতে গাইতে এসেছে। গান গাইতে পাগলের জুড়ি কেউ নেই। গাগল গেয়েছে—সরাসরি ভাল পথে / প্লো হিঁ / জোর পায়ে চলিব / প্লো হিঁ—প্লো হিঁ / আরো জোর কদমে / প্লো হিঁ—প্লো হিঁ—প্লো হিঁ"—ইত্যাদি।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গানগেয়েছে কালো বউ ; এ গানের রচয়িতা কে কেউ জানে না। দীর্ঘদিন এ গান চলে আসছে। গ্রামে মদ ও নানা উপাদেয় খাদ্য নিয়ে যখন আনন্দ চলছে 'শতগুণে লোভনীয়' 'মনোরমা' কালোবউকে নিয়ে বনওয়ারী কোপাইয়ের গর্ভে নেমেছে। দুধবরণ চাঁদের আলোয় সুন্দরী কালোবউ সুন্দরতর হয়েছে তার মনের রঙে—বনওয়ারী তাকে মিহিসুরে 'এক পদ গায়েন' করতে বলেছে। সে গায়েন হবে 'অঙের গায়েন' অর্থাৎ রঙের গান অর্থাৎ প্রেমের গান। কালোবউ তার সমস্ত আনন্দ নিয়ে কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের রূপোর ছটা জাগানো চাঁদের আলোয় গাইলে—'আমার মনের অঙের ছটা / তোমায় ছিটে দিলে.

না—পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে / সে জল পাতা নিলে না / টলোমলো—টলোমলো / হায় বঁধু হে পড়ে গেল / ও হায়, চোখের জলের মুক্তাছটা মাটির বুকে ঝরে না।' এ যেন কালোশশীর তীব্র হৃদয়-নিংড়ানো আর্তনাদ। যাকে চেয়েছিল তাকে পায়নি, যাকে পেয়েছে তাকে চায়নি—চিরন্তন নারীচিত্তের এই মর্মন্তুদ আর্তনাদ হাহাকারের আর্তস্বরে সমস্ত কোপাইকে, হাঁসুলীর বাঁকের ওপারের আকাশকে পর্যন্ত যেন তার সঙ্গী করে তুলেছে। আর এই গানই কালোশশীর শেষ গান—উপন্যাসে সে আর থাকতে পায় নি। পরমের আদিম প্রতিহিংসার তীব্র আক্রোশে ভীত সন্ত্রস্ত কালোবউ নিজেকে রক্ষা করার জন্য 'সায়েবডুবির দহে'র কিনারা ধরে উপরে উঠে আসতে গিয়ে শিমুলগাছের শিকড়ে পা দিতেই 'সাদা গোখুরোর' কামড়ে প্রাণ দেয়। কালোশশীর 'অঙের' সাধ অপূর্ণ থেকে যায়।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র চতুর্থ পর্বের দ্বিতীয় উপপর্বে দুটি সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়েছে। একটি বনওয়ারীর নতুন ঘর বাঁধার কাহিনীকে কেন্দ্র করে ; আর একটি নয়ানের অন্তিম মুহূর্তকে কেন্দ্র করে। দুটি গানে জীবনের দুটি দিক—একদিকে সৃষ্টির ; আর একদিকে জীবনের সমাপ্তির। কালোশশীর মৃত্যুর পর বনওয়ারী যার মধ্যে 'কালোশরীর ঢঙ' দেখতে পেলো সে হলো সুবাসী—'মেয়েটি যুবতী', 'রঙ মাজা', 'মেয়েটিতে তার কালোশশীর অভাব মিটবে' ; তা ছাড়া 'তার মত মাতব্বরের বংশটা লোপ পেতে দেওয়া কখনও ঠিক নয়'। 'অল্প বয়সী মেয়েরা মুখ টিপে' হাসলেও পাগল বনওয়ারীর সঙ্গে সুবাসীর বিয়ের কথা শুনে বাঁধল হাঁসুলী বাঁকের ছড়া পাঁচালী—'হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—যাই বলিহারী / বাঁধিল নতুন ঘর দখিনদুয়ারী / সুবাসী বাতালে ঘর উঠিল ভরি, মরি যে মরি'। দখিনদুয়ারী ঘরে সুগন্ধ বাতাস প্রবেশ করে এই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এ গানে সুবাসী বাতাসে অর্থাৎ সুবাসীর অঙ্গসঙ্গামৃতে উৎফুল্ল আনন্দের কথা বর্ণিত হয়েছে। ফুল্লোৎফুল্ল এই নবজীবনের আশ্বাসের গানে কিন্তু এইপর্ব শেষ হয় না—"হঠাৎ আলোটা নিবে নিবে গেল। তেল নাই আর। অন্ধকারের মধ্যেই সকলে বসে রইল। নয়ানের বুকে হাত দিয়ে তার মা বসে কাঁদছে। তাতেই বুঝতে পারবে। বুক থামলেই জানাবে চীৎকার করে। আলো হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু আর সে কথা মনে হচ্ছে না তাদের। আলোর প্রাচুর্য কাহারদের চিরদিনই কম। অন্ধকারে, জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়। পাগল ছড়া কেটে বলে—কি হবে আলো ?" ছড়া কেটে বললেও গানটিতে রূপকার্থ আছে। অন্ধকারের মধ্যেই প্রাণ-পাখির যাত্রা সেই দেশে—যেখানে তার উৎসমুখ। সেখানে চন্দ্র সূর্য লম্ফ প্রদীপ কিছুই নাই ;

কিন্তু সেখামে একজন আছেন—পরমস্রষ্টা—তাঁর দুচোখে আলোর দীপ্তি ; সুতরাং আলোর জন্য ভাবনা করে লাভ নেই—'অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে / অন্ধকারেই পরাণপাখি সেই দ্যাশেতে যায় রে / চন্দ্র সূর্য্য লম্ফ পিদীম তাই রে নাই রে নাই রে····· '।

[আলোচ্য সঙ্গীতে মুণ্ডক উপনিষদ-এর দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১ সংখ্যক শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। উক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে—'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং'······ইত্যাদি। এর প্রভাব কি 'চন্দ্র সূর্য লম্ফ পিদীম তাই রে নাইরে নাইরে' অংশে লক্ষ্য করা যায় না ?]

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পঞ্চম পর্ব ১—৮ উপপর্বে বিভক্ত এবং এখানে প্রথম উপপর্বে মোট ছ'টি গান। অবশ্য ছ'টি গানের মধ্যে তিনটি পূর্ববর্তী গানের প্রবহমানতা—প্রথমটিকে পুনরাবৃত্তি বললেও চলে। সে আবার 'ভাইরে ! অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায়রে। অন্ধকারেই পরাণপাখি সেই দ্যাশেতে যায় রে' গানটি গেয়েছে। তবে এখানে পটভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন। "হাঁসুলী বাঁকের পাঁচালীকার পাগল কাহার মজার মানুষ। মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মত। আকাশের রঙেই তার রঙ। আকাশের সূয্যি উঠলে কালো জল ঝকমক করে, তার সঙ্গে বাতাস উঠলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে গলানো রূপোর মত 'টলমলিয়ে' ওঠে, রাত্রে চাঁদ থাকলে নীলের বাঁধের ছায়া-মাখানো কালো জলে চাঁদ ওঠে, চাঁদের সঙ্গে তারাও ফুটে ওঠে, আকাশে মেঘ নামলে নীলের বাঁধের জল হয় গহিন কালো, মনে হয়—আকাশ কাঁদছে, তারই দুঃখে নীলের বাঁধের জলও কাঁদছে। তা হবে না কেন ? আকাশ থেকেই ঝরে পড়ছে নীলের বাঁধের জল—ও তো ওরই এক কন্যে। পাগল কাহারই বলে কথাটা।·········কাহারপাড়া তার কাছে আকাশ কাহারপাড়া হাসলে সে হাসে, কাঁদলেও সে কাঁদে। হাসিও না, কান্নাও না—এমন অবস্থায় কাহার পাড়া ঝিমিয়ে থাকলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসের কুয়াশায় ঢাকা নীল বাঁধের জলের মত চেহারা নেয়, পাগলের মনের চেহারাও ঠিক তাই হয় ; সে উদাস হয়ে থাকে"।

সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ের খবর শুনে পাগল যে গান গেয়েছিলো তাকে সমালোচ্য উপপর্বে আরও সম্প্রসারিত আকারে পাওয়া যায়। তবে এখানে সুবাসীকে অষ্টপ্রহরী (আটপৌরে) পাড়ার লতা এবং বনওয়ারীকে বুড়ো মালী বলা হয়েছে। গানটির দুটি অংশ—প্রথমাংশে বনওয়ারীর ও সুবাসীর পরিণয় সম্পর্ক ; আর দ্বিতীয়াংশে পরিণয়ের পর বনওয়ারীর জীবনে সুবাসীর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে ; এমনকি বনওয়ারীর ঘরের রাস্তা মাড়াতেও নিষেধ করা হয়েছে ; কেননা তার ফলে

তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রেমের কলভাষণে বাধার সৃষ্টি হবে। গানটি ছড়া-পাঁচালীর ঢংয়ে রচিত।

গানটির প্রথমাংশ—'হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী / যাই বলিহারি / বাঁধিল নতুন ঘর দক্ষিণ দুয়ারী / সে ঘর বাঁধিতে এল (যতসব) অষ্টপ্রহরী / অষ্টপ্রহরী পাড়ার সুবাসী—লতা / কাহার পাড়ায় আজ হ'ল পোঁতা / বুড়া মালী বনওয়ারী (যতনে) সাজায় কেয়ারী'। গানটির দ্বিতীয়াংশ—'সুবাসী লতার ফুল পরিবে কানে / সুবাস জাগিবে রস রাঙানো প্রাণে / ও পথে যাস না তোরা বারণ করি / বুড়ো আসবে তেড়ে / ঘেঁটে হাতে বুড়া আসবে তেড়ে।'

নবান্নের উৎসব কাহারদের অন্যতম উৎসব। কাহারদের ধর্ম গাজন, ধরম পুজো, অম্বুবাচী, মা বিষহরির পুজো, ভাদ্রমাসে ভাঁজো পরব, অঘ্রাণে নবান্ন আর পৌষে লক্ষ্মী—মোট সাতটা পর্বের মধ্যে "নবান্নই ওদের বড় পরব। নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পুজো করে, কালারুদ্র বাবাঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের 'দব্য পস্তুত' করে আনন্দ করে খাওয়া। আর কালারুদ্দুরের কাছে বলা—বাবা!—

'ল' লাড়লাম—'ল' চাড়লাম
'ল' পুরনোয় ঘর বাঁধলাম।
লতুন বাঁখারি বাঁধি পুরানো খাই—
এই খেতে যেন জনম যায়"—ইত্যাদি।

এটি নবান্নের ছড়া জাতীয় লোকগীতি।

নবান্নের সন্ধ্যাকালীন উৎসবে পাগল নবান্নের ছড়া জাতীয় লোকগীতি গেয়েছে। এবারে গোটা আটপৌরে পাড়া বনওয়ারীর দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছে। পাগল গেয়েছে—'ও নবান্নের নতুন ধানের পিঠে। আজ কাজ কি মাছের ঝোলে। নতুন কাপড় খস-খসিয়ে বউরা এসেছে। আঙা নতুন ছাওয়ল লিয়ে কোলে'! এ গানে একটু বেদনার দীর্ঘশ্বাস আছে।—"সঙ্গে সঙ্গে সকলে হৈ হৈ করে উঠল। হিসেব কর, কার কার ছাওয়াল হবে। নতুন ছাওয়াল কোলে কে কে নবান্ন করলে। বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। বাবাঠাকুর কবে তাকে বংশ দেবেন তিনিই জানেন।"

সমালোচ্য উপন্যাসের পঞ্চম পর্বের দ্বিতীয় উপপর্বে বাবা ঠাকুরের থানে চন্দ্র-বোড়া সাপের কামড়ে নিমতেলে পানার ছেলেটা মারা যায়, ঠিক একই ভাবে যেমন ভাবে মরেছিল করালীর কুকুরটা। এই ঘটনায় সকলের ভুল ভাঙল এবং পাঁচজন ছাড়া সকলেই বিদ্রোহী করালীর দল ছাড়ল। "পানার ছেলের এই সর্পাঘাত—*** করালীর হাসি, বেপরোয়া কথা সাজসজ্জা—সবেরই রঙের উপর ভয়ের কালো রঙ

মাখিয়ে দিলে"। পাগল গাইলে পুরনো গান—'মন চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না। কেলি কদমতলার বৃন্দে গো। মানিক পেলে তুমিই লোয়ো—আমি চাইব না। কালো মানিক কালীয়, বৃন্দে গো।' অর্থাৎ করালী ও তার সঙ্গে অন্য কেউ যেতে চাইলেও কাহার পাড়ার অনেকেই আর তার সঙ্গী হতে চায় না। এই খানেই প্রাচীন প্রথার, সংস্কারের এবং তার প্রতিভূ বনওয়ারীর আংশিক জয়।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পঞ্চম পর্বের পঞ্চম উপপর্বে ভাঁজো গান আছে। দুটি পৃথক ভাবে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করলেও একটি গানেরই দুটি অংশ। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে ভাঁজো-র অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুটি দিকই নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। ঔপন্যাসিকের উক্ত আলোচনার আগে 'ভাঁজো' সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। ভাঁজো হলো বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত একটি নারীব্রত। কোন কোন অঞ্চলে এটি শস পাতার ব্রত নামেও পরিচিত। এই ব্রতের নাচ গান ইত্যাদির মাধ্যমে পর্যাপ্ত শস্য কামনা এবং শস্য উৎপাদনের আনন্দ প্রকাশ পায়। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী (মন্হনা ষষ্ঠী / চর্পরাষষ্ঠী) থেকে আরম্ভ হয়ে পরের শুক্ল দ্বাদশীতে এই ব্রত শেষ হয়। ব্রত আরম্ভের আগের দিন একটি পাত্রে মুগ, মটর ছোলা, অড়হর, কলাই এই পঞ্চশস্য ভিজিয়ে রেখে পরের দিন ষষ্ঠী পুজায় সেগুলি নৈবেদ্য সাজিয়ে, বাকি শস্য সরষে ও ইঁদুর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একটি সরাতে রাখা হয়। তারপর প্রতিদিন মেয়েরা স্নান করে দ্বাদশীর দিন পর্যন্ত অল্প অল্প জল দেয়। সব শস্য অঙ্কুরিত হলে বছরটি শস্যশালিনী হবে মনে করে পরবর্তী শুক্লা দ্বাদশীতে চাঁদের আলোয় নাচ-গানের মধ্যে একটি উৎসবের আয়োজন করে। উঠোনের মধ্যে একটি মাটির নিকানো বেদির চারিদিকে মেয়েরা প্রত্যেকের সরাগুলি সাজিয়ে দিয়ে ঐ বেদীতে পিটুলির আলপনায় ইন্দ্রের বজ্র চিহ্ন এঁকে দেয়, কোথাও বা মাটির ইন্দ্রমূর্তি স্থাপন করে। তারপর উঠোনের আর এক অংশে পর্দার আড়াল থেকে ঢুলিরা অনেকটা তর্জা বা পাঁচালীর ঢঙে বাজনা বাজায় আর বাজনার তালে তালে ব্রতে অংশ গ্রহণকারী বালিকা, কিশোরী এবং যুবতী মেয়েরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বেদির চারিদিক ঘিরে ছড়া ও গানের সঙ্গে নাচতে শুরু করে। প্রায় সারা রাত দুদলে ভাগ হয়ে নাচ-গান ও ছড়াকাটাকাটির পর রাত্রিশেষে মেয়েরা নিজের নিজের সরা মাথায় নিয়ে নিকটবর্তী জলাশয়ে বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফেরে।

[ভাঁজোর একটি ছড়ার উল্লেখ করা চলে :

ভাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা,

ভাঁজোর গলায় দেব মোরা পঞ্চফুলের মালা।

এক কলসী গঙ্গাজল এক কলসী ঘি।

বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি।]

লোকজীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তারাশঙ্কর কাহারদের জীবনে ভাঁজো পরবের ভূমিকা সম্পর্কে পর্বের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুটি দিকই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—"হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পিথিমীর সব জায়গায় সবই আষাঢ় যায়, শাওন যায়, ভাদ্র আসে। আষাঢ় শাওন যে কেমন করে কোন্ দিকে যায় তা কাহারেরা জানতে পারে না।*** শাওন শেষ হলে খেয়াল হয়, ক্ষেতে রোয়ার কাজ শেষ হল। রোয়া শেষ হলে বাবাঠাকুরকে প্রণাম করে, আর আয়োজন করে বাবাঠাকুর তলায় ইদ্‌পুজোর। ইদ্ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষার জল দিলেন, তাঁর স্বর্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর এক অংশ পাঠিয়ে দিলেন ভোমণ্ডলে অর্থাৎ ভূমণ্ডলে। ইদ্‌পুজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, খেটে খুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়।*** ইদ্ রাজার পুজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিসের থানটিতে বেদী বাঁধে, জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পুজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর পুজোতে কাহার পাড়ায় 'অঙখেলার, চব্বিশ প্রহর হয়ে থাকে, সে মাতনের হিসেবনিকেশ নাই। ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরী করে লতার ফুলে সাজিয়ে আকণ্ঠ মদ খেয়ে মেয়ে-পুরুষে মিলে গান কর আর নাচ। রাত্রে ঘুমোতে নেই, নাচতে হয়, গাইতে হয়—জাগরণ জল বিধি। পিতি পুরুষের কাল থেকে দেবতার হুকুম 'অঙে'র গান—'অঙে'র খেলা যার যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, কানে শুনলে দেখতে যাবে না। ওই দিনের সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলাবে।" কাহারদের জীবনে ভাঁজো পরবের গুরুত্ব কোথায়, শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের আনন্দের ধারণাকে মিশিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি নর-নারীর বিধিনিষেধহীন মিলনের আনন্দের কথা ঔপন্যাসিক তাঁর বর্ণনায় নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারাশঙ্কর তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস ভাঁজোর যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে বনওয়ারী আলো ভাড়া করেছে; খুব ভাল ঢোল সানাই কাঁশি ভাড়া করেছে। মনে হয় সুবাসীকে কেন্দ্র করে তাঁর ভাঁজো উৎসবে এবার এত জাঁকজমক। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় —"হুকুম দিয়েছে—বেবাক 'যোবতী' অর্থাৎ যুবতী কাহার কন্যে বউকে নাচতে হবে। সবুজ লাল হলদে রঙ এনে দিয়েছে, কাপড় ছুপিয়ে রাঙিয়ে নাও। সুবাসীও নাচবে। সুবাসীকে একখানা রঙিন শাড়িই কিনে দিয়েছে সে।

গোপালীবালাও নাচবে। তা কেও কাপড় কিনে দিয়েছে। ছোকরাদের হুকুম দিয়েছে—তুলে আন বেবাক পুকুরের পদ্ম আর শালুক ফুল। সাজাও ভাঁজোর বেদী। ঐ সমস্তের ভার দিয়েছে পাগল কাহারকে।*** ভর্তি দুপুরে মাথায় আট-দশটা ডাঁটি শুদ্ধ শালুক ফুল জড়িয়ে মাঝখানে একটা কাঁচা কাশফুল গুঁজে বুড়ো-ছোকরা গান গাইতে গাইতে হাঁসুলী বাঁকে ফিরেছে।"—ভাঁজোর নিম্নোক্ত গানটি তারা গেয়েছে—

কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখিহে
আমি তোমায় দেখতে পেছি
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীরই বাঁকে—
বাঁশবনে কাশবনে লুকাল্‌ছ কোন ফাঁকে।
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
তোমার আঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে।

[ও আমার ভাঁজো সখি, তুমি কোন ঘাটেতে নৌকা (লা) লাগিয়েছ। আমি তোমার দেখতে পাচ্ছি না। তাই তোমায় হাঁসুলীর বাঁকে খুঁজতে এলাম। বাঁশবনে কাশবনে কোন ফাঁকে তুমি লুকিয়েছো—সখি, ইশারাতে সাড়া দাও। ও আমার ভাঁজো সখি, আমি তোমার রাঙা (আঙা) পায়ে লুটিয়ে পড়ি।] এর পরের যে অংশটুকু আছে, তা মন্ত্রের মত—সব দলকেই গাইতে হবে। অর্থাৎ এই অংশটি ভাঁজো পরবের বা ভাঁজো ব্রতের মূল—

'ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিবি,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলবি,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমার বর লো ধরা।'

[মাটির সরাকে এবং ভাঁজো সুন্দরীকে সম্বোধন করা হয়েছে। ভাঁজোর কপালে রঙের সিঁদুর পরো। আলতার রঙের ছোপ মাটিতে দিতে হবে। মাটির কাছে মনের বাসনা-কামনা জানিয়ে বলতে হবে—ধরা অর্থাৎ বসুমতী আমার 'পঞ্চ আঁকুড়ি' অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুর অর্থাৎ মুগ, মটর, ছোলা, অড়হর, কলাই এই যে পঞ্চশস্য সরায় ভিজিয়ে রেখে জলদিয়ে অংকুর বার করা হয়েছে, সেই পঞ্চাঙ্কুরের কথা

এখানে বলা হয়েছে।] ভাঁজো ব্রত যে নারীব্রত এবং পর্যাপ্ত শস্য কামনা ও শস্য উৎপাদনের ব্রত তা এই লোকসঙ্গীত থেকে বোঝা যায়। কাহারদের কাছে 'ভাঁজোর পরব' সুখের দিন—মদের নেশায় মাথা ছমছম করে। ভাঁজো পরবে "মদের নেশায় সুবাসী টলমল করছে পদ্ম পাতার জলের টোপার মত। চোখে যেন আধখানা চাঁদ নেমেছে, গায়ে যেন জ্বরের মতন তাপ।*** করালী কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের ভাঁজো তলায়, তার আর সুবাসীর নাচ দেখে হাসছে, গানের সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছে।" বনওয়ারীর বউ গোপালীবালাও মদে জ্ঞানহীন, বাহ্য চেতনালুপ্ত। পাগল তাকে বাড়িতে শুইয়ে দিয়ে আসতে গিয়েও পেল্লাদের (প্রহ্লাদের) বউকে অনুরোধ করেছে, গোলাপবালাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পেল্লাদের বউ পাগলকে অঙের' (রঙের) ভয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে পাগল গেয়েছে—সে রঙ তার কোপাইয়ের জলে ভেসে নিয়ে লালশালুক ফুলে লেগেছে। সে পেল্লাদের বউকেও 'মনের অঙের মালা' কোপাই নদীর জলে ফেলে দিতে বলেছে। প্রেমিক জীবনের ব্যথা তার বেদনা তার গানে প্রকট —'যে অঙ আমার ভেসে গেল/কোপাই নদীর জলে হে। সে অঙ যেয়ে লেগেছে সেই লাল শালুকের ফুলে হে। (কোপাই নদীর জলে হে)। সেই শালুকে মন মানালাম। সকল দুখো পাসরিলাম। তোমার মনের অঙের মালা। তুমিও দিয়ো ফেলেহে। (কোপাই নদীর জলেহে)'·· ··ইত্যাদি।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শেষ হয়ে আসে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা বনওয়ারীকে পাগল গান শোনায় 'হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায় / কোপাই নদীর জলে কথা ভেসে যায়।' পুরাতনকাল শেষ হওয়ার মুখে, বনওয়ারীর জীবন-পথ পরিক্রমা প্রায় শেষ হয়ে এলো—হাঁসুলী বাঁকের কথা আর কাকেই বা বলা যাবে। হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায় যুদ্ধের আগুন এসে পৌঁচেছে। কাহারপাড়ায় ছাগল-গরু নেই। চালান যাচ্ছে। কাহারপাড়ায় অতীতকাল অবসিত প্রায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের বন্যা-ঝড়-মন্বন্তর সবই বোধ হয় হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায় সর্বনাশের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। অবশ্য এবার কাহারেরা কেউ ডুবে মরল না; এবার তারা সব ছিল চন্দনপুরে। "হাঁসুলী বাঁক বন্যায় ডুবে গেল। বাঁশবনের বেড় নির্মূল হওয়ায় কোপাই-এর বান এবার শতগুণ বেগ নিয়ে বয়ে গেল কাহারপাড়ার উপর দিয়ে। ভূমিসাৎ করে দিয়ে গেল গোটা কাহারপাড়া। একখানি ঘরও রইল না দাঁড়িয়ে। ১৩৫০ ইংরেজি ১৯৪৩ সালের বন্যা। তেরশ' পঞ্চাশের যে বন্যায় রেললাইন ভেসে গেল, সেই বন্যা। ইতিহাসে আছে তার কথা। দামোদরের, অজয়ের, ময়ূরাক্ষীর, কোপাইয়ের বন্যায় শুধু রেললাইন ভাসে নি, হাঁসুলী বাঁকের

মত অগণিত স্থানের উপকথার পটভূমি ভেসে গিয়েছে ; পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।" তাই পাগলকে উপকথার অন্তিম পরিণতিতে গাইতে হয়—'হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।' 'উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।' পাগল আর নসুবালা দোরে দোরে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গান গেয়ে বেড়ায়। পাগল বাঁশবেড়ের বাঁশের কথা তুলে বলে যে, লাঠি হওয়ার বাঁশে বাঁশি হয় বলে বাঁশবাদির বাঁশকে সে ভালবাসে। যা দণ্ডরূপে শাসন করতে পারে তা থেকেই আবার মধুর বংশীধ্বনি প্রকাশিত হয়। তাই পাগল গান ধরে—

'যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশে হয় বাঁশি
বাঁশবাদির বাঁশগুলিরে তাইতো ভালবাসি।'

নসুবালা নাচতে নাচতে কাহারপাড়ার পুরাতন উপকথা শোনায়। বেলতলায় কাহারকুলের পিতা আর বাঁশবনে তাঁর বাহন অজগর চিতার 'মিথিকাল' বিশ্বাসকে নিয়ে তাদের দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত জগতের বিশ্বাস, পরিবর্তমান কালের অন্যতম সারথী করালী সেই দীর্ঘকাল লালিত বিশ্বাসকে আঘাত হানলো। সেই উপকথাই নসুবালার গানে প্রকাশিত—

'বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহারকুলের পিতা
বাঁশবনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা
পরাণ ভ্রমরে সে থাকত আগুলি,
(ও হায়) তারে দাহন করে মারল করালী।'

কিন্তু ইতিহাস কর্তার বাণী, কালরুদ্রের খেলা, হরির বিধান মানে না। তাই মিলিটারী এসে বাঁশের বেড়ার ঝাঁপি ভাঙে। যুদ্ধের ঠিকাদাররা তামাম বাঁশ কিনে নেয়। যুদ্ধে হাঁসুলী বাঁকের তন্দ্রা ভাঙে, উপকথায় ছেদ পড়ে, সেখানকার মানুষ জীবনস্রোতের আকর্ষণে ইতিহাসের ধারায় মিশে যায়।

'বাঁশের বেড়ার ঝাপি শেষে ভাঙলে মিলিটারী।
কাহারেরা হায় রে বিধি হল ভ্রমণকারী।
ঘর ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়।'

পাগলের গানের মধ্যে কাহারপাড়ার আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত হাঁসুলী বাঁকের উপকথা প্রকাশিত হয়। সর্বাগ্রে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার পর কবি দার্শনিকের মতো নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে পাগল বলে—

'জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়োর খেলা দেখে যারে ভাই !'

ভাঙা-গড়ার খেলা নিত্য চলছে। একটা ভাঙে, অন্যটা গড়ে ওঠে। এটাই তো সৃষ্টিতত্ত্ব। এ যেন ছেলেব হাতের বালি দিয়ে ঘর গড়া, আবার ঘর ভাঙা। নদীর একূল ভাঙে, ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা। যে করালী একদিন সব ভেঙে চুরে চন্ননপুরের যাত্রী হয়েছিল আজ সে গাঁইতি হাতে বালি খুঁড়ছে, মাটি খুঁজছে ; আবার সে ঘর করবে। হাঁসুলী বাঁকে কবালী ফিরে আসে—সে বালি কেটে মাটির অন্বেষণ কবে। তার সাধনা হলো উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার সাধনা—সে এক নতুন হাঁসুলী বাঁক। তাই পাগলের কণ্ঠে জাগে নতুন সৃষ্টির বন্দনা গান—

'যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে,
যে ভাঙে সেই গড়ে ;
ভাঙা গড়ার কারখানাতে
তোরা দেখে আয়রে উঁকি মেরে।'

আলোচ্য উপন্যাসে তারাশঙ্কর জীনের পরিচয়কে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে জীবন-তত্ত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন। বাঁশবাদীর পরিবর্তনের পরিচয় তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপসৃয়মান কালের জন্য বেদনাবোধ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের অন্তিম পরিণামে প্রাচীনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মমত্ববোধে অধীর তারাশঙ্কর নতুনের জয়যাত্রার চিত্রাঙ্কনেও কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত নন। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস কালকে স্পর্শ করে যায় নিস্পৃহ দার্শনিকতায়—পাগলেব শেষ গানে তারই অভিব্যক্তি।

তথ্য সূত্র ঃ

১. বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্পরীতি/ক্ষেত্রগুপ্ত
২. তদেব
৩. রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা/ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়।
৪. রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪শ খণ্ড)/জ. শ. সংস্করণ।
৫. বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্পরীতি/পূর্বোক্ত।
৬. তারাশঙ্কর রচনাবলীর ৭ম খণ্ডে বাণী রায়ের ভূমিকা।

তথ্য গ্রন্থ ঃ

১. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস/মুহম্মদ রেজাউল হক ।

৩. তারাশঙ্কর/হরপ্রসাদ মিত্র

৪. তারাশঙ্কর ঃ দেশ কাল সাহিত্য/উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত ।

৫. তারাশঙ্কর অন্বেষা/সম্পাদনা ॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৬. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ/সম্পাদনা ঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী ।

৭. বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়/রণেন্দ্রনাথ দেব ।

৮. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রতিহত মনুষ্যত্ব, প্রবহমান কাল ও হাঁসুলী বাঁকের কালো মানুষেরা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

'আমার সাহিত্য জীবন' দ্বিতীয় পর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সময়কার সাহিত্য সমালোচনার গোষ্ঠীসর্বস্ব তাৎক্ষণিকতার আভাস দিয়েছেন। যে উপন্যাস একজন আলোচকের কাছে ছিল 'ব্রাত্য' ; মন্ত্রহীন ভারতবর্ষে যুগান্তরের দোলা' তা-ই হয়ে উঠেছিল তীক্ষ্ন আক্রমণের বিষয় ; 'বইখানি কদর্য, বইখানি অশ্লীল এবং লেখক উচ্চবর্ণের ধর্মানুযায়ী নিম্নবর্ণের অপমান করেছেন—উদ্দেশ্যমূলক ভাবে।'[১] বস্তুত-পক্ষে সময় বিবর্তমান, কাল নিরন্তর চলিষ্ণু। মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত-পরিবর্তনশীল। আজকের সত্য পরবর্তীতে অন্য চোখে অন্যরকম মনে হতেও পারে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মত উপন্যাস যা সত্যি সত্যিই ভারত ইতিহাসের বেশ কিছু কালান্তরের সার্থক সাক্ষী তার সম্পর্কেও এই বদল সম্ভব। বদলে যাচ্ছে বহুকিছু, বিশেষত মূল্যবোধ। সুতরাং যে মূল্যবোধ জাত-নীতিকে গৌরবের চোখে দেখে সেই মূল্যবোধকে অস্বীকার করে উঠে আসে মানবিক অধিকার পাবার প্রত্যয়। আর উপন্যাস তো জীবনের সমগ্র সত্যকে ধরার চেষ্টাই করে,' তাই আজ যে চরিত্রের আচরণ মনে হয় আকস্মিক, ভাবীকাল তাকেই ভাবতে পারে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? উপন্যাসের কাল অবশ্য একটি অনড় কোন ধারণাও নয়। উপন্যাসের ঘটনা ঘটার কাল আর ঘটনা বর্ণনার কাল পৃথকও হতে পারে, সাঙ্গীকৃত সমাপতিতও হতে পারে। কিন্তু উপন্যাস পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের উপলব্ধির বিনিময় ঘটার বিষয়টি আবার দ্বৈততার নবতর মাত্রা হাজির করে। ফলকথা এক অস্থির কালচক্র চলতে থাকে একটি মহৎ সাহিত্যকে ঘিরে। নির্মাণকলা সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয়ে গেলে উপন্যাসের কালচক্র আর আবর্তিত হবে না ধরে নেওয়াই চলে। সেই পর্বে উপন্যাস খণ্ডটি আর সামাজিক সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হবে না। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এবং অনুরূপ বেশ কিছু উপন্যাসে তারাশঙ্কর তাঁর বিবেচনামতো বাংলা তথা ভারতবর্ষের একটি গূঢ় পরিবর্তমান কালখণ্ডকে স্পর্শ ও উত্থাপন করেছেন, এই উপস্থাপনার পিছনে জনজীবনের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়ের ছাপ ছবি ধরা পড়েছে, আর সেই জীবনের নকশা তদানীন্তন বাংলা

সাহিত্যের পাঠকের কাছে ছিল একেবারেই অজানা। তারাশঙ্কর তাঁর লেখনীর স্পর্শে বাংলার অস্পৃশ্য সমাজের চরিত্রগুলিকে কৃতার্থ করেছিলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পালা সাঙ্গ। এখন অন্যকাল। তারাশঙ্কর সাহিত্যের মূল্যায়নও তাই নবচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা দরকার। হাঁসুলী বাঁক সম্পর্কে আমাদের চেষ্টা সেই আগ্রহের অন্তর্গত।

স্মৃতির অতল থেকে তারাশঙ্কর কিছু কিছু প্রক্রিয়ার কথা লিখেছেন কখনো সখনো ; রাঢ়বাংলার নিজস্ব প্রক্রিয়া। 'বেদিয়া', যারা ধর্মে না-হিন্দু না-মুসলমান, আসলে যারা ধর্মের-বাহির-কুঠুরির অধিবাসী, তাদের একজন রাধিকা, এসে বলেছিলেন তাঁকে ঃ 'হ্যাঁ খোকাবাবু, দাড়কার অবনীশবাবু যে আমাদিকে হিঁদু হতে বলছে, কি করি বল তো ?

দ্বিজপদও বলেছিল। কয়েকদিন পর সেও এসেছিল, সেও বললে। জানলাম ওরা ধর্মে ইসলাম ধর্মাবলম্বী।'[২]

দাড়কার শব্দটির অর্থভেদ হলনা। দাড়কার অবনীশ বাবু বা দ্বারকার শঙ্করাচার্য যিনিই হোন, একজন বর্ণহিন্দুর চোখে ভারতসংস্কৃতির এক অপরিহার্য শর্তই হচ্ছে ক্রমাগত 'হিন্দু' হতে থাকা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে বিষয়টি দেখানো হয়েছে। এর সূচনা হাঁসুলী বাঁকের ঘটনার কালে ঘটেনি, ঘটেছে কিছু আগে থেকেই ; ১৩২০-২১ বঙ্গাব্দের কথা ঃ

'এই তখুনি চন্দনপুরের মুখুজ্জে বাবুরা কয়লার কারবারে ফেঁপে রাজা হয়ে উঠল।...জাঙলের সদ্গোপদের বৃদ্ধি ওই যুদ্ধের সময়। আগে সবাই ছিল খাঁটি চাষী, কাহার কৃষাণদের সঙ্গে তারাও লাঙলের মুটো ধরত, কোদাল ধরত, খাটো কাপড় পড়ত (Sic) ; যুদ্ধের বাজারে ধান চাল কলাই গুড় বেচে সবাই ভদ্রলোক হয়ে গেল।' "সদগোপদের ভদ্রতার দাম উসুল করতে হল অবশ্য কাহারদের। তারা পাকা পাকি ভাবে হয়ে উঠল সদ্গোপ জোতদারদের ভূমিদাস। বিষয়টি যেভাবে তারাশঙ্কর দেখাতে চান ঘটনাটি ঠিক তেমন নয়। অর্থাৎ বিষয়টি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়। টাকা হল আর ভদ্রহবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ল এটা সত্য তবে শেষ সত্য নয়। অর্থনৈতিক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র হবার আকাঙ্ক্ষার আড়ালে একটি ভিন্নতর চেতনাও আছে। বস্তুতপক্ষে সেই চেতনাই হল হিন্দুত্ব। হিন্দুত্ব অর্থাৎ তার জাতি কাঠামো এবং বর্ণ চেতনা। হিন্দুত্বের প্রতিঅভিসারিত হতে হলেঅস্পৃশ্য-তার ভেদকে মেনে নিতে হয়। যেমন হাঁসুলী বাঁকের কাহাররা মেনেছে। গোটা

উপন্যাস জুড়ে জাতি কাঠামোকে মান্য ও রক্ষার কত না আয়োজন। মানার মধ্যেই তো বনওয়ারীর মোড়লবৃত্তি, তার শৃঙ্খলা ও সম্পর্কের মায়া।

কাহারের মেনে নেওয়ার বিধি হাঁসুলী বাঁকের সময়কালীন, তারাশঙ্করের রচনায় সেই সময় ক্রমশ ভঙ্গুর—সব কিছু মেনে নেওয়ার মধ্যে এসেছে করালী, সবকিছু মেনে নেবার নীতিই অস্বীকার করেছে সে—চরম ঔদ্ধত্যে, বিচিত্র ব্যবহারে। অন্যদিকে সদ্গোপ সমাজ, তাবা তো হিন্দুত্বের ঘাটে মাথা মুড়িয়েছে আরও আগে—ভূম্যধিকার প্রাপ্ত হয়েছে, স্পৃশ্য অর্থাৎ জল-চল হয়েছে; আর সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দলন প্রক্রিয়ার যন্ত্রটি চেপে বসেছে কাহারদের উপর। যদি কাহাররা হিন্দুত্বের মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত না হতো, তাহলে তাদের উপর আর্থিক শোষণ কম হতো না হয়ত, কিন্তু যে নির্মমতাকে তারা মমতা বলে গণ্য করে তা থাকত না।

১, 'বাবুরা যেদিন আসেন, সেইদিন কুঁকড়ে অর্থাৎ মুরগী আর হাঁস—কিছু না হলে কয়েকটা ডিম কাহারেরা ভেট দিয়ে থাকে।'

২, 'পাপ-পুণ্যি বনওয়ারী বুঝতে পারে না এমন নয়, বুঝতে পারে মেয়ে-লোকের সতীত্বের মূল্য। কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎ জাতেরা তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎ জাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণ সেবা করে হাড়ি, ডোম, বাউরী কাহার। শ্মশানে থাকে চণ্ডাল। বিধির বিধান এসব। কাহার মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা? কাজেই কাহার-জন্মের একর্ম স্বীকার যে করতেই হবে।'

৩, 'কিন্তু বাবুরা তো নিজে হাতে চাষ করে না, চাষ করে কাহারেরা আর করে কাহারদের মতই হাতে নাতে চাষ করতে যাদের নীচু কুলে জন্ম তারাই। এ হল ভগবানের বিধান, বাবাঠাকুরের হুকুম। খাট, খাও। বুক পেড়ে দুহাতে খাট, সোনার লক্ষ্মীতে ভরে উঠুক হাঁসুলীর মাঠ; বাবু মহাশয়ের, সদ্গোপ মহাশয়ের ভাগ্য আর তোমাদের হাত যশ। মনিবের খামারে ধান তুলে দাও, মনিবান শাঁখ বাজিয়ে জলধারা দিয়ে লক্ষ্মী ঘরে তুলুক। তুমি আঁচলে খামার ঝেড়ে তুলে নিয়ে এস মা লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। তাই তোমার ঢের, তার চেয়ে আর বেশি কি চাও? 'যেমন বিয়ে তেমনি বাজনা'। কাহার কুলে জন্ম যখন হয়েছে, তখন এ জনমের এই বিধান।······বহু ভাগ্যে চাষের পথ খুলে দিয়েছেন কর্তাঠাকুর, সেই পথে হাঁট, ধর্মকে মাথায় রাখ। সকাল সন্ধ্যে দেবতাকে

প্রণাম করে বল—'এ জন্মে এই হ'ল. আসছে জন্মে যেন উঁচুকুলে জন্ম দিয়ো দয়াময় হরি।'

৪. বহু ভাগ্যের মনুষ্য জন্ম পেয়েও পূর্বজন্মের হীনকর্মের জন্য নীচুকুলে জন্ম হয়েছে, ঘোড়াগোত্র কাহার, মানুষ হয়েও ঘোড়ার মত উঁচু কুলের মানুষদের বহন করতে হয়…।…এসব পূর্বজন্মের ফল। আবার এজন্মে মন্দ কাজ করে কাহার থেকেও নীচকুলে জন্মাবে ?

অধিক উদাহরণ বাহুল্য। কিন্তু এই চারটি অংশের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট জাতি বন্ধন ও জন্মান্তরের ধারণা, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপরও চেপে বসা বৈধতার ধারণা ও বাধ্যতার মনস্তত্ত্ব—এখানেই রয়েছে কাহার সমাজের নিজস্ব জীবন পদ্ধতি। এ স্বতন্ত্র হতে পারে, আঞ্চলিক বর্ণময় হতে পারে, কিন্তু এ হল হিন্দুত্বের নিজস্বতা —বৈচিত্র্যের মধ্যেও তার ভারতীয় একতার তুলনা পৃথিবীতে নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে জনগণনার অনুষ্ঠান ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য-শাসকদের একটি তরঙ্গ। সারা দেশে তখন থেকে জাতে ওঠার আগ্রহ অল্প বিস্তর লক্ষ্য করি। শুধুমাত্র অস্পৃশ্যদের মধ্যে নয়, তথাকথিত উঁচু জাতরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেন নি। কিছু উদাহরণ ঃ

১. বৈদ্য ঃ

ক. ঢাকার রাজা রাজবল্লভ (১৬৯৮-১৭৬৩ খ্রীঃ)-এর নেতৃত্বে বৈদ্যরা দ্বিজত্ব দাবি করেন ; উপবীত গ্রহণ করেন।

খ. ১৮২২ নাগাদ বৈদ্যরা সামাজিক মর্যাদার দাবি করেন। স্বভাবতই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য হবার দাবি।

গ. ১৮৩৯ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক ক্ষুদিরাম বিশারদের সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'বৈদ্য সমাজ'। দেওয়ান রামকমল সেন তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণের মর্যাদা।[২]

২, কায়স্থ ঃ

ক, আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ কায়স্থদের সংগঠিত করেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের তুল্য উপবীত দাবি করেন। ব্রাহ্মণেরা এদাবি মানেন কিনা জানা যায়নি, তবে বৈদ্যরা এর বিপক্ষে হাইকোর্ট-এ বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারে কায়স্থদের দাবি অমান্য করা হয়, বলা হয় তারা দ্বিজ নন, শূদ্র।[৩]

খ, ১৭৮১ খ্রীঃ রাজা নবকৃষ্ণ দেব 'একজাই' বা কায়স্থদের সামাজিক সম্মেলন

আয়োজন করেন। কৌলীন্য না থাকলেও তিনি বিত্ত গৌরবে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের গোষ্ঠীপতি হতে পারেন।

নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাধাকান্ত দেব ১৮৩০ খ্রীঃ তৈরি করেন ধর্মসভা। উচ্চ বর্ণের মানুষরা রাধাকান্তের নেতৃত্ব মেনে নেন। পরবর্তীকালে অবশ্য কায়স্থ সমাজের নেতৃত্ব চলে যায় ছাতুবাবু তথা আশুতোষ দেব-এর হাতে। ১৮৭৯ খ্রীঃ এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি "একজাই" আয়োজন করে ব্রাহ্মণ-ঘটকদের স্বীকৃতি আদায় করেন।

একইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'মাহিষ্য'রা কৈবর্তদের থেকে পৃথক হবার দাবি করেন, আর ১৯০১-এর জনগণনায় তাদের সে দাবি মান্য করা হয়। রাণী রাসমণি এই দাবি আদায়ের কাজে সাহায্য করেন। রামকৃষ্ণ কথামৃতে অবশ্য রাণী রাসমণি কৈবর্ত বলেই উল্লেখিত হয়েছেন।

গোপ-সমাজ থেকে সরে এসে রাঢ়ের গোপদের একটি অংশ সদ্‌গোপ হিসাবে আত্ম-পরিচয় দিতে থাকেন। নবশাখ জাতির মধ্য থেকে গোপরা সরে যান, উঠে আসেন সদ্‌গোপরা। একই ভাবে কাশিম বাজারের রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দীর চেষ্টায় তেলীদের একাংশ তিলি হিসাবে নতুন জাতি নাম গ্রহণ করেন।

তথাকথিত নিম্নবর্গেও দেখা যায় একই রকম তরঙ্গ। ১৮৭২ থেকে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করছেন। ১৮৯১-এর জনগণনায় তারা 'চণ্ডাল'-জাতিনাম অস্বীকার করেন। এই শতাব্দীর সূচনায় নাপিতদের দাবি ছিল তারা 'নই-ব্রাহ্মণ' হিসাবে পরিচিত হবেন, ধোপারা বলেন, তারা চাষি বা চাষাধোপা। তাম্বুলীরা বলেন তারা তাম্বুলী বৈশ্য।[৪] মালীরা নাপিতদের মর্যাদা পেতে চান। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাদের।[৫] শুঁড়ি সাহারা বৈশ্যত্ব দাবি করেন অনুরূপ সময়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা দাবি করেন তারা ক্ষত্রিয়; পঞ্চানন বর্মণের নেতৃত্বে করতোয়া নদীতে স্নান করে গণ-উপাধিতে ধারণ অনুষ্ঠান করেন তারা। যোগী বা যুগী সমাজও দাবি করেন ব্রাহ্মণের মর্যাদা, তারা ১৮৭৭-৭৮ থেকেই এই আন্দোলন সংগঠিত করেছেন।[৬] পূর্ববঙ্গের মৎস্যজীবী তথা মালো-সমাজের আত্মোন্নয়ন-আন্দোলনের সংবাদ আছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। ভৈরব বন্দরের মালোরা যেমন—

'তারা জামা-জুতা ভাড়া কইরা রেল কোম্পানির বাবুরার বাসার কাছ দিয়া বেড়ায়, আর বাবুরাও মালোপাড়ায় বইয়া তামুক টানে আর কয়, পোলা পানে ইস্কুলে দেও—শিক্ষিত হও, শিক্ষিত হও।'[৭]

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণ দুটি পুস্তিকা লেখেন 'ঝলমল তত্ত্ব' এবং 'ঝল্লমল্ল পরিচয়'। সেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়, তারা আসলে শূদ্র নন—ক্ষত্রিয়।[৮] দক্ষিণ বঙ্গে সামাজিক আন্দোলন করেন, একই উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব দেন মহেন্দ্রনাথ করণ।[৯]

উক্ত সামাজিক আন্দোলনগুলির কথা ভুলে গেলে, বা এগুলির পাশাপাশি রেখে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি পুনরাবিষ্কার না করতে পারলে করালী-বনওয়ারীর দ্বন্দ্বের স্বরূপটি স্পষ্ট হবে না। বনওয়ারী আর করালী—দুজনেই কাহার সমাজের দুটি প্রবণতার প্রতীক। বনওয়ারীর তুলনায় করালী অনেকটাই যেন জাতি-ভেদাত্মক সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে; যদিও স্ব-সমাজের যথাযোগ্য নেতৃত্ব বনওয়ারীর আয়ত্তেই থেকে গেছে, কারণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে অতি ধীরে ধীরে। বনওয়ারীর আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ বদলের, কিন্তু ততটাই বদল তার অভিপ্রেত যতটা হলে সমাজের মূল ভিত্তিটি অটুট থাকে।

একটি ঘটনার কথা লিখি। কাহারদের জোতদার সদ্‌গোপ ঘোষ-দের পারিবারিক উৎসব বা বৈশাখ সংক্রান্তির খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় নিত্য যা ঘটে: 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদ্‌গোপ মহাশয়েরা ভোজন করেন। কাহারেরা প্রসাদ পায়, এঁটো কাঁটা সাফ করে, পাতায় পড়ে থাকা খাবার গামছায় বেঁধে বাড়ি আনে, আনন্দ করে খায় পরের দিন।'—সেই ব্যবস্থায় উঠল তরঙ্গ। বনওয়ারীকে ডেকে ঘোষদের বড়কর্তা বলতে লাগলেন: 'গলায় তোরা পৈতে নে, বুঝলি?···কাহারেরা আর কাহার নাই, বামুন। তা পৈতে নিক কাহারেরা। শেষে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বললেন—এঁটো ভাত খাবে না, নেমন্তন্ন চাই! জুতো না খেয়ে সব মাথায় উঠেছে!'

প্রত্যেক উৎসবের মতোই একটি উৎসব এসেছে ঘোষবাড়ীতে, অন্নপ্রাশন। চন্দনপুরে তখন করালী বাস করে, করালী আর পাখী—অন্য কেউ কেউ আছে, যেমন সিধু। কথায় কথায় সিধু ঘোষদের 'ছোটকা অর্থাৎ ছোট ভাই'-কে বলেছিল—আসন্ন উৎসবের প্রসাদ তারা পাবে কিনা! উত্তরে ছোটকা বলেছিল, নিশ্চয় পাবে। তারা যেন সবাই যায়—'তুই করালী পাখী যাবি, কাহার পাড়ার সবাই আসবে। করালী দাঁড়িয়েছিল কাছেই।'···সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছে সে: 'করালী কারও এঁটো কাঁটা পেসাদ খায় না। কাহার পাড়ার ছেলে ছোকরারাও বলছে—তারাও যাবে না।' সিধুকে বলেছে—তুই যদি যাস তো তোর সঙ্গেও আমরা খাব না।

অর্থাৎ করালীকে ঘিরে কাহার সমাজে নতুন এক তরঙ্গ জন্ম নিয়েছে। তার নেতৃত্বে নবীন কাহারেরা আত্মমর্যাদার আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছে। সুস্পষ্ট তার বক্তব্য: 'ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। এঁটো খেলে জাত যায়। যে কাহার পরের এঁটো খাবে, সে পতিত। তার জাত নাই।' এই 'জাত' কখনোই cast নয়, এ

হল মানবিক সত্তা। কি করে, কোন্ বাস্তব সূত্রে করালীর মানবিক সত্তার জাগরণ ঘটল, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস তা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় নি, কিন্তু আমরা দুয়েকটি ছিন্নসূত্রের সন্ধান অবশ্যই করতে পারি।

১. করালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম জীবন-পরিধির দিকে সরে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময় রাঢ় বাংলার জীবনে যেসব ঘটনার মারফৎ এসেছে তরঙ্গ, করালী তার পরিচয় নিয়ে এসেছে কাহার সমাজে।

ক. কাহারদের যে ধর্ম-চেতনা, তার মাধ্যাকর্ষণে করালী নেই, তার সংযোগ বিজ্ঞান ও আধুনিকতার সঙ্গে কর্তাবাবার অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে না। সোজাসুজি প্রশ্ন করে 'আমার মুখ খ'সে যাবে তো তোমাদের খবরদারি কেন?' এ কেবল প্রতিস্পর্ধা নয়, গোষ্ঠী জীবনকেই চ্যালেঞ্জ। কাহারদের মাঝখানে করালীই হয়ে উঠেছে প্রথম ব্যক্তি—(individual) এ তার নতুন চেতনা। এর বশেই সে আধুনিক, অভিনব, বিপজ্জনক। স্থিতাবস্থা ও বিশ্বাসের কূপমণ্ডূকদের ভিড়ে তার চলাফেরা স্বতন্ত্র, অন্যরকম ঝড়ের বার্তা বহন করে আনে। সে ঝড় সম্ভবত প্রতীক, সে কথা পরে। এখন কর্তাবাবার কথা। পোষা কুকুরটিকে যে মেরেছে তাকে খুঁজে বার করার মত সাহস আছে করালীর। অন্যেরা নিঃসন্দেহ, ঐ কর্তাবাবার অভিশাপ, করালীর কৌতূহল বস্তুবাদী। বনওয়ারীর দুঃখ ও ভয়—'হে বাবা কত্তাঠাকুর—তোমার লীলাখেলার নিরাকরণ করতে চায় ছোঁড়া!'

গোষ্ঠীসমাজের অপরাধবোধ করালীকে চঞ্চল করছে না, বনওয়ারীকে করছে। অথচ করালীও এই সমাজেরই মানুষ। কাহারদের অপরাধ-মোচনের পূজায় তার অংশগ্রহণের দিনটি স্মরণীয়। নিমতেলে পানা সুকৌশলে করালীর বলি গ্রহণ না করার দাবী জানালে করালী যা করে তা রীতিমতো চমকপ্রদ:

'...আর কোন কথা না বলে পটপট করে হাঁস তিনটের মুণ্ডু দুহাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন চায় তাই কর। আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।'

সংক্ষেপে, করালী গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বাইরে চলে গেছে। যে জীবন-বোধ, যে চেতনা কাহারদের যূথবদ্ধ রেখেছে, করালী তার বিপক্ষে প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক।

খ. করালীর মারফৎ হাঁসুলীবাঁকে এসেছে নতুন নতুন উপকরণ বা উপাদান-নির্ভর সংবাদ। 'আদ্যিকালের শিমুলবৃক্ষ বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়', সেখানে চেপেছে করালী! পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছে—হো—! ডাকছে। কাকে ডাকছে?

—হো—ব্যানো কাকা—! হো—! হো—! ··ঝড়—ঝড়!··চন্নপুরে খবর

এসেছে তারে।' ঝড়ের মতো করালীর মারফৎ ঝড়ের খবর পেয়ে কাহারকুল স্বভাবতঃই সন্ত্রস্ত। সে ঝড়ই বা কম কিসে, যা এল করালীর মারফৎ ?

অন্য একবার, সাইক্লোন এলো যে সময়, তার সামান্য আগে করালী ও বনওয়ারী দ্‌জনেই প্রকৃতি উথাল-পাথাল হবার সংবাদ পেয়েছে দ্‌ভাবে।

'প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, একে বলে—'ঝিকিমিকি বেলা'। মেঘ কেটে গিয়ে লাল আলোয় ভরে গেল আকাশ। 'চাঁকি' অর্থাৎ অস্তোন্মুখ স্‌র্য এখনও ডোবে নাই; পাটে বসে লালবরণ র্‌প নিয়ে হিল হিল করে কাঁপতে কাঁপতে ঘ্‌রছে। আকাশের মেঘে লাল রঙ ধরেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বনওয়ারী একট্‌ চিন্তিত হ'ল। কাল আবার জল নামবে। সকালবেলায় পশ্চিম দিকে 'কাঁড়' অর্থাৎ রামধন্‌ উঠেছিল, সন্ধ্যাবেলা রক্তসন্ধ্যা।'—খবর করালীও পেয়েছে, 'তারে খবর এসেছে ব্‌ষ্টি নামবে!' বনওয়ারী বিষয়টি নিয়ে মনে মনে ক্ষ্‌ব্ধ হয় করালীর প্রতি। কারণ—'বনওয়ারীর কাছে বাবা ঠাকুর আকাশময় খবর ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঝড়, বাদল-এর খবর কাহারেরা পিতিপ্‌র্‌ষ থেকে পেয়ে আসছে আকাশের কাছ থেকে, পিঁপড়ের কাছ থেকে, কাক পক্ষীর কাছ থেকে, রামধন্‌র কাছ থেকে, বাতাসের গতিক থেকে। খ্‌টিতে কান লাগিয়ে শোন তুমি কাহারকুলের জাত হারিয়ে মেলেচ্ছ হয়েছ; তুমি চন্নপ্‌রে টেলিগেরাপের খ্‌টিতে কান লাগিয়ে শোন গিয়ে এসব খবর।'

গ. বেশ কিছ্‌ ক্ষেত্রে করালীর আনা উপকরণ বনওয়ারীর তথা কাহারদের জীবনকে অন্যপথে চালিত করতে পেরেছে বটে। শালের কড়াইয়ে যেদিন গ্‌ড় জ্বাল দিচ্ছিল বনওয়ারী ও অন্যান্য কাহাররা, হঠাৎ উপস্থিত হল করালী। 'রেল-ইস্টিশনের তেরপল' নিয়ে এসেছে। তালপাতার ছাউনির উপর পেতে দিয়ে শালের আগ্‌ন রক্ষা করল তারা।

করালীর দেওয়া গাঁইতি দিয়ে বনওয়ারী চাষ করেছে সদ্য পাওয়া সাহেব ডাঙার জমিতে। এই গাঁইতি ছাড়া সাঁওতাল মজ্‌রদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না তারা।

উপন্যাসের শেষ দিকে করালীর চেষ্টাতেই কাহাররা পেয়েছে কেরোসিন ও চিনি। রেশনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই বস্তুগ্‌লি তারা কখনও পেত না। করালী তাই—'চন্নপ্‌রে ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসে নালিশ করেছে, দরখাস্ত করেছে—কাহারদের কেরোসিন দেওয়া হয় না কেন? যদি হয়, তবে সে তেল নেয় কে? তার খোঁজ করা হোক। এবং তাদের বরাদ্দ তেল দেওয়ার হ্‌কুমনামা এই খোদ আপিস থেকে দেওয়া হোক।'

২. করালী চরিত্রটির সম্ভাবনা ও স্বাতন্ত্র্য অবশ্য তার উৎস থেকেই। করালীকেই বলতে পারি কি সেই মান্‌ষ যার কিছ্‌ নেই—যে-সর্বহারা? স্নেহ সে পায়নি। অতি শৈশবেই মা তার চলে গেছে অন্য কোন প্‌র্‌ষের সঙ্গে, রেলপথকে ঘিরে গড়ে ওঠা গঞ্জ চন্দনপ্‌র, হারিয়ে গেছে—যেখান থেকে কেউ কখনো ফেরে না।

প াঁচ বছর বয়স যখন তার, তখন তাকে ফেলে তার মা পালিয়ে যায় ওই চন্নপুরে ইস্টিশানের একজন লোকের সঙ্গে। তখন ওই রেললাইন তৈরি হচ্ছে, দেশ-দেশান্তর থেকে লোক এসে লাইন বসাচ্ছে, কোপাইয়ের উপরে পুল তৈরি করছে, সে যেন এক মস্ত ব্যাপার ক'রে তুলেছে। হাঁসুলী বাঁকের মেয়েরা খাটতে যেত চন্নপুরের গাড়িঘর তৈরির কাজে। রেল-লাইনের ঐ মস্ত ব্যাপারে যাওয়া ছিল তাদের বারণ।··· করালীর মা বিধবা হয়ে চন্নপুরে বাবুদের বাড়ি মজুরনী খাটতে গিয়ে পয়সার লোভে ইস্টিশানে কারখানার লোকদের সঙ্গে 'গোপ্ত' যোগাযোগ পাতায়। তারপর সে একদিন সন্তানের মায়া পর্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল কোথায়। কেইবা খোঁজ করবে? আর খোঁজ করেই বা কি হবে? করালী কাঁদতে লাগল।'—এই দুঃখ তার অচিরেই লজ্জায় মিশে নির্বাক হল। কুলত্যাগিনী মায়ের দুঃখ, ও লজ্জার ভার, নতুন অর্থনীতির ভার আর পুরণো ব্যবস্থার নির্মম চাপ—করালীকে দুমড়ে মুচড়ে ভিন্ন মানুষ বানিয়েছে।

মাইতোঘোষ, বনওয়ারী যার কাছে বারো বছর বয়সে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করে দেয়—করালীকে করেছে চরম অপমান। ঘটনাটি সামান্য। স্টেশন মাস্টারের মেয়েটিকে মালিকের নামে রেলের পারসেলে আসা আম খেতে দিয়েছিল সে, বলেছিল হাঁক করে 'আমার মুনিব তেমন লয়'। বাইরে এসেছিল জমাদার। সেও দুটি আম না নিয়ে ছাড়েনি। 'শুধু ছাড়লে না নয়, পকেট থেকে ছুরি বার করে একটা আম কেটে খেয়ে আমের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে এক চাকা আম করালীকে আস্বাদন করিয়ে তবে ছাড়লে।' স্বভাবতঃই মুখে গন্ধ পাওয়া গেল। যথারীতি 'মেজ ঘোষ নিজেই পায়ের চটি খুলে 'পেচণ্ড' পেহার দিলেন।' তাড়িয়ে দেওয়া হল তাকে। বকেয়া পাওনাটুকুও পেল না। স্টেশনমাস্টার করালীকে প্রথমে গুদাম-এর কুলীর কাজ তারপর লাইন ইন্সপেক্টারকে ধরে দিলেন কুলী গ্যাঙের কাজ জুটিয়ে। যে অর্থনীতির চক্রে তার মা হারিয়ে গিয়েছিল—সেই চক্রেই ঢুকে পড়ল করালী। এরপর তার যা কিছু সবই এই নতুন ব্যবস্থার ফল।

বিষয়টিকে একটু অন্যভাবেও দেখা সম্ভব। সদ্‌গোপ জমিদারদের সঙ্গে যে বন্ধনে কাহাররা সাধারণভাবে যুক্ত ছিল, করালী ঠিক তেমনভাবে যুক্ত ছিল না। তার কাজ ছিল 'রাখালি কর্ম'—'গরু চরাত, গোবর কুড়াত, ফাইফরমাস খাটত। মধ্যে মধ্যে ঘোষকে ইস্টিশানে গাড়িতে চড়িয়ে দিলে প্রতিবারই সেজ ঘোষ তাকে একটি করে আনি দিত।' অর্থাৎ সম্পর্কটি ছিল তুলনায় শিথিল। যে সম্পর্ক কাহারদের চিরকালের মতো আত্মমর্যাদা বোধ লুপ্ত করে দেয়, করালীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে পরে। ততক্ষণে সে নিজেই অর্থবান ও জগৎ-জীবনের অন্যতর সত্য তার সামনে যথেষ্টই উপস্থিত।

লক্ষ করেছে করালী, কেমন এক দুমোঁচ্য সম্পর্কে কাহাররা যুক্ত হয়ে আছে—সদ্‌গোপ প্রভুদের কাছে নিত্য অপমান সহ্য করে। রতনের কথাই বলি। মনিব

তার হেদো মণ্ডল, 'বুনো দাতাল শুয়োরের মত গোঁ, রেগে যখন মারে, রতনও মনিবের কিলকে ভয় করে। মনিব রাগে, চীৎকার করে, আর কিল মারে। চীৎকার ক'রে যতক্ষণ কাশি না পায়, গলা না ভাঙে, সে ততক্ষণ এই কিল চালায়। সে কিল আস্বাদন করা আছে রতনের, একটি কিলেই পিঠখান বেঁকে যায়, দম আটকে যায়। এর ওষুধও কিন্তু ওই দম বন্ধ ক'রে থাকা আর চুপ করে থাকা।······আর কিল খেয়ে যত চুপ ক'রে থাকবে, মনিব তত চীৎকার করবে রাগে। তাতে সহজেই গলা ভাঙে কাশি পায় মনিবের, কাশি পেলেই মনিব ছেড়ে দিয়ে নিজের গলায় হাত দিয়ে কাশতে শুরু করবে।' মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে এই নিষ্ঠুর অমানুষিকতার তুলনা নেই। হেদো মণ্ডল বিশ্রী রকম গালমন্দ করে যখন রতনকে তিরস্কার করতে থাকে 'রতন ঘাড় হেঁট করে কান টানতে থাকে। এটা কাহারদের সবিনয় অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গী। এর সঙ্গে মুখে একটু হাসিও থাকা চাই—নিঃশব্দ দন্ত বিকশিত।······অর্থ হ'ল এই যে, মনিবের তিরস্কারের অন্তর্নিহিত সদুপদেশ এবং স্নেহ সে অনুভব করতে পারছে।'—একেই বুঝি বলে মনস্তাত্ত্বিক দাসত্বের বন্ধন। এই বন্ধন আছে বলেই তারা সদ্গোপ প্রভুদের বাড়ির গোরুর বাছুর হবার সংবাদ অন্যদের ডাক করে বলে, কর্তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা যাই থাক না কেন, তাদের জমি সামান্য সামান্য করে বাড়িয়ে 'চৌরস' করতে চায়।

করালী এইরকম সম্পর্ককে অস্বীকার করেছে। ভাষায় ও বেশবাসে সে কাহার-পাড়ায় নবতরঙ্গ—নতুন দিনের মানুষ সে। আত্মমর্যাদা তার অন্য সকলের চেয়ে বেশি। কাহারপাড়ায় করালী যেন ভিন দেশী মানুষ। জাত এক হ'লে কি হয়, রীতকরণ, আলাপ—বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলীবাঁকের কাহার পাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে।'—ভাষায় ও বেশবাসে করালীর অভিনবত্বের, সবটাই যে ইতিবাচক তা অবশ্য নয়। বিশেষ করে নারী সম্পর্কে তার ব্যবহার রীতিমতো বিভ্রান্তিকর, অনৈতিক।

নারী সম্পর্কে হাঁসুলী বাঁকের দৃষ্টিভঙ্গি তীব্র পুরুষবাদী, অমানবিক। নারীদের তারা ব্যক্তিত্বে উত্তরিত হতে দিতে চায় না—নারী নিতান্ত পণ্যতুল্য, কেবলমাত্র ব্যবহার যোগ্য। আটপৌরে পাড়ার রমণ যখন কালোশশীর বোনঝি সুবাসীর সঙ্গে কোশ কেঁধেদের বনওয়ারীর সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক গড়ার কথা ভাবল, তখন তার ভাবনা রীতিমতো মনুষ্যত্ব ও বিবেকবর্জিত; 'শালীর কন্যে আর পালতে দেওয়া গাইয়ের বাছুর—দুই-ই সমান। ভদ্রলোক গাই-গরু কিনে কাহারদের পালন করতে দেয়, কাহাররা গাইটিকে খাইয়ে বড় করে, গাইবাচ্চা প্রসব করে, কাহারেরা দুধ খায় আর পায় ওই বাছুরটির অর্ধেক স্বত্ব।' মানুষ আর গরুর মূল্যমান কাহারদের কাছে সমান। আত্মক্ষয় আর আত্মধিক্কারের, আত্মসংকোচন আর অন্তহীন অন্তর্দাহ তাদের—একের কষ্ট অন্যের পরে সরে সরে যায়। নারী ও দুর্বলতর শিশুরা কাহার সমাজে সবচেয়ে বেশি শোষিত হতে থাকে।

করালীর যাবতীয় ইতিবাচক অবস্থান ও সক্রিয়তা একটা কাম্য লক্ষ্য পেতেও পারত যদি তার মধ্যে রঙের খেলার ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হত। কোন কোন সমালোচক বলেছেন, আমাদেরও মনে হয়েছে, করালীর বিষয়ে তারাশংকর সমাপ্তি পর্বে যথেষ্ট মনোনিবেশ করেন নি। হয়ত তিনি যথেষ্ট ভেবে চিন্তে করালীর পরিণতিটি রচনা করেন নি। হাঁসুলি বাঁকের মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন করে যখন সে পাড়ি দিয়েছে, অনির্দেশ্য ভাবী-সময়ের দিকে, ভিন্ন এক অর্থনীতির আবহে—তার পক্ষে ফিরে আসা আর কি সম্ভব? এতো আর স্বপ্নের সত্য নয়—গান্ধীজীর গ্রামস্বরাজ খুবই ভালো তত্ত্ব হতে পারে—কিন্তু ভারতবর্ষে তাতো স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং উপন্যাসের শেষে নায়ক করালী, যার কথা ভেবে প্রথম দিকের সমালোচক উচ্ছ্বসিত—ব্রাত্য ভারতবর্ষের দীপ্ত ও দৃপ্ত প্রতিনিধি সে :

হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, আর মাটি খুঁড়ছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।'—কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। করালীর ফেরা বোধ করি অসম্ভব। নগর তথা ধনতান্ত্রিক সভ্যতারও তো নিজস্ব কিছু ন্যায় আছে। কিংবা, এও বলা চলে হাঁসুলী বাঁকের চেহারা যতই বদলাক করালী মোটেই আহামরি কিছু বদলায় নি।

বিশেষতঃ নারী সম্পর্কের চেতনায় করালীর দৃষ্টি পুরোন যুগের ধ্যান ধারণারই সামান্য পরিবর্তিত রূপ। এক্ষেত্রে তার ধারণায় বিন্দুমাত্র আধুনিক মন রক্ষিত হয় নি। পাখীকে পাবার জন্য হেঁপো রুগী নয়নের প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করতে তার বাধে নি। সুবাসী, যে কিনা গ্রামসম্পর্কে মামীমা, তাকে বিয়ে করার সময় পাখীকে বলেছে : জানিস, পোষ মাসে একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারোমাস পৌষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশী হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।

করালীর মতো নায়ক, যার মধ্যে তারাশংকর আধুনিকতার যুগ-লক্ষণ যোগ করে দিতে চান, তাকে এই ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রচনা করলেন কেন? করালীর আধুনিকতা, নতুন আর্থ সামাজিক কাঠামোর উপযুক্ত হয়ে আসা—তার অধিকারবোধ, আত্ম-মর্যাদার ধারণা, আইন-সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান সবই অস্বীকৃত হয়ে যায়।

করালী-বনওয়ারীর মাঝখানে সব দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে একটি নারী—সুবাসী। সুবাসীরই মতো আর এক নারী কালোশশী তাকেও দেখতে পেয়েছি পরম আর বনওয়ারীর সব দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে। পরমের কথা লিখি। পরম, কাহার সমাজের জন্ম অপরাধিত্বের ধারণার প্রতিনিধি, আটপৌরে কাহারদের শেষ অধিনেতা। পরম আর বনওয়ারী-রা মিত্রদের বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল সেদিন—পরমরা নেচেছিল রায়-বেঁশে নাচ। বনওয়ারীরা চিরাচরিত পাল্কী বাহকের ভূমিকায় স্বতঃস্ফূর্ত ছিল সেদিন। ফেরার পথে বড় ডাঙার মধ্যে 'ঝাঁকড়া গাছতলায়' বনওয়ারী-পরমের

সুতীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল। যেখানে পাল্কী বহন শেষে কাহার পুরুষরা যুগ যুগ ধরে পাওনা ভাগ করে নিয়েছে, কাহার মেয়েরা চন্দনপুরে যাওয়া-আসার পথে মিলিত হয়েছে, কখনো কখনো এই জায়গাটি হয়েছে তাদের প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবার সংকেতস্থান, সেখানেই একদা "কাহারেরা চুরি করবার আগে জমায়েৎ হত'—সেই প্রতীককল্প স্থানটিতে বনওয়ারী—পরমের যুদ্ধ, কাহার পাড়ার আদিম জীবন-বৃত্তের অন্তর্গত উপকথার মতোই ভয়াবহ। 'দুই বুনো দাঁতালে গুঁতোগুঁতির মত লড়াই। একালে সে লড়াই লজ্জার কথা।'—ভেবেছিল বনওয়ারি, তবু আত্মরক্ষার জন্যই সেদিন লড়াইয়ে অংশ নিতে হয় তাকে। আজ এতদিন পরে, করালী-বনওয়ারীও লড়াই করল, একই ভঙ্গীতে।—তারাশংকর লিখেছেন হাঁসুলী-বাঁকের বাঁশবনের ছায়ায় একদিন যুদ্ধটা শুরু হয়েও শেষ হয় নাই। আজ শেষ না ক'রে ছাড়বে না বনওয়ারী।' অর্থাৎ করালী-বনওয়ারীর লড়াইটাও ধারাবাহিক। হাঁসুলী বাঁকের মাধ্যাকর্ষণ-লীলার মধ্যেই বীরবিক্রমে সূচনা হয়েছিল যে প্রাধান্যের, কৌম নেতৃত্বের যে প্রতিযোগিতা অরণ্য আদিম বীর হনুমান সদৃশ, পরম-বনওয়ারীর সংঘাতের কেন্দ্রে ছিল নারী—কালোশশী। আজকের দ্বন্দ্বেও বনওয়ারী-করালীর মাঝখানে কালোশশীর মতোই একটি নারী—সুবাসী। মনে পড়তে পারে আমাদের, কালোশশীর মৃত্যুর পর, তারই মতো দেখতে তার বোনঝি সুবাসীকে দেখে বনওয়ারী ভেবেছিল কালোশশীর ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। 'কালোবউ কি মোহিনীরূপ ধরে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে?'—ভেবেছিল বনওয়ারী। আমাদের মনে হয় এ হল তারাশংকরের সচেতন আগ্রহের ফল। তারাশংকর কাহার সমাজের বিবর্তনের ক্ষেত্রে যোজনা করতে চান কৌম জীবনের অধিকার। পত্তনের আদিম একটি সূত্র জন-সম্পদ, শস্যসম্পদের মতোই নারী হল একটি সম্পদ, তার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বের মধ্য দিয়েই কাহার সমাজের নেতৃত্ব অবিসম্বাদী হতে পারে। এই ধারণাটি মেনে নিলে পরম-বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব আর বনওয়ারী-করালীর দ্বন্দ্ব একই মানদণ্ডে বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু পরম-বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব আর বনওয়ারী—করালীর দ্বন্দ্ব একই মানদণ্ডে বিবেচনা করা যায় না।

পরম-বনওয়ারীর দ্বন্দ্বের ভিত্তি গ্রামীণ কৌমসমাজের দুটি ভিন্ন প্রবণতা। পরমকে যদি বলি **food gatherer** প্রবণতার মানুষ, বনওয়ারী হল **food producer** দুই প্রবণতা খুবই মৌলিক ও স্বতন্ত্র। কিন্তু এ কোন বাইরের প্রবণতা নয়। কাহার সমাজের একান্ত নিজস্ব দুটি ধারাকে তারা ধারণ করেছে। পরম তাদের পুরোন বৃত্তি. কুঠিবাড়িতে চাকরি, লাঠি নিয়ে ঘুরত-ফিরত, আবার দরকার মত সাহেব মহাশয়দের ঘরদোরের কাজ করত অষ্টপ্রহর তারা নীলকরদের খাস চাকরের লাঠিয়ালের কাজ করতো, তাই তারা হয়েছিল অষ্টপ্রহরী বা 'আটপৌরে'। বনওয়ারী-রা ছিল 'কোশকেঁধে'; তারা পাল্কী বেহারার কাজ করতো। বনওয়ারীর পূর্বপুরুষ এক কাঁধে পাল্কী নিয়ে এক ক্রোশ পথ চলে যেত, কাঁধ পর্যন্ত বদল করত

না —তাই ওদের বাড়ির নাম 'কোশ কেঁধে'। কালক্রমে নীলকররা চলে গেল, এল চৌধুরীদের আমল। বদলে গেল কাহারদের বৃত্তি। বন্যার পর নীলকর সাহেবরা হারিয়ে গেল, তার আগে তারা ছিল 'পাহাড়ের আড়ালে।' যদিও নির্দিষ্ট ছিল না কোনো পেশা। কখনো বেহারা, কখনো লেঠেল, এই ছিল তাদের বৃত্তি। চৌধুরী জমিদারেরা তাদের বেঁধে ফেলল বৃত্তির আড়ালে: 'চৌধুরী বেবাক চাকরান জমি খাস করে নিয়েছে এখন। বললে—"আমার তো পাল্কি বইতে হবে না বারো মাস, বেহারাদের চব্বিশঘণ্টা হাজির থাকতেও হবে না—চাকরান জমি আমি দোব কেনে?' বহু কান্নাকাটির পর বাস্তু জমিগুলো তারা রক্ষা করতে পারলেও বৃত্তি আর থাকল না। এখন থেকে কোশকেঁধেরা হয়ে গেল চাষী—ভাগচাষী বা ক্ষেতমজুর। অন্যদিকে আটপৌরেরা চাষাবাদকে মানিয়ে নিতে পারল না। অন্যত্র একটি ছোটগল্পে বাগদীরা যেমন ভেবেছিল:—

'আমাদের কুলের গরম—লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন থেকে এ আমাদের ব্যবসা। চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ; মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত।' (আখড়াইয়ের দীঘি)—তেমনি অনিশ্চিত অপরাধ-প্রবণতার মাধ্যমে জীবন নির্বাহ হত তার। পরম কাহার নিরুদ্দেশ হবার পর রমণের নেতৃত্বে আট-পৌরেরা সদলবলে বনওয়ারীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। যে সমাজে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, প্রজন্মের ব্যবধানে, যুগের বিবর্তনে, বাস্তবের প্রয়োজনে তা এক হয়ে উঠল। সমাজ সংহতির এই ক্রান্তি লগ্নে কাহারদের নেতা অবিসম্বাদী ভাবে বনওয়ারী:

'এক অদ্ভুত রাত্রি। কাহারপাড়ার সায়েব মশায়দের আমলে দু-ভাগ হয়েছিল তারা। পরমেরা লাঠি নিয়ে আ্যটপৌরে হয়েছিল, বনওয়ারীরা পাল্কী কাঁধে নিয়ে কাহার হয়েছিল, অনেকদিন দু-পাড়ার সে আমল ঘুচে গিয়েছে, চাষই করে আসছে দুজনে কালে কম্মিনে এরা পাল্কী বয়, ওরা রায়বেঁশে নাচে। তবু এতদিন ওরা সেই ভিন্নই ছিল। আজ সেই ভেদ ঘুচল।'

পরম-বনওয়ারীর গোষ্ঠীগত বিভেদ কৌমগত ভেদ কখনোই ছিল না। পক্ষান্তরে করালী-বনওয়ারীর পার্থক্য, সে তো যাকে বলে মৌলিক।

করালী সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। আর্থ সামাজিক কাঠামোর ফল। কিছু উদাহরণ আগে দিয়েছি। এবার বলি আরও কিছু যুক্তি—ক. কোঠাবাড়ি তৈরি করতে বহু টাকা দরকার। পাবে কোথায় তার জামাই। বসন্তের এই আশঙ্কার উত্তরে করালী জানায়—স্টেশনে একজনের কাছে টাকা ধার করে সপ্তাহে সপ্তাহে শোধ করে দেবে সে। 'চন্নপুর ইস্টিশানে একজন মাড়োয়ারী আছে সে গোটা ছোট লাইন বরাবর লাইনের বাবু থেকে আরম্ভ করে কুলীদের পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। টাকায় নেয় এক আনা হিসাবে সুদ, সপ্তাহে সপ্তাহে এক পয়সা হিসেবে টাকায় সুদ সে আদায়

নেয়। মাসের শেষে কিছু করে আসলে উসুল চায়। দিতে পার ভাল, না পার তম্বি নাই। আর তিন মাসের কালে আসলে উসুল কিছু চাই-ই। করালী তার কাছেই একশো টাকা নেবে।' বসন্ত শুনে চমকেছে। চমকানোরই কথা। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ হিসেব—এ কারবার নতুন।'

খ. 'পাগল কাহার ধার করেছিল কাবুলীওয়ালার কাছে। শোধ দেয়নি। ধার করে র‍্যাপার কিনেছিল সে। 'আগাসাহেবের কাছে। টাকা দেবার কথা পরের বছর। কিন্তু পাগল দেশ ছেড়েছে। টাকা আদায়ের সময় আগা এসে ওকে পায় নাই। আজ আগার সঙ্গে পাগলের দেখা হয়ে গিয়েছে। পাগলের টাকা দেবার ইচ্ছা নাই, এমন নয়, কিন্তু গতবারে যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই বলেই ভয়ে সে ছুটে নদী পার হয়ে পালিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, আগাও ছুটেছে—এসে তাকে ধরেছে। রুপিয়া ফেকে। দুচার ঘা দিয়েছেও।···ঠিক সেই সময়েই কাজ সেরে চন্নপুর থেকে করালী ফিরছিল। চীৎকার শুনে করালী ছুটে গিয়েছে এবং আগার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে।—খবরদার! মারে গা তো মাথা ভাঙ্ দেখা তুমারা।'

বস্তুতপক্ষে দুটি ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত যে করালী সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির মানুষ। করালীর সম্পর্ক আর গ্রামীণ নেই, হাঁসুলী বাঁকের কর্তাবাবার দৃষ্টি সীমার বাইরে, তাঁর হাঁটা চলা - বাঁশ বাদি'র সীমানা যেখানে শেষ।

আর একটি কথা, করালী-বনওয়ারীর দ্বন্দ্বে করালীর নেতৃত্বে কারা আশ্রয় নিয়েছে? তারা কাহার সমাজের তরুণ প্রজন্ম। তারাশংকর ভেবে বা না ভেবে যেমন করেই লিখে থাকুন, এ থেকেও বুঝি করালীর অভিঘাত কাহার সমাজের ধাইরের ও ভিতরের অভিঘাত। কোনমতেই কৌম সমাজ টিঁকিয়ে রাখার দায় তার নেই। কর্তা বাবা যদি চলেই গিয়ে থাকে, কাহারদের প্রাণ-সত্তার শেষতম চিহ্ন বাঁশবাদির অন্ধকার যদি লুপ্ত হয়েই যায়, যদি শোনা যায় সেখানে শেষ প্রহরের বিষণ্ণ সুর—তারাশংকরের বিবরণে : 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় শেষ কালে শুধু গাছকাটার শব্দ''—তাও যদি শোনা গিয়ে থাকে, তার দায় কেবলমাত্র করালীর একার নয়। দায়ী নতুন সমাজ-ভাবনা আদর্শ ও আধুনিকতা। করালী যার স্পর্শ পেয়েছে। হয়ে উঠেছে ভয়ংকর অমিতবিক্রম। তাই বলছিলাম বনওয়ারীর সঙ্গে পরমের দ্বন্দ্ব যদি একসঙ্গে পায়ে পায়ে চলা দুটি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, বনওয়ারী করালীর দ্বন্দ্ব কখনই তা নয়—কোনক্রমেই তারা সমকালীন নয়। করালীর অগ্রগতি রোখার সাধ্য বনওয়ারীর নেই। আর সে কারণেই বনওয়ারীর স্ত্রীকে বিবাহ বা অধিকারের মাধ্যমে যে কর্তৃত্ব তা অনেকটাই আপতিক, চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হয় আমাদের।

রায়বেঁশে নাচের শেষে পরমরা খুলে ফেলছিল তাদের পোষাক। 'ঘাঘরা, বডিজ, পায়ের নুপুর, কানের মাকড়ি।' মেয়েদের মতো সাজ করে তারা আদতে একটি

অতি প্রাচীন সমাজপদ্ধতির স্মৃতি উদ্রেক করে গেছে। ছিল কখনো এমন এক সময় যখন পুরুষরা নারীর বেশ ধারণ করে বিচিত্র আনুষ্ঠানে যুক্ত হত। এরকম অনুষ্ঠানের পরিচয় পাই সুদূর অতীতকালে, পৃথিবীর নানা দেশে। এর উৎস ছিল নারীপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা থেকে সরে এসে পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ-এর সময়কার সমাজ ব্যবস্থার সূত্রে। নারীপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার দুটিনটি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল। ১. সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছিল **female line** অর্থাৎ মায়ের সম্পত্তি পেতো কন্যা। ২. মন্দিরের পূজা ব্যাপারে ছিল নারী পুরোহিতের কর্তৃত্ব। ৩. অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক নেতৃত্ব ছল নারীর, বিশেষত **witch craft** এর ক্ষেত্রে। ৪. কৃষি প্রধান সমাজের গোড়া পত্তনের সময় এই ঘটনা খুবই স্বাভাবিক ছিল কারণ মেয়েদের হাতেই প্রথম দিকের কৃষি ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। **Sir George Traze** লিখেছেন :

"On the whole, then, it appears highly probable that as a consequence of a certain natural division of labour between the sexes women have contributed more than men towards the greatest advance in economic history, namely the transition from a natural to an artificial basis of subsistence' : ১১

ধীরে ধীরে নারী সমাজের কাছ থেকে কৃষির নেতৃত্ব চলে গেল পুরুষের হাতে ; কিন্তু রাঢ় বাংলার কৃষিজীবী মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যে আজও তারা স্মৃতি থেকে গেছে। সুচাঁদ যে কাহারদের লোক সংস্কৃতি (যা আসলে কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে তাদের যুক্ত হবার ইতিহাস ছাড়া কিছু নয়) বহন করে, রক্ষা করে তার সূক্ষ্ম কারণটি সম্ভবত এখানে নিহিত। স্মরণে আসতে পারে সুচাঁদের অনুভূতি। সে তখন চন্ননপুরের ভদ্রলোকদের বাড়ি গিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে, ইস্টিশানের গাছতলায় ব'সে বলে।...'শ্রোতারা কেউ শোনে গোড়াটা, কেউ মাঝখানটা, কেউ বা শেষটা। অর্থাৎ খানিকটা শোনে, তারপর উঠে চলে যায়। বুড়ী আপন মনেই ব'লে যায়। গল্প শেষ ক'রে বলে—বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিষ যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে, হাতে রাখলে......নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে ; তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত। তাতো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই এ উপকথার শেষ। তবে পার তো লিকে রেখো।' —বলতে সাধ যায়, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসটি হৃদয়ের বস্তু রপ্ত করেই তারাশঙ্কর লিখতে চেয়েছেন।

সুচাঁদ-এর পর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' হারিয়েছে তার যথার্থ উত্তরাধিকার। উপন্যাসের শেষাংশে আমরা লক্ষ্য করি উপকথার লোকগীতির-পরিণতি ঘটেছে। এই লোকগীতির রচয়িতা পাগল কাহার, উত্থাপক নসুবালা।

'পাগল গায়—

যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশের হয় বাঁশি
বাঁশ বাদির বাঁশগুলিরে তাইতো ভালোবাসি।

নসু নাচতে নাচতেই গান ধরে।

বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার-কুলের পিতা
বাঁশ বনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা

পাগল গানের মধ্যেই কাহার পাড়ার আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে ব'লে যায়। সর্বাগ্রে বলে—সৃষ্টিতত্ত্ব; শেষে বলে সেই শেষ কথা—দুঃখই বা কিসের, চোখের জলই বা ফেলছ কেন ?'

পাগল ও নসুরাম তথা নসুবালার এই যৌগপত্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট শিল্প কৌশল বলে মনে করি। তিনি পুরুষে পুরুষে বিবাহ দিয়ে যেন বলতে চান, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা এবার সত্যি সত্যি উত্তরাধিকারহীন হল। আগেই গিয়েছে মাটি, হাওয়া, জল, পরিবেশ—চলে গেছে অভিভাবক দেবতা, পরিষ্কার দুটুকরো হয়েছে তার চাতাল, আর আজ সে মানুষগুলিও আর নেই। সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে—ইতিহাস বড় নির্মোহ, নির্মম অনিবার্য।

পরিণতি সকলের অদ্ভুত। বনওয়ারীর মতো শুরবীর মানুষ হয়ে গেছে নিতান্ত তুচ্ছ। বুড়ো রমণ, আটপৌরেদের মাতব্বর—দুই গোষ্ঠীর মিলনের পর যে কিনা বনওয়ারীর ঘরে বসেই কাল কাটাতো—পালিয়েছে সর্বাগ্রে। 'বনওয়ারীর একটা ভাল গাই পাইকারদের বিক্রি ক'রে দিয়ে মাঠের পথ ধরে পালিয়েছে। শোনা যায়, সে আছে কাটোয়ায়, লাঠি হাতে কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে। বলে শেষ দশা, তাই এলাম মা-গঙ্গার ধারে। হাড়কখানা গঙ্গায় পড়লে আসছে জন্মে উচুকুলে জনম টনম হবে।' নিম তেলে পানা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, 'জেলাপীর পাক বুদ্ধি'—চুরি করে জেল খানায় গেছে। করালী সুবাসীকে বিয়ে করার পর পাখী আত্মহত্যা করেছে, তার আগে করালীকে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। সব থেকে বড় কথা। 'হাঁসুলী বাঁকের বুকের মধ্যে উপকথার কৌটার ভিতর ভোমরা ভোমরীর মতো কালো কাহার দের মেয়ে-পুরুষরা' কেউ নেই—'করালী তাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছে। চন্দনপুরের কারখানায় মজুরী খাটছে—খাচ্ছে। কেউ কেউ সন্ধ্যেতে আসবে। কতক বা আসবে না। বেশির ভাগই আসেনা।'

পাগল আর নসুরাম সম্পূর্ণ অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে। পাগল তো রাঢ়ের উদাসীন বাউল জাতীয় চরিত্র। উৎপাদনের সময় তার খবর মেলে না, উৎসবের সময় হঠাৎ হাজির হয়। কিন্তু নসুবালা ? সে তো বাংলা সাহিত্যে সব থেকে স্বতন্ত্র্য সব থেকে মৌলিক এক গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ চরিত্র। বিশ্ব সাহিত্যেও এমন কোন চরিত্রের কথা আমার জানা নেই। কিছুদিন আগে একটি কোরীয় ফিল্ম দেখেছিলাম—নাম মনে নেই। একটি গ্রামীণ পরিবেশে থাকত একটি তরুণ

নপুংসক। গ্রামের মেয়েরা তাকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ আচার অনুষ্ঠান পালন করতো। ঐ নপুংসক তরুণকে গোটা গ্রাম মনে করতো তাদের কৌম জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। হয়ত সেই ছিল গ্রাম জীবনের প্রকৃত প্রাণ ভোমরা। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই নসুবালা, অনেকটা যেন ঐ ফিল্মের আদলেই—আদিম এশিয়াটিক কোন ভাব-সত্যের অনুকল্প। 'ভাবে ভঙ্গিতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত।...মেয়েদের সঙ্গে গোবর (sic) কুড়ায়, কাঠভাঙে, ঘর নিকায়, চন্দন পুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়।...মেয়েদের সঙ্গেই সে ব্রতপার্বণ করে।...পাড়ার বিয়েতে নসুবালাই বাসরে নাচে, গান গায়। শুধু পাড়ায় নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে যে কোন ঘরে ধুমধামের বিয়ে হলেই নসুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর দেয়। নসু খোঁপা বেঁধে, আলতা প'রে, রঙিন শাড়ি প'রে, কপালে সিঁদুর ঠেকিয়ে অর্থাৎ টিপ পরে রওনা হয়, আবার উৎসব মিটলে ফেরে।' বলা বাহুল্য, বিবাহ ও অন্যান্য লোকাচারে তার উপস্থিতি রীতিমত নপুংসক পৌরোহিত্যের কথা স্মরণ করায়। এ যেন পশ্চিম এশীয় দেবীদের মন্দিরের প্রাগৈতিহাসিক নপুংসক পুরোহিতদের রাঢ়ীয় সংস্করণ।১২ বস্তুত পক্ষে নসুবালা বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণভাবেই অভিনব একটি চরিত্র।

ইদানীং কেউ কেউ বলতেও পারেন এর মধ্যে হয়ত বা সমকামিতার ইঙ্গিত বিদ্যমান। 'করালীর ঘরে সেই গৃহিণী' জাতীয় ইঙ্গিত হয়ত সেদিকে লক্ষ্য করেই রচিত।১৩ তবে মূল বিষয়টি ভিন্ন এক স্তর থেকে ধরা হয়েছে। নারী পুরোহিতদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পুরুষ পৌরোহিত্যের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে ছিল তাদের নেতৃত্ব—যারা কিম্পুরুষ, কিন্নর বা বৃহন্নলা। নসুবালা যে গ্রামীণ কৌম সমাজের ভালো মন্দের সঙ্গে মিশে থাকা মানুষ, তাতো বনওয়ারীর শেষ অবস্থার সময় স্পষ্ট হয়ে আসে। বলেছে নসুবালাঃ 'আমি করালীকে শাপ শাপান্ত করে গাল দিয়ে চলে এলাম—গাঁয়ে চলে এলাম।.. এসেই মনে পড়ল তোমার কথা। আর তোমাকে কে দেখছে? ঘরে তো দ্বিতীয় জন নাই। সুবাসী পালিয়েছে, অমন পালিয়েছে, কে দেখবে? রোগা মানুষ, প্রবল জ্বর, অচেতন অবস্থা—কি হবে মানুষটির?... সংসার নিয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত, মাথার ঘায়ে পাগল কুকুরের অবস্থা; তাদেরই বা অবসর কোথায়! মেয়েরা দু একজন আসছিল, যাচ্ছিল, দেখছিল; কিন্তু ঘরে তো আর স্ত্রীলোক ছিল না। শুরবীরের মত বিকারগ্রস্ত পুরুষ বনওয়ারী, পরের ঘরের স্ত্রীলোকেরা তাকে সামলায় কি করে? তবে কি মানুষটা (মানুটা—ছাপা হয়েছে) এতবড় শুরবীর, এতবড় মান্যের 'লোকটি'—বিনা সেবায় মরবে? রাত্রে জলের জন্য হাঁ করে জল পাবে না, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে ছাতি ফেটে মরে যাবে? আমার মন বললে—তবে তু কি করতে আছিস? ভগবান যে তোকে পুরুষ গড়েও মেয়ের মন দিয়েছে, মেয়ের মতন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, কেনে দিয়েছে? আর এক দণ্ডের জন্য ভাবলাম না। চলে এলাম, শিয়রে এসে বসলাম।'

নসুবালার মধ্য দিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার জগৎ আর একবার কথা কইতে

চেয়েছিল, তখন তো আব উপকথা থাকে নি—লোকসঙ্গীত হয়ে গেছে। চ্যুত হয়েছে তার গ্রামীণ বস্তুগত ভিত্তি। নসুবালা বহন করে এনেছে বহুযুগ সঞ্চিত রাঢ়বাংলার অন্ত্যজ সমাজের গ্রাম পত্তনীও নগরায়নের ইতিহাস। মাঝখানের সুবিস্তৃত যে ফাঁকা জমি, সে জমি সুচাঁদ কাহারনীর; সে জমিতে বনওয়ারী পরনের অমানুষী সংগ্রাম হয়ে গেছে : সে জমিতে কর্তাবাবাঠাকুর দাঁড়িয়ে থাকতেন– 'এই ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষি, এই পৈতে'···। বলতে দ্বিধা নেই এই দেব কল্পনা হিন্দুয়ানির দ্বারা প্রভাবিত। আর কাহাররা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েই বাঁ তে চেয়েছিল। করালীই ছিল উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বাংলা সাহিত্যে করালীদের কথা শোনা দরকার, আরও বেশি করে॥

অনুষঙ্গ ঃ

১. "আমার কালের কথা"; 'তারাশঙ্কর স্মৃতি কথা'—গ্রন্থভুক্ত। প্রথমখন্ড। নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৪। ৪৩ পৃঃ।

২. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়; 'জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ'। কলকাতা—১৯৮১। ২২ পৃঃ।

৩. তদেব।

৪. 'তাম্বুল বণিক বা বঙ্গীয় তাম্বুলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস'– দুর্গাচরণ রক্ষিত। কলকাতা—১৩১০ বঙ্গাব্দ।

৫. 'The Malis' of East Bengal' – U. N. Mukherjee, কলকাতা ১৯১১ খ্রীঃ। ১-৪ পৃঃ।

৬. হিন্দু সমাজের গড়ন ঃ নির্মল কুমার বসু। বিশ্বভারতী।

৭. তিতাস একটি নদীর নাম ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ। পুঁথিঘর। কলকাতা।

৮. পুস্তিকা দুটি প্রকাশ পায় যথাক্রমে ১৯১৪ এবং ১৯২৪ সালে।

৯. "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ"

১০. স্মরণ করতে পারি কোঠাবাড়ি তৈরির সময়, বনওয়ারীর নির্দেশে নির্মীয়মান বাড়িটি ভেঙে ফেলার পর দারোগার বক্তব্যঃ 'ঘর ওর ছিল ওখানে সেই ঘর ভেঙে নতুন করছে, জমি চৌধুরীদের হোক আর নাই হোক, তারা খাজনার মালিক, খাজনা পাবে; ঘর করতে বাধা দিতে কেউ পারবে না। আর পাড়া নিয়মের কথাও চলবে না। কোঠাই করুক আর গম্বুজ করুক, ওকে করতে দিতে হবে।'

১১. **Sir James George Frazer : 'The Golden Bough' Part V, Vol I Third Edition London, Macmillan and Co Ltd., Newyork, St. Martins Press, 1955, P 129.**

১২. ১৮০৯ খ্রীঃ বুকানন হ্যামিলটন বর্ণনা দিয়েছেন মালদহের জাঙ্গুলী টোটার বৈষ্ণবদের সম্পর্কে ঃ

'In the territory of Gour at a place called Janggalitola is the chief seat of the Sakhibhav vaisnavas who dressed like girls assume female names dances in honour of god.'

১৯৩২ খ্রীঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন গোপাল হালদারকে ; সেখানে একটি অসাধারণ বর্ণনা আছে, উদ্ধার করছি ; নবদ্বীপের রাধারমণ আশ্রমের অনুষ্ঠানের বিবরণ

'রাত্রে ছিল রাধারমণ আশ্রমে (ললিতা দেবীর সমাজ বাড়ীতে) শারদ রাসোৎসব। ললিতাদেবীর পরিচয় জানেন চরণদাস বাবাজীর শিষ্য, সখীভাবে সাধনা করেন, স্ত্রীলোক সাজিয়া থাকেন (ব্রজগোপী)···ললিতাদেবী শ্বেত বা শুক্ল অভিসারিকার বেশে, কীর্তন করিতে করিতে বাইজীদের মত 'ভাও বাতলানো' ভাবে অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিতেছেন, তাহার পরণে সাদা মখমলের ঘাগড়া শাড়ি, ওড়না, তাহাতে সাদা জড়ির পাড়, হাতে গহনা, নাকে বেসর, নথ ও নাকছাবি, প্রৌঢ় বয়সের gross চেহারার পুরুষ চোখে কাজল, মুখে সকালে কামানো সত্ত্বেও দাড়ির রেশ, আর গায়ে তিনি দুই শিশি অতি উগ্রগন্ধের এসেন্স ঢালিয়াছেন।·· সঙ্গে আটজন বৈষ্ণব বাবাজী সাদা কাপড়ে মেয়ে সাজিয়া এক একটি সখীর মূর্তি ধরিয়া উদ্দণ্ড নাচিতেছেন। যাহোক ব্যাপারটি দেখিয়া মনে বেশ একটা আঘাত লাগিল, একটা জুগুপসার ভাব আসিল, সাবেক কালের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেন বৈষ্ণব জনসাধারণকে প্রশ্রয় দিতেন না, তাহার একটু ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আথেন্সের জেউস বা হিলিয়াস বা আথেনে দেবতার কোন অ-হেল্লেনীয় দেবতার নারীবেশী ছিন্নমুষ্ক পূজকদের উদ্দণ্ড বাদ্য ও নৃত্য দর্শনে কিরূপ জুগুপ্সার ভাব উদয় হইত, তাহার একটি আভাস বার বার মনের মধ্যে যেন আসিতে লাগিল।' 'পরিচয়' সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা। আগস্ট সেপ্টেম্বর—১৯৭৭ খৃঃ। ৮-৯ পৃঃ।

অন্যত্র তারাশঙ্কর চন্দনপুরের বাসিন্দা করে একটি উপন্যাসে বিস্তৃতভাবে নসুবালার বর্ণনা করেছেন, সেখানে তার সঙ্গে থাকে ভাঁজো-সুন্দরীর মূর্তি, এক বৈষ্ণব-পুতুল শিল্পী কুমোরের সঙ্গে তার পরিবার, এক চালের নীচে বাস।

১১০ আমাদের আরও মনে পড়তে পারে পাগল কাহারের ব্যবহার। মিত্র বাড়ির বিয়ের পালা তখন সাঙ্গ : ওইযে! নসুবালা হাতছানি দিয়ে ডাকছে খিড়কীর দোরে। নসুবালার কাপড়খানা একেবারে 'অঙে-অঙে' 'অঙ্গা সনজে' হয়ে গিয়েছে। খুব রঙ মেখেছে নসু। গলা ভেঙে গিয়েছে। গান গেয়েছে দিনরাত। হাতে দু'হাত ভ'রে কাঁচের রেশমী চুড়ি পরেছে।

বনওয়ারী পাগল এগিয়ে গেল। পাগল মুচকি হেসে বললে তা হ'লে গাঁয়ে ফিরে আমার সাঙাটাও হয়ে যাক ব্যানো ভাই। কনে তো তৈরি।

নসুবালা গাল দিয়ে উঠল—মরু মরু, মুখপোড়া! ভদ্দনোকের ঘর মান না! নিলেজো, গলায় দড়ি দেগা!'

সেদিন হয়ত নিছক তামাসাই ছিল, আজ পাগল-নসুবালার জীবন একসঙ্গে মিলে মিশে গেছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : চিরায়ত জীবন

সুমিতা চক্রবর্তী

উপন্যাসটি আমাদের বহুকালের চেনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখাটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৪৬-এর শারদ সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকায়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। পরের বছরেই হয় তার দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৫১ সালে প্রকাশ পায় তৃতীয়সংস্করণ। প্রতিটি সংস্করণেই লেখক যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছিলেন উপন্যাসটির। এই উপন্যাস তারাশঙ্করের শিল্পীজীবনের এক তাৎপর্যময় সৃষ্টি। লেখাটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তারাশঙ্করের জীবৎকালেই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র নয়টি সংস্করণ হয়। প্রতিটি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন লেখক, এমনকি নবম সংস্করণেও।

লেখক যেমন উপন্যাসটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত, পাঠকও উপন্যাসটিকে গ্রহণ করেছেন আন্তরিকতায় আর আগ্রহে। লেখকের আগ্রহের কারণটি বোঝা যায়। বিংশ শতাব্দের ত্রিশের দশকে বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি সুনিশ্চিত পালা বদল ঘটেছিল। বাঙালি ভদ্রমধ্যবিত্তের জীবনের একদিকে বৃত্ত অতিক্রম করে উপন্যাসের অবলম্বন হয়ে উঠছিল। বিশিষ্ট আঞ্চলিকতায় পটভূমিতে বিন্যস্ত আদিবাসী এবং উপজাতি সমাজ; অন্যদিকে নির্দিষ্ট এবং কায়িক শ্রমবৃত্তিধারী জন গোষ্ঠী সমূহ উঠে আসছিল নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে। এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে-সব উপন্যাসে সেগুলির মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রথম পর্যায়ের প্রয়াস হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার আগে 'কল্লোল' পত্রিকার কালে (১৯২৩—৩০) শৈলজানন্দের উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণীকে রূপায়িত করবার চেষ্টা ছিল, সাঁওতাল জনজাতিগোষ্ঠীকে কথা সাহিত্যে নিয়ে আসবার অভিপ্রায়ও ছিল তাঁর। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পসার্থকতা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। 'কল্লোল' পর্বের লেখকদের এ জাতীয় অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, সেইসঙ্গে তাঁদের মানসিকতায় রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস জনিত বাধা ও ছিল দুরতিক্রম্য সে-কারণে জনজাতি-বৈশিষ্ট্য, বৃত্তিগত অনুপুঙ্খ আঞ্চলিকতার চিত্ররূপ—কোনদিকই যথার্থ ভাবে পরিস্ফুট হতে পারেনি।

'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কেও সেই অভিযোগ একটু তোলা যেতে পারে। পদ্মাতীরবর্তী মৎস্যজীবীদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত সমস্যা এই উপন্যাসে খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। মৎস্যজীবী না হয়ে কুবের যদি কৃষিজীবী হত তাহলেও উপন্যাসের

প্রধান কেন্দ্রবিন্দুটির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হত না। জমিদার নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ক্রমে ভাঙছে এবং গড়ে উঠছে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক শোষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র। এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কুবের পেয়ে যায় সমগ্র দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব। কপিলার সঙ্গে তার সম্পর্কটিও গোষ্ঠী-প্রেক্ষিত ছাড়িয়ে যাওয়া যে-কোনো নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ। বস্তুত, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নদী ও মাঝি কোনো উপাদানই খুব আবশ্যিক নয়। যেন আঞ্চলিকতা এবং বিশিষ্ট গোষ্ঠী পরিচয় লক্ষণ—এই দুটি দিককেই ক্রমে মুছে দিতে থাকে 'পদ্মানদীর মাঝি', উপন্যাসটি। সেই তুলনায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ'—এই প্রতিটি উপন্যাসেই অঞ্চল এবং বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট বৃত্তিজীবীর মানুষেরা সামূহিক স্পষ্টতা পেয়েছে অনেক বেশি।

কিন্তু এ সত্যটি অস্বীকার করা যায় না যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বাঙালি পাঠককে অনেকটা সচেতন করেছিল। আমরা জেনেছিলাম চাকুরিজীবী এবং জমির ধান বাড়িতে বসে ভোগ করা বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনবৃত্তের বাইরেও উপন্যাস নিজেকে বিস্তৃত করতে পারে। লেখকরাও সমাজের ভিন্ন দিগন্তের দিকে ক্রমে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করেছিলেন। চল্লিশের দশকেই আমরা পেলাম তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। হাড়ি সম্প্রদায়-ভুক্ত কাহার জনগোষ্ঠীর সর্বায়ত পরিচয় উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করেছেন লেখক। এই চল্লিশের দশকে আরও একজন সাহিত্যিক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী নিয়ে কিছুটা কাজ করবার চেষ্টা করেছিলেন। পরে তিনি প্রধানত বাঙালি জীবনের রূপকার হিসেবেই অর্জন করেছিলেন উল্লেখযোগ্য শিল্পসিদ্ধি। আমরা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা বলছি। নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বহুবচন' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৪৬-৪৭ সালে (আষাঢ় ১৩৫৩—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় (১৯৬০) উপন্যাসটির নাম হয় 'রূপমঞ্জরী'। এই উপন্যাসে তিনি 'ঢুলি' এবং 'ভুঁইসালি'—এই দুই সম্প্রদায়ের জীবনযাপন, রীতিনীতি, উৎসব সংস্কার, বৃত্তিগত বিশিষ্টতা এবং জীবিকার সংকট তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এই জাতের উপন্যাস রচনায় তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি ছিল না—একথা বুঝেই সচেতন লেখক পরবর্তীকালে নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের রূপ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

চল্লিশের দশকের উপান্তে সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত ঢোঁড়াই চরিত মানস' জনজাতি গোষ্ঠীর রূপায়ণের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সৃষ্টি হয়ে আছে। 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৪৮-৪৯ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাসে উত্তর বিহারের আঞ্চলিক বিশিষ্টতার সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ, দুটি জনজাতি গোষ্ঠীর

প্রায় পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এবং প্রাসঙ্গিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—এই সবই পাওয়া যায়।

তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় চিরকাল রাঢ়ের মানুষ, তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি যে, কলকাতার নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যোগ-স্থাপনের অভিপ্রায় নিয়ে তিনি কলকাতায় আনাগোণা শুরু করেন প্রথম। কল্লোল পত্রিকার দপ্তরে তিনি দু-একবার গিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ'-এর কার্যাবলীর সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন প্রথম দিকে। সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। পরিণত জীবনে তারাশংকর কলকাতার অধিবাসী হয়েছিলেন; পরিভ্রমণ করেছিলেন ভারতের বহুস্থান এবং তিনি পেয়েছেন সাহিত্যসৃষ্টির জন্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সর্বভারতীয় পুরস্কার।

কিন্তু তারাশংকরের স্মৃতিকথা থেকে এ-ও জানা যায় যে সুমার্জিত নাগরিকতার উপর পালিশ কোনদিনই তাঁর আচরণ ও সাজসজ্জায় কোন চকচকে ভাব আনতে পারেনি। 'পরিচয়' এবং 'কবিতা'-র নগরশোভন, বৈদগ্ধ্য-বিভা সমুজ্জ্বল' আলোচনার আসরে তিনি কখনও প্রবেশই করেন নি। তারও আগে কল্লোল-এর পাঁচমিশেলি নাগরিক আবহাওয়াতেও তিনি কখনও স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। এইসব আসরগুলিতে তাঁকেও খুব আগ্রহের সঙ্গে কেউ বরণ করে নেয়নি। তারাশংকরের বাগভঙ্গীতে বীরভূমের আঞ্চলিক উচ্চারণের টান এবং আঞ্চলিক ভাষার শব্দাবলী চিরকালই থেকে গিয়েছিল।

লাভপুরের গ্রাম সমাজে বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণের অবস্থানে ছিলেন তারাশংকর। তাঁর প্রপিতামহ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুরের আদি ব্রাহ্মণ বংশে বিবাহ করে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। স্ত্রী-র সুবাদে তিনি লাভ করেছিলেন পুষ্করিণীসহ ভু-সম্পত্তি এবং পত্তনি মহাল। নির্দিষ্ট বার্ষিক আয় ছিল সে মহালের। তখন থেকেই তাঁরা কেবল ব্রাহ্মণই নন, জমিদারও। রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষদের হাতে সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। আবার আরো উত্তরপুরুষদের হাতে সে সম্পত্তি বহু শরিকে ভাগ হবার ফলে জমিদার বংশের দাপট হয়ে যায় নগণ্য। লাভপুরের কয়লার ব্যবসায়ে লক্ষপতি হয়ে ওঠা যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকরের সম-সাময়িক ছিলেন। সামন্ততন্ত্রের শেষ নিঃশ্বাস ও নব্য ধনতন্ত্রের সগৌরব উত্থান তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

তবু ব্রাহ্মণ জমিদারের চালচলন, মর্যাদাবোধ, জীবন-যাপন ও দৃষ্টিকোণ—সবই তখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিল তারাশংকরদের পরিবারে। প্রশ্ন এই—এই পরিবারের সন্তান ও এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়েও জনজাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তারাশংকর এত আগ্রহী হয়ে উঠলেন কিভাবে। এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত দু'একটি কথায় দেওয়া যাবে না। আমাদের অনুভব করতে হবে সম্পূর্ণ পশ্চাৎপট।

বীরভূম শব্দের অর্থ বীরের ভূমি নয়, অরণ্য-আকীর্ণ অঞ্চল। মুনডারি ভাষায়

'বির' শব্দের অর্থ অরণ্য। এই অঞ্চল থেকে শুরু করে পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের সুবিস্তৃত ভূমি বহুকাল পর্যন্ত ছিল গভীর জঙ্গলে ভরা। সেই আরণ্য-আবহ এবং আদি দেশজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের শিকড় এই অঞ্চলে এত গভীরভাবে প্রবিষ্ট যে সেই প্রবল আদি মৃত্তিকা-শক্তির চাপ থেকে তথাকথিত উচ্চতর সংস্কৃতির মানুষেরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না। তাঁরাও নিজেদের মিশিয়ে ফেলেন, অনেকটা অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান সেই দেশজ সংস্কৃতির অনু-আর্যতার বিস্তারে।

স্থানিকতার এই ক্রম-প্রভাবিত করবার ক্ষমতা একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। যে-কোনো মেট্রোপলিস-এ দেখা যায় এই স্থানিক আবহ-চাপের ফলে আঞ্চলিক মানুষ তার আঞ্চলিকতা অনেকখানি হারাতে বাধ্য হয়। কলকাতায় পা রাখবার পর ঝুপড়ির ঘর কিংবা ফুটপাথের অস্থায়ী আবাসে নাগরিক শ্রম-নির্বাহী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, বাগদি, বাউরি, হাড়ি, ডোম-কে তাদের সর্বায়ত গোষ্ঠীগত লাক্ষণিকতায় আর পাওয়া যায় না। তারাও ক্রমে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় তাদের আদি ক্রিয়া-করণ। পার্বত্য বা সমুদ্রভূমির জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এই আদিবাসী এবং আগত জনসম্প্রদায়ের পারস্পরিক গ্রহণ বর্জন চলতেই থাকে। আঞ্চলিকতার এক সুবিপুল মুখব্যাদান আছে। তার গ্রাস থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারে না।

সর্বোপরি তারাশংকর কেবল বাস্তব-সচেতন নন, ছিলেন বাস্তব-মনস্ক শিল্পী। নিজস্ব আঞ্চলিকতাকে অস্বীকার করবার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। সাহিত্যিক রূপে সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হবার পরেও যখন তিনি আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি এবং বীরভূমের স্থানীয় ভাষার গড়নটি নিজের সংলাপে ধরে রাখেন তখন একধবনেব স্বভূমি-শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তারাশংকরের তা ছিল বলেই সাহিত্য রচনায় আঞ্চলিক উপাদান আর অঞ্চলের মানুষের এত অনায়াস স্বীকরণ তাঁর লেখায়।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে জমিদারই আসুক বা জনজাতিগোষ্ঠী-ভুক্ত মানুষই আসুক, অথবা আসুক বিভিন্ন বর্ণাশ্রমভুক্ত জাতির বিভিন্ন বিত্তস্তরের মধ্যশ্রেণীর মানুষেরা—সকলের উপরেই পড়ে বীরভূমের খরা-গৈরিক রঙের প্রলেপ। বরং নাগরিক পরিবেশ, রুচির নাগরিকতাই তাঁর কলমে তেমন ফোটে না।

তারাশংকরের জীবন-বীক্ষণ ও ছিল বীরভূমের প্রান্তরের মতো বিস্তৃত। খুব ছোটো জীবন, একান্ত ঘরের জীবন নিয়ে লেখার আগ্রহ তেমন দেখা যায় না তাঁর। দিন বদল, সমাজ বদলের চলচ্চিত্র আর প্রক্রিয়া তাঁকে সমধিক আকর্ষণ করত। বিভিন্ন শ্রেণীর, বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকে দেখতে, চিনতে, জানতে ভালোবাসতেন তিনি। আ-জন্ম সন্নিহিত বসবাসের ফলে জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষদের আপনার লোক ভাবতে তাঁকে কোনো চেষ্টা করতে হয়নি। প্রজা-জমিদার, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের শত্রুতা সম্পর্কেও যেমন সত্য, তেমনি এই সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কও ভারতের ইতিহাসের আর এক সত্য। একটি দেখছি বলে অন্যটি না দেখলে তা হয় অসম্পূর্ণ দেখা।

তারাশঙ্কর এভাবে দেখেছিলেন বলেই জনবসতি গোষ্ঠীর জীবন নিয়ে রচিত তাঁর একাধিক উপন্যাস শিল্প-সার্থকতা পেয়েছে। সেই তুলনায় বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লেখা মধ্যবিত্ত কাহিনীমূলক উপন্যাসেই তিনি তেমন সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। একমাত্র 'বিচারক' ছাড়া একান্ত মধ্যবিত্তের সাংসারিক ও মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক সংকট নিয়ে তাঁর স্মরণযোগ্য কোনো লেখার কথা মনে পড়ে না। জনজাতি জীবন নিয়ে যখন লিখেছেন তারাশঙ্কর তখন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধও আরোপ করতে যাননি তাদের উপর। একদিকে নির্মোহ দ্রষ্টা, অন্যদিকে সহমর্মী বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর। এদিক থেকে তিনি কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়েও। শেষোক্ত দুই লেখক কোনো সময়েই মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের মূল্যবোধে শৃঙ্খল ছেঁড়বার চেষ্টা করেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মূল্যবোধের আত্মপ্রতারণার দিকটি খুলে দেখিয়েছেন কিন্তু বিকল্প মূল্যবোধের কোনো আদর্শ নেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে। যেখানে সাম্যবাদের সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন সেখানেও মধ্যবিত্ত জীবনদৃষ্টির অচলায়তন তেমন ভাঙতে পারেননি। পদ্মানদীর মাঝির সংসারের ছবিটি তাই মধ্যবিত্তের সংস্কার দ্বারাই পরিচালিত দেখতে পাই। বিভূতিভূষণ সেই মূল্যবোধকে প্রশ্ন করেছেন কখনো কখনো কিন্তু তাকে আঘাত করবার কথা ভাবতেও পারেননি। তাঁর 'দেবযান'-এর স্বর্গ, 'পথের পাঁচালী'-র নিশ্চিন্দিপুর আর 'আরণ্যক'-এর লবটুলিয়া ও নাঢ়াবইহার—সর্বত্রই সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতার স্বীকৃতি। জনজাতিগোষ্ঠীর জীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে তারাশঙ্করের মতো নির্মোহ অনুরাগের দৃষ্টি কেবল সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এই পাওয়া যায়।

জনজাতিগোষ্ঠী নিয়ে তারাশঙ্করের রচিত উপন্যাসগুলির শিল্প-সার্থকতা বিষয়ে আর একটি অধুনা স্পষ্ট হয়ে ওঠা মতবাদের প্রসঙ্গ মনে পড়ে। বর্ণাশ্রম ও দারিদ্র্য—এই উভয় দিক থেকেই পশ্চাৎপর বর্গের মানুষকে নিয়ে, প্রধানত সেই বর্গের মানুষকে নিয়ে রচিত প্রতিবাদী মানসিকতার কথাশিল্পকে আজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্যের প্রবক্তাদের একটি অভিমত হল—উচ্চবর্গের লেখকেরা কখনই পশ্চাৎপর বর্গের অর্থাৎ দলিত মানুষদের জীবন নিয়ে সত্যসমুজ্জ্বল সাহিত্য রচনা করতে পারবেন না, কারণ—তাঁদের পরম্পরা বাহিত জীবনবোধ ও সংস্কার তার বিরুদ্ধে। উচ্চবর্ণের লেখক জনজাতিগোষ্ঠী নিয়ে উপন্যাস লিখলে তা ভ্রান্তিপূর্ণ, ঔদাসীন্য-চিহ্নিত, অ-গভীর ও অক্ষমতা-প্রসূত রচনা হতে বাধ্য। দলিত সাহিত্যের প্রবক্তাদের কথায় তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, সমরেশ বসুর প্রতি বিদ্রূপের উক্তিও উচ্চারিত হতে শুনেছি।

অভিযোগটি যদি একটু তলিয়ে ভাবি তাহলে প্রথমেই স্বীকার করা ভালো যে জনজাতি জীবন সম্পর্কে উচ্চবর্গীয় লেখকদের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি একজন জনজাতি-

গোষ্ঠীভুক্ত লেখকের মতো যথাযথ হওয়া দুরূহ—প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত অনেক ব্যক্তি সম্পর্কেই যাঁরা জনজাতির আদি জীবনাচরণকে কিছুটা পিছনে ফেলে এসেছেন। আজ সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ফলে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা উচ্চশিক্ষা ও চাকুরিক্ষেত্রে দ্রুত প্রবেশ করতে পারছেন। তাঁদের শ্রেণীভুক্ত একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আধিকারিক বা করণিক নিজের সন্তানদের স্বাভাবিক ভাবেই যে-শিক্ষা দেবেন তারই ফলে তারা নিজেদের আদি আঞ্চলিক সংস্কার ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেই প্রক্রিয়া যথেষ্টই শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। তখন সেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ লেখক হলে তাঁরা তাঁদের নিজেদের জাতিগোষ্ঠীকে চিনবেন—কুলীন ব্রাহ্মণ ও ভূম্যাধিকারীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তারাশঙ্কর সম্ভবত তার চেয়ে অনেক বেশি চিনতেন এই লোকায়ত সংস্কৃতির মানুষগুলিকে। তবুও সেই অভিজ্ঞতার বলয় সম্পূর্ণ ভরাট না হবারই সম্ভাবনা। সেজন্য আমরা সমালোচনাও একটু করতে পারি, যদি সে সমালোচনা করবার মতো প্রকৃত অভিজ্ঞতা আমাদের কারো থাকে। কিন্তু অভিযোগ বা বিদ্রূপ কখনই তাঁর প্রাপ্য নয়।

কাহারদের নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে শিল্পীর পূর্ণ আলোকসম্পাত গিয়ে পড়েছে এই কাহার সমাজের উপর। এই গোষ্ঠী, তাদের ইতিহাস, জাতি-পরিচয়, বাসভূমি, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস সংস্কার, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জীবিকার সংকট সমাজ ও ব্যক্তির সংঘাত, ভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক—এসবই তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন কাহার সম্প্রদায়ের দিক থেকে। উপন্যাস প্রকৃত বাস্তব হয়ে ওঠে প্রেক্ষাপট আর উপাদানের সত্যতায় কিন্তু উপন্যাস হয়ে ওঠে মানুষকে শিল্প-রেখায় জীবন্ত করে তুলতে পারলে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে লেখক কেবল কাহার সম্প্রদায়ের নরনারীকে সর্বতোভাবে প্রাণবান করে তোলার কথাই ভেবেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মতো কোন 'হোসেন মিয়াঁ' জাতীয় চরিত্র প্রাধান্য পায়নি এই উপন্যাসে। বিভূতিভূষণের আরণ্যক'-এর মতো কোন সত্যচরণ নেই এখানে যার 'ভদ্র' মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই হবে গরিব গাঙ্গোতা আর দোসাদ-দের জীবন। বনওয়ারী, করালী, পানু আর পরম কাহারকে ঠিক তাদের মতো করেই বাড়তে দিয়েছেন তারাশঙ্কর, দেখিয়েছেন তাদের বাহির ও ভিতরের পাশাপাশি কোনো সমান্তরাল উপস্থিতি ঘটাননি অন্য কোনো সম্প্রদায়ের। বাবুসমাজের কোনো সম্প্রদায়ের। বাবু-সমাজের যে প্রসঙ্গটুকু এবং চিত্রণ উপন্যাসে এসেছে তা কেবল কাহারদের অর্থনৈতিক অবস্থান বোঝাবার জন্যই। যে-সমপ্রদায়ের পাল্কি বহন করে, সম্পত্তি পাহারা দিয়ে, মুনিষের কাজ করে, গৃহকর্ম-সহায়ক হয়ে কাহারদের জীবনযাত্রা—সেই সম্প্রদায়ের কিছুটা উল্লেখ উপন্যাসে থাকাই সঙ্গত। কিন্তু এই বাবু সম্প্রদায়ের কোনো চরিত্রই উপন্যাসে কোনো গুরুত্ব পায়নি। স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি কেউ, প্রাণময় একটি শৈল্পিক চরিত্র হয়ে ওঠেনি কেউ-ই। বিশেষত

কাহার-সম্প্রদায়ের নারী-চরিত্রগুলি—সুচাঁদ, বসন্ত, গোপালীবালা, কালোশশী, সুবাসী, পাখি এবং নারীসুলভ আচরণ-সম্পন্ন পুরুষ নসুবালা (সে নপুংসক কি না তা খুব স্পষ্ট করে বলেননি তারাশঙ্কর)—এদের যে সাবলীলতায় এবং অনায়াস প্রত্যয়সিদ্ধিতে গড়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর তাতে মনে হয় দীর্ঘকালের নিকট পরিচয় না থাকলে তা করা সম্ভব নয়। খুবই লক্ষণীয় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিভূতিভূষণ জনজাতি-গোষ্ঠীর নারীচরিত্র সৃষ্টিতে গোষ্ঠী-পরিচয়-চিহ্ন খুব বেশি রাখতে পারেননি। কুবেরের স্ত্রী মালা ও প্রেমিকা কপিলা—দুজনেই নারী-হৃদয়ের বাসনা কামনা নিয়ে মূর্ত হয়েছে, মাঝি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী-পরিচয় সেখানে নগণ্য। বিভূতিভূষণের আরণ্যক-এ ভানুমতী আর কুন্তা দুজনেই যথাক্রমে সম্প্রদায়-বৃত্ত অতিক্রম করা এক মধুর প্রাণোচ্ছল তরুণী আর সংযত দুঃখিনী বিধবা। কেবল গাঙ্গোতা সম্প্রদায়ের নকছেদী ভগৎ ও তার দ্বিতীয়া পত্নী মঞ্চিকে কিছুটা স্বাভাবিকতা দিতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু তারাশঙ্করের সাফল্যের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে তুলনা চলে না অন্য দুই লেখকের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি যেখানে মূলগত ভাবেই নাগরিক (আর্বান) সেখানে তারাশঙ্করের দৃষ্টিকোণ—যাদের কথা বলেছেন কেবল তাদের দিকেই ফেরানো। বিভূতিভূষণ যেখানে একান্তই মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ধারক সেখানে তারাশঙ্কর সংস্কারহীন হয়ে ভালো মন্দের বিচারে না গিয়ে কাহার সমাজের চিন্তাপদ্ধতির স্বাভাবিকতাবেই তুলে ধরেছেন সর্বত্র। এজন্য কোনো চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়নি। স্বতঃস্ফূর্ত ছিল সবটাই।

মহাশ্বেতা দেবী যখন উপন্যাসে মুন্ডা, লোধা বা শবর জনজাতিগোষ্ঠীকে চিত্রিত করেন তখন সেই গোষ্ঠী-পরিচয়কে নিবিড় সত্য করে তোলবার পরিবর্তে তাঁর দৃষ্টি থাকে তাদের পশ্চাৎ বর্গীয় অবস্থান সম্পর্কে উচ্চবর্গীয় পাঠককে সচেতন করে তোলবার দিকে। তাঁর শৈল্পিক অভিপ্রায় ও তাই, সে-কারণে তাঁর রচিত উপন্যাসের পক্ষে এই রীতি খুবই মানানসই হয়। কিন্তু বিশিষ্ট সেই জনজাতি সম্পর্কে তাঁর বিবরণ হয় বহিরাবরণস্পর্শী মাত্র, শোণিত-মজ্জাস্পর্শী নয়। উপন্যাস হিসেবে মহাশ্বেতার রচনার মতো উত্তীর্ণ বলে যদি না ও মনে করি, নারায়ণ সান্যালের 'দন্ড শবরী'-তে জনজাতি-গোষ্ঠী ও জীবন অনেক বেশি অনুপুঙ্খে বিবৃত।

দেবেশ রায় থেকে অভিজিৎ সেন—এঁদের মধ্যবর্তী স্তরে আছেন আরো কোনো কোনো লেখক যাঁরা জনজাতি-জীবনকে চেনেন অনেকের চেয়েই বেশি। কিন্তু তাঁদেরও শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্যমুখ থাকে সেই জীবন চেনানো নয়, তাঁরা আধুনিক ভারতের দেশ-কাল, সমাজ-সংস্কৃতি এবং দেশের প্রশাসন পরিচালিত রাজনীতি-অর্থনীতির বিচিত্র টানাপোড়েনের বিভিন্ন বিপরীত চাপে বিপন্ন জনজাতির মানুষের বিপন্নতাটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। কোথাও কোথাও তাঁদের প্রয়াস অতুলনীয় সফলতা পেয়েছে। কিন্তু তাঁদের, যেমন মহাশ্বেতারও, শিল্প সৃষ্টির

অন্তরের কথাটি হল শোষণকে স্পষ্ট করে দেখানো, কিভাবে সবল দুর্বলকে গ্রাস করে তারই লিপিচিত্র তুলে ধরা। বিশিষ্ট সেই জনজাতিগোষ্ঠীর নিজেদের ভিতরের সমস্যা, দ্বিধা-সংকট, আত্ম-দ্বন্দ্ব, পশ্চাৎমুখী সংস্কার বিলাসী জীবনের অনিবার্য প্রলোভন ইত্যাদি পিছুটানগুলির প্রসঙ্গে তাঁরা কিছুটা নীরব থাকেন। সেই রন্ধ্রগুলিতে আলো ফেলবার চেষ্টা করেন না। এই লেখকদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের শিল্পরীতি অবশ্যই একাত্ম হয়। কিন্তু তারাশঙ্করের শৈল্পিক উদ্দেশ্যটিই আলাদা। তিনি নির্দিষ্ট এক জনজাতিগোষ্ঠীর পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরতে চান— আর কিছু নয়। দেখাতে চান কিভাবে দেশ ও কালের বিবর্তনে বহু সংঘাতের ব্যথা সহ্য করে ক্রমিক ও সার্বিক পরিবর্তন সাঙ্গীকৃত করে নিচ্ছে সেই সম্প্রদায়।

বাংলা সাহিত্যের আরো এক ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার কোনো কোনো উপন্যাসে উত্তর বাংলার জনজাতিগোষ্ঠীকে মূর্ত করেছেন। সেসব উপন্যাসে দেখা যায়, জনজাতি সম্প্রদায়ের সমূহ রূপটি সম্পর্কে অমিয়ভূষণ সর্বাঙ্গীন জ্ঞাত। বিদগ্ধ বিশ্লেষকের মনন আর রূপকারী শিল্পীর চোখ - দুটিতেই তাঁর সমান অধিকার। একদিক থেকে তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরও একটু মিল আছে। দুই লেখকই প্রধানত বিশিষ্ট সম্প্রদায়টিকেই স্বরূপে পূর্ণ দেখাতে চান। দুজনেই মূর্ত করেন জনজাতি গোষ্ঠীর উপর বহমান কালস্রোত ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির ভাঙাগড়ার চিহ্নগুলি। যেমন তারাশঙ্কর তুলে ধরেন কাহার, বেদে, ডোম সম্প্রদায়ের সামগ্রিক চেহারা, তেমনি অমিয়ভূষণ মেচ, রাভা প্রমুখ উত্তরবঙ্গের জনজাতি গোষ্ঠীর ছবি এঁকেছেন, অনেকক্ষেত্রে তাদের সম্প্রদায়গত বিশিষ্টতাগুলিকেও নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু দু একটি ক্ষেত্রে দুই লেখকের আছে অনেকখানি তফাৎ যে-কারণে এই দুই লেখকের লেখার সাদৃশ্যের দিকটি পাঠকের প্রায় চোখেই পড়ে না। অমিয়ভূষণের দৃষ্টিতে মাখানো আছে অনেকখানি রোমান্টিকতা। তাঁর চোখ ও মন সুন্দরের সন্ধান করে। নিসর্গরূপে মানব রচিত যে-কোনো স্থাপত্যের রূপে, নারী-পুরুষের শরীর ও মনের রূপে আবিষ্ট হয়ে যান তিনি। নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে কামমোহিত আকর্ষণের বন্ধন তাঁর চোখে অমোঘ সুন্দর হয়ে ধরা দেয়। এই সৌন্দর্য-মুগ্ধতা অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু এত মোহময় তাঁর বর্ণন যে পাঠকের মন বাস্তবের সমগ্রতা ধারণ করতে ভুলে যায় অনেক সময়ে। তাই জনজাতি তাঁর উপন্যাসে আছে কিন্তু তাদের গোষ্ঠীগত সর্বাঙ্গিত সম্পূর্ণতা তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় হয়ে ওঠে না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপদৃষ্টির প্রকৃতি আলাদা। বাস্তবের সত্যতাই তাঁর চোখে শিল্পের সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র অন্যতম নায়ক বনওয়ারী স্রষ্টা বিধাতার মোটা হাতের কাজ -"লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, কিন্তু গড়ন-পিটনটা কেমন যেন মোটা হাতের, অথবা গড়ার সময় ওরা যেন অনবরত নড়েছে; পালিশ তো

নাই-ই।"—এই বনওয়ারী-র ভিতরের সৌন্দর্য কুঁদে বার করে এনেছেন তারাশঙ্কর। উপন্যাসের দ্বিতীয় নায়ক করালী-র শরীর কাঠামোয় সরু ছেনির টান আছে। তার চিকন শ্যামল রং, চওড়া বুক, সরু কোমর, পেশীবহুল হাত, দীর্ঘ চোখ, সুগঠন ওষ্ঠ, সুন্দর হাসি—অল্প রেখায় ফুটিয়েছেন লেখক। পুরুষ, কিন্তু মেয়েদের মতো লম্বা চুলে খোঁপা বাঁধা নসুবালা শাড়ি ও চুড়ি পরে, নাচে, গায়। কোনো দিক থেকেই তাকে সুন্দর দেখাবার কারণ নেই। তবু উপন্যাসে তাকে অবিস্মরণীয়তা দিতে পেরেছেন তারাশঙ্কর। পাঠক তাকে ভোলে না—হাঁসুলী বাঁকের চরিত্রচিত্রশালায় তার আসন সামনের দিকেই। মনে মনে এই অদ্ভুত মানুষটিকে আপনার জন ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে যাই আমরা। তারাশঙ্কর এই আঁকাড়া বাস্তবের শিল্পী। এরই মধ্যে তার শিল্প-রচনার উপাদান ও সফলতা। শিল্পীর একাগ্র প্রয়াসে এই রূপদৃষ্টি দিয়েই তারাশঙ্কর নির্মাণ করেছেন তাঁর হাঁসুলী বাঁকের মানুষজনকে। বিশেষ করে কাহার সম্প্রদায়ের নরনারীদের জীবন ও জীবিকার একান্ত সত্য, 'তুমুল গাঢ় সমাচার'ই আমাদের শোনাতে চেয়েছেন তিনি।

তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে নিঃসন্দেহে সফল। এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নও আমাদের মনে জাগে। আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার একটা হিসেব নিয়েছি। প্রশ্নটি এই—এই উপন্যাস প্রধানত কোন্ লক্ষণে মোটামুটিভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে? শৈল্পিক সাফল্যই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ নয় কোনোদিনই। সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়—প্রত্যেকেই তুলনারহিত কথাশিল্পী। কিন্তু সংস্করণের পর সংস্করণ হয় না তাঁদের বইয়ের। সেই অর্থে তাঁরা জনপ্রিয় নন। তাঁদের লেখা বোদ্ধা সাহিত্যরসিকের জন্য, দীক্ষিত পাঠকের জন্য। তাঁরা বিনোদন সন্ধানী লঘুচিত্ত পাঠকের ভালো লাগার জন্য আদৌ উপন্যাস লেখেন না। তারাশঙ্করও তা লেখেন নি—তবু মোটের উপর লোকপ্রিয় হয়েছে এই উপন্যাস।

সাধারণত যে-সব উপন্যাস পাঠক সহজে গ্রহণ করেন সে-সব উপন্যাসে একটি আদি-মধ্য অন্ত যুক্ত গল্পাংশ থাকে। গল্প বন্ধনহীন, বিশ্লেষণী, বিবরণাত্মক উপন্যাস—যেমন 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'; চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস—যেমন 'অন্তঃশীলা', প্রতীকী উপন্যাস—যেমন 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক'—ইত্যাদি মননশীল পাঠককে খুবই আকর্ষণ করলেও সাধারণ পাঠককে তেমন টেনে রাখতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ উপন্যাস-প্লটের গল্প-বন্ধনকে উপেক্ষা করেননি প্রায় কখনই। খুবই সুসংবদ্ধ আখ্যান আমরা পাই 'পদ্মানদীর মাঝি' আর 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-তে। 'পথের পাঁচালী'—বিবরণ রীতি একটু নতুন রকম হলেও স্তরে স্তরে বিকশিত হওয়া কাহিনী-ধর্ম খুবই প্রত্যক্ষ। অপুর বড় হয়ে ওঠার সঙ্গী সেখানে আমরা সকলেই। তারাশঙ্কর নিজেও 'আরোগ্য নিকেতন' এবং 'কবি'-র মতো উপন্যাসে এই আখ্যান সূত্রগুলি সুগ্রথিত রেখেছেন। 'ধাত্রীদেবতা' আর 'কালিন্দী'-কে গল্প-প্রধান উপন্যাসই বলা যায়। 'গণদেবতা' আর 'পঞ্চগ্রাম'—

কিছুটা অন্য জাতীয় রচনা। একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী এই উপন্যাসদ্বয়ে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখানেও তিন-চারটি কথাবৃত্তে বিন্যস্ত আখ্যানে গল্পের রস একটা থেকেই যায়। প্রতিটি কথাবৃত্তের নিজস্ব আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত নিটোলতা আছে। কিন্তু 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ভিন্ন গোত্রের রচনা। 'উপকথা' শব্দটিকে অন্য কোনো উপন্যাসের নামের সঙ্গে যুক্ত করেননি লেখক। উপকথার মতোই এক প্রাচীন অথচ চিরায়ত, নিত্য নবায়মান এক অন্তহীনতা যেন তাঁর কথনের লক্ষ্য। কোনো আদি-মধ্য-অন্ত নির্দিষ্ট গল্প নয়—একগুচ্ছ মানুষের জীবন-যাপনের বিবরণ। এ-জাতীয় উপন্যাস খুব জনপ্রিয় হওয়া কিছুটা অপ্রত্যাশিত। খুব বেশি জনপ্রিয় হয়তো নয়ও এ-উপন্যাস। তবু মোটের ওপর বাংলা সাহিত্যের বহু পঠিত উপন্যাসগুলির একটি অবশ্যই। সব পাঠকই যেন কম বেশি উপন্যাসটির টান অনুভব করেন। কোথায় আছে এর কারণ ?

একটি কারণের কথা ভাবা যেতে পারে। এই উপন্যাসের অনেকগুলি দিক আছে। একাধিক কারণে বিশেষ বিশেষ পাঠক উপন্যাসটি থেকে মনের খোরাক পেতে পারেন। নৃতত্ত্ব, আদিবাসী ও জনজাতি জীবন নিয়ে যাঁদের আগ্রহ তাঁরা এ উপন্যাসে আকৃষ্ট হবেন, নিজেদের অধীত বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন লেখকের অনধীত কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ। সমাজতাত্ত্বিক আকৃষ্ট হতে পারেন বিশেষ বৃত্তিজীবী একটি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে, উৎপাদন ও ধনবণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, পুরোনো প্রথা-অনুযায়ী জীবনধারায় একদিকে সংকট সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে খুলে যায় জীবন নির্বাহের অনেক নতুন দরজা। নতুন ও পুরোনোর সংঘাত সেখানে অবশ্যম্ভাবী। এই সত্য এবং হাঁসুলীবাঁককে অবলম্বন করে বীরভূমের মতো অঞ্চলে এই সমাজ-বদলের প্রক্রিয়ার একটা ছবি পেয়ে যেতে পারেন সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌গণ। যাঁরা প্রকৃতিবিজ্ঞানী তাঁরা তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে দেখা এই হাঁসুলীবাঁকের জল-মাটি-উদ্ভিদ-পশুপাখির বিবরণে পাবেন আকর্ষণের খোরাক ; ভাষা-বিজ্ঞানীকে মনোযোগী করে তুলবে বীরভূমের লোকভাষার রূপটি—শব্দসম্ভারে, উচ্চারণে, বাগ্‌ধারায়, ছড়া ও প্রবাদের ব্যবহারে।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থাকে। উপন্যাস-পাঠকের মধ্যে কতজনই বা সেই অর্থে সমাজতত্ত্ববিদ্‌, নৃতত্ত্ববিদ্‌, প্রকৃতিবিজ্ঞানী বা ভাষা-বিজ্ঞানী ? তাঁদের পঠন-আগ্রহে একটি উপন্যাসের একাধিক সংস্করণ সম্ভব হতে পারে ? উত্তর সম্ভবত আমরা পাবো অন্যত্র। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, উপন্যাসকে পাঠক গ্রহণ করেছেন কথাশিল্প হিসাবেই। সাধারণ পাঠকের মনকে টেনে রাখবার উপাদান এই উপন্যাস থেকে কোন-না কোনো ভাবে পাওয়া যায় বলেই এই উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছে।

প্রথমত, বলা যায়, সাধারণ পাঠক সব সময়েই কিন্তু লঘু বিনোদন বা সস্তা রুচির প্রত্যাশা নিয়ে সাহিত্য পাঠ করেন না। তাঁরা যা চান তা হল—এমন কোনো দিক উপন্যাসে থাকবে যা তাঁদের জীবনের সঙ্গে, জীবন-ভাবনার সঙ্গে অন্বিত হতে

পারবে। পাঠক নিজের ও উপন্যাসের জীবনের মধ্যে অসেতুসম্ভব কোনো দূরত্ব অনুভব করতে চান না। নিজেদেরই কোনো-না-কোনো প্রতিবিম্ব তাঁরা অনুভব করতে চান উপন্যাসের বিবরণ ও চরিত্রগুলির মধ্যে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যবিত্ত জীবন বাঙালি পাঠকের জীবনদর্পণ ছিল সরাসরি। তাই জনপ্রিয়তার শিখরে ছিলেন শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল। আজও আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের নারী-পুরুষের মধ্যেও কিন্তু পাঠক অনুভব করেন অপ্রেমের চিরায়ত বাণী। আয়েষার প্রেম, পশুপতির ক্ষমতালোভ, নগেন্দ্র-গোবিন্দলালের রূপ-দুর্বলতা, দেবেন্দ্রের নীচতা, সীতারামের স্খলন—এসবই চিরকালের মানুষের জীবনস্রোতের তরঙ্গ। দেশভেদে, জাতিভেদে, যুগান্তরে পরিবর্তিত হয় না এই জীবনের এই মৌল প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও মৌল আবেগের উদ্ভাস। ঠিক এই উপলব্ধিই পাঠকের মনকে পূর্ণ করে দেয় এই উপন্যাসে। কাহারদের নিয়ে লেখা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠক কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ ও জীবনাচরণের ঘনিষ্ঠ নন। কিন্তু বনওয়ারী-র নেতৃত্বের অহংকার ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়ী চরিত্রটি আমাদের অপরিচিত লাগে না। আমাদের চেনা লাগে নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধি করালীর ঔদ্ধত্য, সাহস, ভিন্ন জীবিকার সন্ধান, অনুসন্ধিৎসু মন, পরম্পরাগত ঐতিহ্য অস্বীকার করবার প্রবণতা—যুগে যুগে সত্য হয়ে দেখা দেয়। পরিবর্তিত হয় কেবল তার বহিরাবরণ; ভিতরে ভিতরে এই প্রজন্ম-দ্বন্দ্ব চিরকালীন এক সত্য।

বনওয়ারী ও করালীর দুবার মুখোমুখি শরীরী সংঘাত বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। প্রথমবার কেবলই ক্ষমতার লড়াই, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় সঙ্গে নারীর উপর অধিকারের শক্তি পরীক্ষা। দ্বিতীয় সংঘর্ষে হেরে গিয়েই প্রকৃত পরাজয় হয় বনওয়ারীর। সে হয়ে যায় বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত জীবনের আদিম শক্তির চিরন্তন সংঘাত এভাবেই দেখা দিয়েছে এই উপন্যাসে।

প্রবৃত্তি দিয়েছো তুমি মোরে অন্ধকার অমারাত্রি সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।

লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায়। প্রেমের যত বৈচিত্র্যই থাক, অন্তরে আছে তার একটি চিরায়ত রূপ। এই চিরায়ত জীবন মাধুর্যই এই উপন্যাসে ফুলের মতো, রামধনুর মতো, ভোরের আলোর মতো, রক্তরেখার মতো কারুকাজ এঁকে দিয়েছে।—"আশ্চর্য নাকি মানুষের জীবনে 'রঙের' ছোঁয়াচের খেলা। এদেশের এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা নরনারীর ভালবাসাকে বলে 'রঙ'। রঙ নয়—বলে 'অঙ'।.....মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা হলে ওরা বলে— অঙ লাগায়েছে দু'জনাতে। রঙ-ই বটে, গাঢ় লাল রঙ। এক ফোঁটার ছোঁয়াচে মনভরা অন্য রঙের চেহারা পাল্টে দেয়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের জনজাতি পরিচয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি অনেকটা নিবদ্ধ থাকে বলে, উপন্যাসে প্রজন্মদ্বন্দ্ব তথা নবীন-প্রবীনের সংঘাতের বিষয়টির বলিষ্ঠ রেখাঙ্কন আমাদের মন অনেকখানি টেনে রাখে বলে

আমরা কমই লক্ষ্য করি যে এই উপন্যাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে প্রেমের প্রবল প্রবাহ। যে-প্রেম সমাজবন্ধন মানে না, আবার মানেও; যে-প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি সমাজ-ভেদে ভিন্নতা পায়, যে-প্রেম শেষ পর্যন্ত কুল-প্লাবিনী; আবার সেই প্রেমই একদিন শীর্ণ নদীর মতো শেষ হয় করুণ অবসানে। প্রেম মায়াবী, প্রেম কোমল; আবার প্রেম নিষ্ঠুর, হিংস্র, পজেসিভ্; প্রেমের জটিল, কুটিল, ছলনাময় রূপও আছে। এই সবগুলি চেহারাই আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাবো। কালোশশী, গোপালীবালা আর সুবাসী—বনওয়ারীর এই তিন নারীর কেউই পুরোপুরি তার হয়নি। কালোশশী তার সামাজিক ও হিসেবী মন নিয়ে পরমের সংসার করেছে, কিন্তু মনে মনে ভালোবেসেছে বনওয়ারীকে; গোপালীর শান্ত, অনুজ্জ্বলতায় কোনোদিন ফুলকি জ্বলেনি বনওয়ারীর মনে; সুবাসী তাকে ছেড়ে করালীর কাছে চলে গেছে। বসন্ত আ-জীবন বিশ্বস্ত ভালোবাসা দিয়ে গেছে উচ্চতর শ্রেণীর বাবুদের ছেলেকে—যাদের সঙ্গে তাদের চিরকালীন শোষণ-সম্পর্ক। বসন্তের মেয়ে পাখিকে করালী গ্রহণ করেছে, তারপর বর্জনও করেছে। শেষ পর্যন্ত বনওয়ারীর রমণীকে জয় করেই জয় সম্পূর্ণ হয়েছে করালীর।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় নিসর্গের যে বিচিত্র রূপ—সেখানেও মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের চিরন্তন দেওয়া-নেওয়া। বন্যা-উন্মত্ত নদী, শুকনো মাটি যাতে কোদাল চলে না, সেই সঙ্গে কাহারদের নিত্য সংগ্রামের ছবিতে প্রকৃতি ও মানুষের চিরকালীন সংঘাতের রূপ ফুটেছে। আবার প্রকৃতির প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়েই মানুষের বেঁচে থাকা। হাঁসুলীবাঁকে বর্ষা আসার যে নিবিড় বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর সে ছবিতে নির্দিষ্ট আঞ্চলিকতার ছাপ আছে, সেই সঙ্গে আছে অনির্দেশ্য শ্যামল সজলতা—যা উষ্ণ অঞ্চলের যে-কোনো দেশে বর্ষার রূপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

এই উপন্যাসে মানবচরিত্রকে এক সর্বময় দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে—সেকথা আগেই বলেছি। যে-কোনো সার্থক উপন্যাসের প্রধান শক্তিই এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে যেমন সেই সঙ্গে প্রকৃতি ও শিশু—এই দ্বৈত উপাদান এনে দিয়েছে এক অনন্ত এবং অসীম চিরন্তনত্ব, তেমনই প্রকৃতি ও প্রেম—এই দুটি মৌল উপাদানের উপর নির্ভর করে' হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-য়' এসেছে আঞ্চলিকতার সীমা ছাড়ানো এক চিরায়ত জীবন-উপলব্ধি। উপন্যাসের প্রথমেই কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে আছে নদীর বিবরণ। জীবন-প্রবাহেরই বৈচিত্র্য আর অনন্ততার রূপ যেন। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' তাই অঞ্চল-কেন্দ্রিক, বিশিষ্ট জনজাতি-জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস হয়েও আসলে এক সর্বজনীন উপন্যাস। সে কারণেই উপন্যাসটিকে সহজেই মনের মধ্যে টেনে নিতে কোনো পাঠকেরই দেরি হয় না।

।। লেখক পরিচিতি ।।

অচিন্ত্য বিশ্বাস : অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য গ্রন্থ : আদিবাসী জীবন সংগ্রাম, বাংলা পুঁথির নানা কথা, অদ্বৈত মল্লবর্মণ : একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত (সম্পা)

অনিল কুমার রায় : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চম্পাহাটি সুশীলকর কলেজ, উল্লেখ্য গ্রন্থ : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেহালা কলেজ অফ কমার্স, 'এবং এই সময়' পত্রিকার সম্পাদক।

উদয়কুমার চক্রবর্তী : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন, ছন্দ ভূতের কারসাজি, আবৃত্তির অ আ ক খ।

তপতী মুখোপাধ্যায় : বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ, উল্লেখ্য গ্রন্থ—বাংলায় 'মেঘদূত' অনুবাদ, সংস্কৃত অনুবাদ-নাটক ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

তরুণ মুখোপাধ্যায় : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, উল্লেখ্য গ্রন্থ : কাজী আবদুল ওদুদ, বৈষ্ণবকাব্য ও আধুনিকতা।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, উল্লেখ্য গ্রন্থ, বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও শব্দানুষঙ্গ, ইন্দোনেশিয়ার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি।

নির্মল দাস : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য গ্রন্থ—চর্যাগীতি পরিক্রমা, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ।

নিমাই দাস : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ, উল্লেখ্য গ্রন্থ—বৈষ্ণবসাহিত্যে চৈতন্যবিষয়ক ভাবনা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, উল্লেখ্য গ্রন্থ : উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব, অন্তর্বয়ন কথাসাহিত্য, উপন্যাস : রাজনৈতিক, চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব, সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন।

বরুণকুমার চক্রবর্তী : বিভাগীয় প্রধান, লোকসাহিত্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য গ্রন্থ—টডেররাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য, প্রসঙ্গ : লোকপুরাণ, বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত, বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়, লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কার, লোক সংস্কৃতি ও নানা প্রসঙ্গ।

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য গ্রন্থ—কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব, চণ্ডীমঙ্গল (সম্পা)।

রবিন পাল : অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ। উল্লেখ্য গ্রন্থ—কল্লোলিত ছোটগল্প, র‍্যালফ ফক্স : রাজনীতি সংস্কৃতি ভারতনীতি, কথাসাহিত্য চিত্রকল্প, পাবলো নেরুদা : বঙ্গীয় বাতায়ন ও বিক্ষুব্ধ নীলিমা।

সমরেশ মজুমদার : অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, সোনারপুর কলেজ। উল্লেখ্য গ্রন্থ—বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর।

সুমিতা চক্রবর্তী : অধ্যাপিকা, বাংলাবিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য গ্রন্থ—কবি অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল, আধুনিক বাংলা দ্বিতীয় পর্যায়, কবিতার অন্তরঙ্গপাঠ, আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র, **Amiya Chakraborty.**